দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা ঃ একটি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা

তত্ত্বাবধায়ক 30.6.2008
অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

উপস্থাপনায়
কোহিনুর আক্তার
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
429863
429863

এম.ফিল অভিসন্দর্ভ

জুন, ২০০৮

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

M.

429803

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা ঃ একটি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা

429800

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা ঃ একটি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত

জুন ২০০৮

গবেষক
কোহিনুর আক্তার
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

4298[illegible]

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভ "দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা: একটি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিষয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত করেছি। আমি এ অভিসন্দর্ভ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে/প্রতিষ্ঠানে অন্য কোন ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীর জন্য জমা দেইনি। আমি নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেছি এবং ইহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল ডিগ্রীর জন্য জমা দিয়েছি।

কোহিনুর আক্তার ৩০।৬।০৮
কোহিনুর আক্তার
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী
(অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী) ৩০।৬।০৮
তত্ত্বাবধায়ক
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা পত্র

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। যার অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে দারিদ্র্যতা। বাংলাদেশের বিদ্যমান ব্যাপক দারিদ্র্যতায় সবচেয়ে ভুক্তভোগী হন গ্রামীন দরিদ্র মহিলারা। গ্রামীন মহিলাদের দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ ও বিভিন্নমূখী কর্মসূচি। দারিদ্র্যতা দুর করার জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি, শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যমে প্রসারের ফলে গ্রামীন মহিলাদের দারিদ্র্যতা কতটুকু দূর হয়েছে তার নৃতাত্ত্বিক রূপ দেওয়াই আমার এই গবেষনার লক্ষ্য।

এই গবেষনা কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হওয়ার জন্য আমি গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ আমার শিক্ষক, এই গবেষনা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর প্রতি। দারিদ্র্যবিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা সম্পৃক্ত বিষয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তার সক্রিয় তত্ত্বাবধায়ন এই গবেষনাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে। তিনি তার কর্মব্যস্ত সময়ের মধ্যেও এই গবেষনা কাজের জন্য তিনি সময়ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে আন্তরিকতার সাথে আমার গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছেন এই জন্যই আমি স্যারের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ অধ্যাপক আহসান আলী, অধ্যাপক এইচ.কে. আরেফিন অধ্যাপক হাবিবুর রহমান ও আরিফ মাহমুদ স্যারের প্রতি। তারা গবেষনা সম্পৃক্ত বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। মাঠ কর্মের বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, যা আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমি বিশেষভাবে ঋনী আমার গবেষনাধীন গ্রামের অধিবাসীদের প্রতি যাদের আন্তরিকতার কারণে গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। গবেষনা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকতা ও কর্মচারীবৃন্দ যে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছে সেই জন্য আমি তাদের কাছে ঋনী। আমার ভগ্নীপতির বন্ধু রফিকুল ইসলাম আমাকে কেরানীগঞ্জ উপজেলার এমারগাও গ্রামের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার গবেষনা কর্মে সহায়তা করেছে এই জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া গ্রামের চেয়ারম্যান লিয়াকত হোসেন, বর্ষীয়ান গ্রামবাসী শহীদুল হক, সিদ্দিক রহমান গ্রাম সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছে। এছাড়া এমারগাও গ্রামের শাহীন আহমেদ, লতিফ রহমান, লতিফ রহমান, রশিদ আহমেদ, রোকসানা সুলতানা, রাহেলা খাতুন, মরিয়ম বেগম আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তাদের কাছে ঋনী।

সবশেষে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা আমার বাবা-মার প্রতি, আমার মা যার সবসময়ের সাধনা ছিল আমার উচ্চশিক্ষার প্রতি। এছাড়া স্বামী, ভাই-বোন প্রতিনিয়ত যাদের উৎসাহ আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

প্রত্যয়ন পত্র

কৃতজ্ঞতা পত্র

সূচিপত্র

সারনী সূচি

Abstract: সারসংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা

১.১ গবেষনার বিষয়বস্তু ১

১.২ গবেষনার উদ্দেশ্য ৩

১.৩ গবেষনার যৌক্তিকতা ৫

১.৪ গবেষনা পদ্ধতি ৭

১.৫ তথ্য বিশ্লেষন পদ্ধতি ১১

১.৬ গবেষনার সীমাবদ্ধতা ১২

১.৭ গ্রন্থ পর্যালোচনা ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ দারিদ্র্য বিষয়ক পর্যালোচনা

২.১ দারিদ্র্যের সংজ্ঞা ২০

২.২ দারিদ্র্যের প্রকারভেদ ২৪

২.৩ দারিদ্র্য রেখা নির্মান ২৭

২.৪ দারিদ্র্যের পরিমাপ ৩১

২.৫ উন্নয়ন বিষয়ক ধারনা ৩৬

২.৬ গ্রামের সংজ্ঞা ৪৫

২.৭ গ্রামীন উন্নয়ন ৪৭

২.৮ গ্রামীন উন্নয়নের প্রধান প্রধান সূচকসমূহ ৫০

২.৯ গ্রামীন নারীর দারিদ্র্যতা ৫৩

২.১০ উন্নয়ন ধারার ব্যাখ্যা ও নারীর অবস্থান ৫৯

২.১১ নারী উন্নয়নে আন্তজার্তিক প্রচেষ্টা ৬৫

২.১২ বিশ্ব নারী সম্মেলনে জাতিসংঘের ভূমিকা ৬৬

২.১৩ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারী ৭৩

২.১৪ নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে বাংলাদেশের সরকারের উদ্যোগ ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য পর্যালোচনা

৩.১	বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বর্তমান অবস্থা	৮০
৩.২	বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বৈশিষ্ট্য	৮৭
৩.৩	বাংলাদেশে গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কর্ম-কৌশলসমূহ	৯৩
৩.৪	বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের পটভূমি	৯৮
৩.৫	বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত সরকারি উদ্যোগ	১০০
৩.৫.১	গ্রামীন কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচি	১০০
৩.৫.২	বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি	১০৫
৩.৫.৩	স্বনির্ভর আন্দোলন	১০৫
৩.৫.৪	কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি	১০৭
৩.৫.৫	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	১০৮
৩.৫.৬	পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	১০৯
৩.৬	দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারি উদ্যোগ	১১০
৩.৬.১	ব্র্যাক	১১২
৩.৬.২	গ্রামীন ব্যাংক	১১৪
৩.৬.৩	আশা	১১৬
৩.৬.৪	প্রশিকা ঃ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	১১৮
৩.৭	নারীর দারিদ্র্য দূরীকরন ও উন্নয়নে এনজিওর কর্মসূচি	১২১
৩.৮	বাংলাদেশে পরিকল্পনাসমূহে গৃহীত দারিদ্র্য নিরসন কৌশল	১৩১
৩.৯	দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) এর পটভূমি	১৩৬
৩.১০	বাংলাদেশের পিআরএসপির কাঠামো	১৪২
৩.১১	বাংলাদেশের পিআরএসপির মুলবিষয় ও লক্ষ্যসমূহ	১৪৪

চতুর্থ অধ্যায় ঃ গবেষনাধীন গ্রাম পরিচিতি

৪.১	গ্রামের অবস্থান	১৪৭
৪.২	স্থানিক বিবরন	১৪৭
৪.৩	এমারগাও গ্রামের জনসংখ্যা	১৪৯
৪.৪	গ্রামের অর্থনীতি	১৫০
৪.৫	গ্রামের অধিবাসীদের পেশা	১৫১
৪.৬	এমারগাও গ্রামের জমি জমার তথ্য	১৫৩
৪.৭	গ্রামের বাসস্থানের ধরন	১৫৪
৪.৮	গবেষনাধীন গ্রামের পরিবারের ধরন	১৫৬
৪.৯	গ্রামীন পরিবারের সদস্য সংখ্যা	১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০ গবেষনাধীন গ্রামের বিয়ের ধরন ১৬১
৪.১১ গবেষনাধীন গ্রামের জনগনের শিক্ষা ১৬৪
৪.১২ এমাগাও গ্রামের নারী শিক্ষা ১৬৭
৪.১৩ গ্রামের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি অবস্থা ১৭০
৪.১৪ স্থানীয় সরকার এমারগাও গ্রাম প্রেক্ষিতে ১৭৭
৪.১৫ এমারগাও গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম ১৮৩

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

গ্রামের মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে অংশগ্রহন ১৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থা ২২৩

সপ্তম অধ্যায় ঃ উপসংহার ২৫০

৭.১ উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

সারণী সূচি

সারনী নং ১	: এমারগাও গ্রামের জনসংখ্যা বিন্যাস	১৪৯
সারনী নং ২	: গ্রামীন জনগনের পেশা	১৫২
সারনী নং ৩	: এমারগাও গ্রামের ভূমি বন্টনের চিত্র	১৫৪
সারনী নং ৪	: গ্রামের বাসস্থানের ধরন ও সংখ্যা	১৫৬
সারনী নং ৫	: এমারগাও গ্রামের পরিবারের ধরন	১৫৯
সারনী নং ৬	: গ্রামীন পরিবারের সদস্য সংখ্যা	১৬০
সারনী নং ৭	: গবেষনাধীন গ্রামের বিবাহের ধরন	১৬৩
সারনী নং ৮	: গবেষনাধীন গ্রামের শিক্ষাগত যোগ্যতা (পুরুষ)	১৬৬
সারনী নং ৯	: গ্রামীন অধিবাসীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (মহিলা)	১৬৯
সারনী নং ১০	: গ্রামীন স্বাস্থ্যের সহায়ক উপাদান সম্পর্কিত তথ্য	১৭৭
সারনী নং ১১	: গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের বয়স	১৯৭
সারনী নং ১২	: গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা	১৯৮
সারনী নং ১৩	: মহিলা উপার্জনকারী পরিবারের পুরুষ সদস্য সংখ্যা	১৯৯
সারনী নং ১৪	: মহিলা উপার্জনকারী পরিবারের মহিলা সদস্য সংখ্যা	২০০
সারনী নং ১৫	: গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবারের ধরন	২০১
সারনী নং ১৬	: উপার্জনকারী মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থান	২০২
সারনী নং ১৭	: উপার্জনকারী মহিলাদের পেশার ধরন	২০৪
সারনী নং ১৮	: উপার্জনকারী মহিলাদের মাসিক আয়	২০৫
সারনী নং ১৯	: দৈনিক খাদ্যবস্তু গ্রহন	২০৬
সারনী নং ২০	: উপর্জনকারী মহিলাদের বাসস্থানের তথ্য	২০৮
সারনী নং ২১	: গ্রামীন মহিলাদের ঋন গ্রহন সম্পর্কিত তথ্য	২১০
সারনী নং ২২	: ঋণদানকারী সংস্থার নাম	২১২
সারনী নং ২৩	: গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	২১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারনী নং ২৪	: চিকিৎসা গ্রহনের ধরন	২১৫
সারনী নং ২৫	: গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্য	২১৭
সারনী নং ২৬	: সঞ্চয়ের স্থান সম্পর্কিত তথ্য	২১৭
সারনী নং ২৭	: উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবার প্রধান	২২৫
সারনী নং ২৮	: গৃহস্থালী কাজে উপার্জনকারী মহিলাদেয় ভূমিকা	২২৭
সারনী নং ২৯	: উপার্জনকারী মহিলাদের উপার্জিত অর্থের উপর নিয়ন্ত্রনের প্রকৃতি	২২৮
সারনী নং ৩০	: উপার্জনকারীদের উপার্জিত অর্থব্যয়ের খাত সমূহ	২৩০
সারনী নং ৩১	: উপার্জনকারী মহিলা পরিবারের খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহন	২৩১
সারনী নং ৩২	: উপৃর্জনকারী মহিলা পরিবারের বিবাহের খরচের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকারী	২৩২
সারনী নং ৩৩	: উপার্জনকারী মহিলাদের যৌতুক দেয়া সম্পর্কিত মতামত	২৩৪
সারনী নং ৩৪	: উপার্জনকারী মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহনের ধরন	২৩৫
সারনী নং ৩৫	: পরিবারের চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত	২৩৬
সারনী নং ৩৬	: উপৃর্জনকারী মহিলা পরিবারের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনের সিদ্ধান্ত	২৩৮
সারনী নং ৩৭	: উপার্জনকারীদের সন্তানের ভবিষ্য সম্পর্কে আশা	২৩৯
সারনী নং ৩৮	: উপার্জনকারী হওয়ার পূর্বে ও পরে পারিবারিক নির্যাতনের ধরণ	২৪২
সারনী নং ৩৯	: উপার্জনকারী মহিলাদের মর্যাদা সম্বন্ধে পরিবার এবং সমাজের ধারণা	২৪৩
সারনী নং ৪০	: উপার্জনকারী মহিলাদের দারিদ্র্যতা দূর হওয়া সম্পর্কিত মতামত	২৪৬
সারনী নং ৪১	: উপার্জনকারীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত	২৪৭

Abstract : সারসংক্ষেপ

এই গবেষনা কর্মটি মূলত দারিদ্র্য বিমোচনে ও গ্রাম উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা বিষয়ক একটি নৃত্বাত্ত্বিক সমীক্ষা। গ্রামীন পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের ভূমিকা মাঠকর্মের মাধ্যমে যাচাই করে দেখার জন্য গবেষনা কর্মটি পরিচালিত হয়েছিল। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। এই দেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। দারিদ্র্যকে একটি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থতা হিসেবে গন্য করা হয়।

বাংলাদেশের দারিদ্র্যতা বিশ্বখ্যাত। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যরের জন্য এই দেশেকে বিভিন্ননামে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে কোন দারিদ্র্য পরিমাপ সূচকের পরিপ্রেক্ষিতে এদেশ বিশ্বের অন্যতম দারিদ্র্যজন অধ্যুষিত দেশ। বাংলাদেশ জাতীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ৪৪.৯ ও ৪৩.৩ শতাংশ। বাংলাদেশের ১৩ কোটি ৩৫ লাখ মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যের সংখ্যা ৬ কোটি ৩৪ লাখ। আর জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল ইউএনপি এর হিসাবে দরিদ্রের সঙখ্যা ৬ কোটি ৮৬ লাখ। বাংলাদেশের দরিদ্র পরিস্থিতির ক্রমান্বয়ে এক জটিল রুপ ধারন করেছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে জনসংখ্যার শতকরা হারে দরিদ্র্যের সংখ্যা কমলেও, দারিদ্র্য নিরসনে হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হতে অনেক কম হওয়ায় দেশের মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেনি। উপরন্তু সম্পদ বৈষম্য আয় বৈষম্য ও সুযোগ বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুন। দারিদ্র্যের এই ব্যাপকতায় জন্য আলোচ্য গবেষনায় আলোচিত হয়েছে দারিদ্র্য বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা, বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি, উন্নয়ন ও গ্রামীন উন্নয়ন প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। আর আমাদের দারদ্র দেশের দারিদ্র্য সবচাইতে রুঢ়তম রুপ নিয়ে যাদের কাছে দেখা দেয়, তারা হলো দরিদ্র মহিলা। বাংলাদেশের ৪৫ শতাংশ গ্রামীন জনগন দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে যার সিংহ ভাগই হচ্ছে নারী। আমাদের দেশের দারিদ্র্যের বোঝা পুরুষের চেয়ে মহিলারাই বেশী বহন করে। পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পেশা প্রভৃতি সহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই মহিলারা সুবিধাবঞ্চিত একটি গোষ্ঠী। সমাজে দরিদ্র বেকার এবং অর্থনৈতিক ও সমাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগনের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে নারী।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত প্রথা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশের নারীরা সমাজের মূলস্রোতধারা থেকে পিছিয়ে আছে। কিন্তু নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সমতার ভিত্তিতে সম্পৃক্ত করতে না পারলে প্রত্যাশিত অগ্রগতি সম্ভব নয়। নারী উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে, যখন নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন, স্বনির্ভর, সামাজিক সকল প্রকার শোষন ও নির্যাতন ও বৈষম্যর অবসান ঘটিয়ে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা লাভে সক্ষম করে তোলা। নারী উন্নয়ন শুধু যে দেশের উন্নয়নের জন্য জরুরী তা নয়, বরং নারী উন্নয়নকে সমাজ ও দেশের উন্নয়নের সমার্থক বলে ধরে নেয়া যায়, যখনই এই উন্নয়ন দেশের উন্নয়নের সূচকে উন্নতী করে। রাষ্টীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে এমব স্বীকৃতির ফলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। পর্দা প্রথা ভেঙ্গে মহিলারা কর্মক্ষেত্র প্রবেশ করেছে। গ্রহন করেছে বিভিন্ন অর্থউপার্জনকারী পেশা। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রামীন সমাজে ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। গবেষনাধীন গ্রামের মহিলারা বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋন নিয়ে গৃহভিত্তিক কৃষি কর্মে, নিয়োজিত হয়েছেন। গ্রামীন মহিলারা আয় উপার্জনের সঙ্গে সংযুক্ত নানা রকম কর্মকান্ডে নিয়োজিত হয়েছেন। গবেষনা এলাকার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষন পূর্বক জানা গিয়েছে সঠিক নির্দেশনা পেলে তারা নিজেরাই নিজেদের আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে পারে। গবেষনা এলাকায় গ্রামীন মহিলা উপার্জনকারী পরিবারগুলোর একটি বিরাট অংশ তাদের খাদ্য ও মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য নারীর উপার্জন ও উৎপাদনশীল ক্ষমতার উপর আংশিক বা সম্পন্নভাবে নির্ভরশীল। গবেষনা এলাকায় নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষনে দেখা গিয়েছে দেশের সামগ্রিক দারিদ্র্য পরিস্থিতির উত্তরন না ঘটলেও উপার্জনকারী মহিলারা তাদের মনের দারিদ্র্য দূর করতে পেরেছে, পরিবারকে মুক্ত করতে পেরেছে আর্থিক দৈন্যদশা থেকে- যা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির ইঙ্গিত দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১. গবেষণার বিষয়বস্তু:

কোন সমাজ সমস্যামুক্ত নয়। তবে সমাজভেদে এবং একই সমাজে যুগভেদে সামাজিক সমস্যার প্রকৃতিতে বিভিন্নতা দেখা দেয় এবং সমস্যার তীব্রতায় হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। দক্ষিন এশিয়ার ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ-কিলোমিটাবের একটি ছোট দেশ বাংলাদেশ। এই দেশটির প্রধান সামাজিক সমস্যা হলো দারিদ্র্য। ১৩ কোটি মানুষের মধ্যে সাড়ে ৬ কোটি মানুষ এখন দারিদ্র্য। এই ছোট্ট দেশটির দারিদ্র্য নিরসনের জন্য গত ৩০ বছরে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু আশানুরুপ দারিদ্র্য কমেনি। আজ থেকে ৩০ বছর আগে ১৯৭৩ সালে যখন দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ শুর হয় তখন দেশে দারিদ্র্যের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ। আর ২০০৫ সালে তা এসে দাড়িয়েছে ৪৭ শতাংশ। ১৯৭৩ সালে সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে ৫ কোটি ৩৫ লাখ মানুষ ছিল দারিদ্র্য। আজ ১৩ কোটি ৩৫ লাখ মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যের সংখ্যা দাড়িয়েছে প্রায় ৬ কোটি ৩৪ লাখ। আর জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল ইউএনডিবির হিসাবে এই দরিদ্র্যদের সংখ্যা দাড়ায় ৬ কোটি ৮৬ লাখ।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রভাব সুদুর প্রসারী। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের জন্য এই দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি। ম্যালথাসের দেশ, ভূমিদাসের দেশ, উন্নয়নের টেস্টকেস, পৃথিবীর বৃহতম গ্রামীন বস্তি, ইত্যাদি নামে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, আমদানী নির্ভর বানিজ্য ব্যবস্থা, শিল্পক্ষেত্রে নিম্নমানের উৎপাদনশীলতা, মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ দারিদ্র্যের করাল গ্রাস হতে মুক্ত হতে পারেনি। এছাড়া বন্যা, অতিবৃষ্টি, খরা, জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের দারিদ্র্যতা দিন দিন বেড়েছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে দারিদ্র্য কেবল একটি স্থানীয় সমস্যা নয় এটা হচ্ছে বৈশ্বিক। সারাবিশ্বের যে কোন স্থানেই দারিদ্র্যহচ্ছে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভৌত পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরুপ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ২০০৫ সালে দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৩ কোটি ৫০ লাখ।

Dhaka University Institutional Repository

২০০০ সালে দারিদ্র্যের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ। আর অতিদারিদ্র্যের সংখ্যা ছিল ৩৪ শতাংশ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় নব্বইয়ের দশকে আমাদের দেশে দারিদ্র্যকমেছে গড়ে এক শতাংশ হারে। সে হিসেবে ২০০৫ সালে দারিদ্র্যের সংখ্যা ৪৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের সংখ্যা ৩১ শতাংশ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ২০০৫ সারা দেশের মোট জনসংখ্যা দাড়িয়েছে ১৩ কোটি ৫০ লাখ। এ হিসাবে দেশে দারিদ্র্যের সংখ্যা ৬ কোটি ৩৪ লাখ এবং অতিদারিদ্র্যের সংখ্যা ৪ কোটি ২০ লাখ। আর জাতিসংঘ জনসংখ্যা ইউএনএফপিএ এর হিসাব অনুযায়ী ২০০৫ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ১৪ কোটি ৬০ লাখ। এ হিসাবে দেশে মোট দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র্যের সংখ্যা দাড়ায় যথাক্রমে ৬ কোটি ৮৬ লাখ এবং ৪ কোটি ৫৩ লাখ। ১৯৭১ সালে আমাদের দেশে যে জনসংখ্যা ছিল, প্রায় সেই পরিমাণ মানুষ এখন দরিদ্র। দরিদ্র্যের সংখ্যা যাই হোক দেশের প্রায় সাড়ে ছয় কোটি মানুষ আজ বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে চলছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে এদের সংখ্যাও বাড়ছে। এই বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার প্রায় চার কোটি মানুষ হত দরিদ্র যাদের চাল চুলা কিছুই নেই। সীমিত অধিকার নিয়ে অন্যের দয়ার ওপর এরা কোনক্রমে বেঁচে আছে।

মানব সমাজ নারী ও পুরুষ উভয়কে নিয়ে গড়ে উঠেছে। নারী হচ্ছে রাষ্ট্রের অর্ধেক জনসংখ্যা এবং মানব সম্পদ। নাগরিক হিসাবে নারীর অধিকার রয়েছে সমাজের সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহন ও অংশদারিত্ব অর্জনের। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় আমাদের সমাজের নারীরা সকল ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ। অধিকাংশ সমাজে দরিদ্র, বেকার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগনের মাঝে সংখ্যা গরিষ্ঠ হচ্ছে নারী। অধিকিন্তু লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও অধস্তনাতাজনিত বাড়তি চাপও নারী সহ্য করে। বাংলাদেশ জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ। বাংলাদেশের জন সংখ্যার অর্ধেকই নারী। আর আমাদের দরিদ্র্য দেশের দারিদ্র্য সবচাইতে রুঢ়তম রূপ নিয়ে যাদের কাছে দেখা দেয়, তারা হলো দরিদ্র মহিলা। আমাদের দেশের ৫১ শতাংশ গ্রামীন জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে যার সিংহ ভাগই হল নারী। আমাদের দেশের দারিদ্র্যের বোঝা পুরুষদের চেয়ে মহিলারাই বেশি বহন করে। পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পেশা প্রভৃতিসহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই মহিলারা পুরুষের তুলনায় সুবিধাবঞ্চিত একটি গোষ্ঠী।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশের নারীরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে পিছিয়ে আছে। উন্নয়ন বিশারদরা তাদের গবেষণার ভিত্তিতে দেখেছেন যে তৃতীয় বিশ্বের যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছিলো তাতে নারীরা অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনি, এবং যতক্ষন না নারীরা এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে, ততক্ষন সেই সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবেনা। বাংলাদেশের নারী সমাজ উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজন, প্রচলিত মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারনা, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, ধর্মীয় মূল্যবোধের ফলশ্রুতি হিসাবে পর্দাপ্রথা এবং প্রথাগত ঐতিহ্যিক মনোভাবের কারণে নারীরা হলো সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। মহিলারা এই দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা হয়েও মূলত নিদারুন দারিদ্র্য। মহিলাদের আয় এক চতুর্থাংশ। একজন নারী পুরুষের তুলনায় ১২% কম পুষ্টি গ্রহণ করে। স্বাধীনতার পর থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, নেওয়া হয়েছে নানা প্রকার উদ্যোগ। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য সংস্থা। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক এই নারী সমাজকে পিছনে ফেলে দারিদ্র্য বিমোচন তথা উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের সমাজের এই অবহেলিত ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সম্যকভাবে জানা এবং দারিদ্র্যবিমোচন তথা দেশের উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকাকে তুলে ধরার জন্য এই গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে। গ্রাম-উন্নয়নে তাদের বাস্তব ভূমিকা, কার্যকারিতা এবং উন্নয়নে তাদের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

গ্রামীন জীবনের পুনর্গঠনের বিষয়টি এখন আর কোন দুরবর্তী ভবিষ্যতের বিষয় নয়। এটা এখন বর্তমানেরই ইস্যু। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের গ্রামীন অর্থনীতি এবং সমাজ নিয়ে এ যাবত বেশ গবেষণা হয়েছে। এই গবেষণার অংশ নিয়েছে সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বাংলাদেশের ৫১ শতাংশ গ্রামীন জনগণ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস যার সিংহভাগই নারী।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। বাংলাদেশের নারীরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। নারীর সামাজিক সাংস্কৃতিক অবদানকে অস্বীকৃতির মাধ্যমে সমাজে নারীর অধস্তনতা তৈরি হয়েছে। আমাদের সমাজে পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বত্র পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য বিরাজমান। পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণা এবং মূল্যবোধের উৎসারিত পরিবার ব্যবস্থায় মমতাময়ী মাতৃত্বকে পিতৃতান্ত্রিক শাষনব্যবস্থা দৃঢ় ও শক্তিশালী করেছে। আবার প্রত্যহিক গৃহস্থালী কার্যকর্ম দিয়ে নারীকে পরাধীন করে রাখা হয়েছে। পরিবারের বাইরে বৃহ্য কর্মক্ষেত্রে অর্থকরী কাজে নিয়োজিত নারী লিঙ্গীয় শোষনের শিকার হয়। বাংলাদেশের পিতৃতন্ত্র, লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন, মাতৃত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা নারী সমাজের উন্নয়নের মূল সমস্যা। নারী সমাজের উন্নয়নের পথে এই সব অন্তরায় সত্ত্বেও সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ক্রমেই বেড়ে চলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অন্দরমহলের দরজা ফাঁক করে মহিলারা কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সব রকম ক্ষেত্রেই মেয়েরা কাজকর্ম শুরু করে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের সামাজিক উৎপাদনশীলতায় নারীর অংশগ্রহন দিনদিন বেড়ে চলছে।

বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ হওয়ার কারনে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বৈদেশিক সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাগুলো প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়নের উপর জোর দেয়। বাংলাদেশে ৮০-এর দশক থেকে নারী উন্নয়নের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ পরিকল্পনা কর্মসূচীতে স্থান নেয়। দারিদ্র্যবিমোচন ও নারী উন্নয়নখাতে বৈদেশিক সাহায্য এসেছে প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য এবং তা বাস্তবায়িত হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রচেস্টায়। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যদূরীকরণে বিভিন্ন প্রকল্পভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসুচিতে বেসরকারি সংস্থাগুলো ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। বেসরকারি সংস্থার মতে দারিদ্র্যবিমোচন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা ব্যাপক এবং মহিলারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের মাধ্যমে তাদের সনাতন ও পশ্চাৎপদ ভূমিকা থেকে বেরিয়ে আসছে। বর্তমানে দারিদ্র্যবিমোচন মহিলাদের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

তাই দারিদ্র্য বিমোচন তথা সমাজ উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকাও কার্যকারিতা গবেষণার মাধ্যমে যাচাই করে দেখার জন্য এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ করে আমার গবেষণা এলাকায় কিভাবে দারিদ্র্যদূরীকরণের চেষ্টা চলছে এবং দারিদ্র্যবিমোচন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয়েছে তা যথার্থভাবে জানা এবং এক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা মূল্যায়ন করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য। নিম্নে এই উদ্দেশ্যগুলোকে ধারাবাহিকভাবে দেখানো হলো :-

১. বাংলাদেশের দারিদ্র্যতার প্রকৃতি ও ধরণ সম্পর্কে জানা।

২. বাংলাদেশের দারিদ্র্যবিমোচন প্রচেষ্টায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ।

৩. মহিলাদের অংশগ্রহনের ফলে দারিদ্র্যবিমোচন সহায়ক হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখা।

৪. দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য মহিলারা কি কি ধরনের কাজ করে থাকে তা জানা।

৫. অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের সফলতা যাচাই করে দেখা।

৬. গবেষনা এলাকায় দারিদ্র্যবিমোচনে বিভিন্ন এনজিওর কার্যক্রম যাচাই করে দেখা।

৭. সর্বোপরি গবেষণা এলাকার মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর অধিকার, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জানা।

১.৩. গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের সাড়ে ছয় কোটি মানুষ আজ বেচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে চলছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এদের সংখ্যাও বাড়ছে। বাংলাদেশের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় চার কোটি মানুষ হতদরিদ্র, যাদের চালচুলা কিছুই নেই। সীমিত অধিকার নিয়ে অন্যের দয়ার ওপর এর কোন ক্রমে বেচে আছে। এই দারিদ্র্যজনগোষ্ঠীর দারিদ্র-বিমোচনের জন্য চলছে নিরন্তর প্রচেষ্টা। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশ এ দেশের দারিদ্র্যবিমোচনের সাহায্যে দিচ্ছে বছরের পর বছর। দারিদ্র্য নিরসনে গত ৩০ বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও দেশে দারিদ্র্য কমেছে ১ শতাংশ হারে। সরকার ও বেশিভাগ এনজিওর সকল কর্মকান্ড এখন আবর্তিত হচ্ছে এই দরিদ্রদের ঘিরে। অথচ দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর ৩১ শতাংশই কোন কাজ পাচ্ছে না। আমাদের দেশের জনসংখ্যা বেড়ে চলছে ১.৪৮ শতাংশ হারে। দারিদ্র্যহ্রাস এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবধানের কারণে দেশে বাড়ছে দারিদ্র্যের সংখ্যা।

বাংলাদেশে ১৩ কোটি ৫০ লাখ মানুষের মধ্যে ৬কোটি ৩৪ লাখ মানুষ দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। আমাদের দেশের দারিদ্র্যের বোঝা পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশি বহন করে। আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজন, শিক্ষা, অভাব, প্রচলিত মূল্যবোধ প্রভৃতি কারণে নারীরা সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠী। আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান প্রতিটি ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ। বাংলাদেশের নারীরা রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে পুরুষের তুলনায় নারী পিছিয়ে আছে। প্রচলিত প্রথা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজের নারীরা এখানো সমাজের মুলস্রোতধারা থেকে পিছিয়ে আছে।

কিন্তু নারী সমাজকে উন্নয়নের মুল স্রোতধারায় সমতার ভিত্তিতে সম্পৃক্ত করতে না পারলে প্রত্যাশিত অগ্রগতি সম্ভব নয়। যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারী সমাজের সমান অংশগ্রহন অন্যতম পূর্বশর্ত বলে বিবেচিত। তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করতে হলে নারীদের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন নারী শিক্ষার প্রসার, পরিবারে, সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতাবিধান এবং নারীর ক্ষমতায়ন।

নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবদানকে অস্বীকৃতির মাধ্যমে সমাজে নারীর অধস্তনতা তৈরি হয়েছে। আমাদের দেশে পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বত্র পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য বিরাজমান। এই আধিপত্য সত্ত্বেও সামাজিক অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই নারীর ভূমিকা ক্রমেই বেড়ে চলছে। আমাদের নারী বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন, তার নিজস্ব যোগ্যতায় নির্ভর করেছেন নিজের ক্ষমতার ওপর। সমানাধিকারের জন্য প্রয়োজন

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের উপযুক্ত করে নিজেকে গড়ে তোলা। এখন কোন পেশা বা কাজ নেই যেখানে নারী অনুপস্থিত। অফিস, আদালত ও সরকারি উচ্চ পদগুলোতে নারীর অংশগ্রহন বেড়েছে। চ্যালেঞ্জিং পেশা- যেমন সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী পাইলট হিসেবে তারা পুরুষের পাশাপাশি দক্ষতার সাথে কাজ করছে। পাবলিক পরীক্ষায় চোখ ধাধানো ফলাফল করে মেধা ও যোগ্যতার প্রমান রেখেছে মেয়েরা। গ্রামবাংলার নারীরা ও আজ প্রত্যয়ী। তারা আর দারিদ্র্যের কষাঘাতে জীবনদান করতে ইচ্ছুক নয়। তারা আজ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। সমাজে এসেছে পরিবর্তনের ধারা। প্রতিটি গ্রাম-সমাজের চেহারা আজ পরিবর্তনের দিকে। দেশের নারী সমাজকে বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা উদ্দেশ্য সাম্প্রতিক কালে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋনের আওতায় উপকৃত জনসংখ্যা দেড় কোটি। এর মধ্যে ১ কোটি ৩০ লাখ মহিলা এবং মাত্র ২০ লাখ পুরুষ। ক্ষুদ্র ঋণের সঠিক ব্যবহার এবং ঋণের কিস্তি ফেরতদানের ক্ষেত্রে শতকরা ৯৫ ভাগ সাফল্যে মহিলারা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গত তিন দশকে ক্ষুদ্র ঋনের লেনদেন গোটা দেশ জুড়ে এক নীরব বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। যার সিংহভাগ অংশীদার হচ্ছে নারীরা। নারীর এই জাগরন, ও উন্নয়নকে গভীরভাবে অনুসন্ধানের মধ্যেই এই গবেষণার যৌক্তিকতা নিহিত।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমেই গবেষণা কর্ম সুচারুভাবে সম্পূর্ণ করা হয়। গবেষণাকে নির্ভরযোগ্য ও বাস্তবভিত্তিক করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রয়োগ প্রয়োজন। গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে কি কি পদ্ধতি ব্যবহার করতে তা গবেষককে নির্ধারন করতে হবে। সামাজিক বিজ্ঞানের মতো নৃবিজ্ঞানের গবেষনায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা কৌশল। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য যে কোন শাখার গবেষণার চেয়ে নির্ভরযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে একাধারে যেমনি নিজস্ব ধারায় তথ্য সংগ্রহের কৌশলের বিকাশ ঘটিয়েছেন তেমনি সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার গুরুত্বপূর্ন কৌশলসমূহের সংযোজন ঘটিয়েছেন তাদের গবেষণায়। নৃবিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়বস্তু স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা

হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট গবেষণায় বিভিন্ন প্রকৃতির তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে একই সাথে একাধিক তথ্য সংগ্রহের কৌশল অবলম্বন করা যায়।

তথ্য সংগ্রহের উৎস

যে কোন গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এই গবেষণায় বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই উৎসগুলো প্রধানত দুই প্রকারের। যথা :

i) Primary Sources and

ii) Secondary Sources.

i) Primary Sources:

গ্রামে বসবাসরত নারীদের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত। এমারগাঁও গ্রামের নারীদের থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রশ্নমালা, ব্যক্তিগত জরিপ এবং পর্যবেক্ষণ, কেস স্টাডি, জীবন ইতিহাস, আদমশুমারী, মৌখিক বা অলিখিত ইতিহাস ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

i) Secondary Sources:

বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, পূর্ববর্তী বিভিন্ন গবেষণাকর্ম, বিভিন্ন সামাজিক সাময়িকী, প্রবন্ধ ও সংশ্লিষ্ট বই ইত্যাদি এই গবেষণায় গৌন উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও এই এলাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন এনজিওর থেকে প্রাপ্ত তথ্য গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও পদ্ধতি:

এমারগাও গ্রামে বসবাসরত মহিলাদের প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসাবে তাদের কাছে থেকে তাদের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এমারগাও গ্রামে বসবাস করে অসংগঠিত ভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিবিড় প্রত্যাক্ষনুসন্ধান পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের জীবন-যাপন সম্পর্কে ধারণা নেওয় হয়েছে এবং তাদের কাজের ধরন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাদের পেশাগত কাজের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসাবে এমারগাও গ্রামে ৭৪ জন নারীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এমারগাও গ্রামে

বসবাসরত কর্মজীবি নারীর মধ্যে থেকে সরল নির্বিচারি নমুনায়ণ পদ্ধতিতে ৭৪ জন নারীকে গবেষণার জন্য বেছে নেওয়া হয়।

প্রথম পর্ব:

প্রথমেই এলাকায় বেশ কিছুদিন বসবাস করে এলাকার জনগণের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে এলাকার জনগণের সাথে সরলভাবে মিশে, গল্প করে, শুভেচ্ছা বিনিময়, সাধারণ আলোচনা, ইত্যাদির মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পর্বে এমারগাঁও গ্রামের উপর বিভিন্ন ধরণের তথ্য সংগ্রহের করা হয়। এই গ্রামের অবস্থান আয়তন, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক কার্যাবলী, চিকিৎসা ব্যবস্থা, এনজিওদের কার্যক্রম, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি ব্যাপক পর্যবেক্ষন অব্যাহত ছিল এবং এলাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে ধারনা অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব:

এই গবেষণায় প্রধান তথ্যদাতা হিসাবে নেওয়া হয়েছে গ্রামের একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে, একজন প্রবীন প্রাইমারী শিক্ষককে এবং পরিবার পরিকল্পনা অফিস থেকে অবসর প্রাপ্ত একজন আয়াকে। গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তি গ্রামের অতীত ও বর্তমান কালের তথ্য অত্যন্ত নিখুত ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। গ্রামের প্রাইমারী প্রবীন শিক্ষক গ্রামের শিক্ষা ও পেশাগত তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। অবসর প্রাপ্ত আয়া গ্রামের মহিলাদের বিভিন্ন পেশাগত কাজের ধরন সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন। এদের দেওয়া তথ্য থেকে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি এবং এলাকা সম্পর্কে দ্রুত অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

অসংগঠিত সাক্ষাৎকার:

এই পর্যায়ে গ্রামের মহিলাদের থেকে তথ্য সংগ্রহের সময় অসংগঠিত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উত্তর দাতাদের সাথে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করেছে এবং নারীর পেশাগত কাজের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। কোন ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্য পরিত্যক্ত হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার জন্য একজন মহিলার সাথে দুটি অথবা তিনটি অসংগঠিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসংগঠিত সাক্ষাৎকারে

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার বিষয়বস্তু যতটা সম্ভব মনে রেখে দ্রুত বাসস্থানে ফিরে সেগুলো নোট করে রাখা হয়েছে। তাছাড়া তথ্যদাতার উপর কোনরকম চাপ সৃষ্টি না করে, সরল সহজভাবে একটি বিষয় উপস্থাপন করা হলে তথ্যদাতা নিজেরাই আগ্রহসহকারে অনেক প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক অনেক তথ্য প্রদান করে থাকে। এ গবেষণার বেশিরভাগ তথ্যই অসংগঠিত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে।

তৃতীয় পর্ব

ঘটনা অনুধ্যান

অসংগঠিত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গ্রামের মহিলাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের সময় জানা যায় তাদের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। এসব কেস স্টাডি করে গ্রামের মহিলাদের জীবন ও তাদের পেশাগত কাজের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে জানা যায়। এর মাধ্যমে ঘটনার গভীরে পৌঁছে বিশদ ও সুগভীর তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে।

গভীর পর্যবেক্ষণ

তৃতীয় পর্যায়ে গভীর পর্যবেক্ষন করা হয়। গ্রামের মহিলাদের অনেক গোপনীয় বিষয় আছে যেগুলো পর্যবেক্ষনের চেষ্টা করা হয়।

অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষন

গবেষণার তৃতীয় ধাপে এ পদ্ধতিতে কাজ করা হয়। উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহারের পূর্বশর্ত ছিল অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষণ এবং এ পদ্ধতি নৃবিজ্ঞানের গবেষণার মূল পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত। গবেষণার সবগুলো পর্যায়েই এটি অনুসৃত হয়ে থাকে। অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গ্রামের মেয়েদের কাজের ধরন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা হয়। গ্রামের মহিলাদের কাজের পরিবেশ নানা ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও পেশা সম্পর্কে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করা হয়। গ্রামীন পরিবেশে ঘরের বাইরে কাজ করতে কি কি প্রতিকূল পরিবেশ তাদের মোকাবেলা করতে হয় তা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহের অন্যান্য কৌশল

নোটবুক ব্যবহারঃ

মাঠ পর্যায়ে গবেষণায় ফিল্ড নোট বুক অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। এটি সব সময় সাথে রাখা হয়েছে মাঠকর্মের সময় ঘটমান ও দৃশ্যমান বিষয়ের টুকিটাকি লিপিবদ্ধ করার জন্য। মাঠকর্মের অনেক তথ্য পরবর্তীতে ভুলে যাবার অবকাশ থাকে তার জন্য গবেষণার যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা অতি দ্রুত এই নোট বুকে লিখে রাখা হয়।

ডায়েরি

ডায়েরি ব্যবহারঃ

এ ক্ষেত্রে গবেষণাকালে ডায়েরি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিদিন মাঠকর্ম শেষে বাড়ি এসে ডায়রিতে সব অভিজ্ঞতা এবং তথ্য লিখে রাখা হয়েছে। গবেষণা স্থানের গবেষকের দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষিত বিষয়বস্তু এ ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মাঠকর্মের অভিজ্ঞতা ধারাবাহিকভাবে এই ডায়েরিতে লিখে রাখার ফলে থিসিস রচনাকালে এই ডায়েরি খুব সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

লগ

গবেষণা ক্ষেত্রের সময় এবং অর্থের হিসাব রাখা প্রয়োজন হয়। লগ হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের নোটবুক যাতে গবেষক তার প্রতিদিনের সময় ও অর্থের পরিকল্পনা করে রাখেন। এই নোটবুক থেকে গবেষণায় কি পরিমান অর্থ ও কতটুকু সময় ব্যয় হয়েছে তা বোঝা যায়।

১.৫ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

গবেষণার জন্য নির্ধারিত সময়ের বন্টন

প্রথমবার গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য যাওয়া হয়েছে ৬ আগষ্ট ২০০৬ সালে। ২০০৬ সালের আগষ্ট মাস থেকে শুরু করে ২০০৭ সালের ৬ মার্চ পর্যন্ত মোট ৮ মাস গবেষণা ক্ষেত্রে অবস্থান করা হয়েছে। এই সময় গ্রাম পরিদর্শন করা হয়েছে। গ্রামের আয়তন, ভৌগলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, এলাকাবাসীর পেশা, অর্থনৈতিক কার্যাবলী, খাদ্যভ্যাস, উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা ইত্যাদি বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষন করা হয়। এলাকাবাসীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াপর পর তাদের জীবনযাত্রার সমগ্র বিষয় সম্পর্কে পর্যবেক্ষন অব্যাহত থাকে। এই সময়

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান তথ্যদাতা নির্বাচিত করে গ্রাম সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা হয়। এলাকাবাসীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক স্থাপন এবং এলাকা সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করার পর প্রায় প্রতিদিনই অসংগঠিত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপ পরিচালনার সময় ৪ জনের কেস স্টাডি করা হয়। দ্বিতীয় বার গ্রাম পরিদর্শনে যাওয়া হয় ১মে ২০০৭ সালে এবং ফিরে আসা হয় ১ জুন ২০০৭ সালে। এই সময় গবেষণাক্ষেত্রকে আবার নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করা হয়েছে। গবেষণার জন্য প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের পুন:মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং উপাত্তসমূহকে পুণ:বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেস স্টাডিগুলো পুনঃনিরীক্ষণ করে ১জুন ২০০৭ সালে গবেষণাক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা হয়।

উপাত্ত উপস্থাপন

আমার গবেষণার বিষয় ছিল দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নের নারী সমাজের ভূমিকা। উন্নয়নে নারীর ভূমিকাকে জানার জন্য এই গবেষণায় গুনবাচক ডাটা ও সংখ্যাতাত্ত্বিক ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এই গ্রামে বসবাসরত ৭৪ জন মহিলার কাছ থেকে যারা বিভিন্ন আয় উপার্জনকারী কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে এদের পারিবারিক জীবন ও পেশাগত কাজের ধরণ সম্পর্কে জানা যায়। গবেষণার বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলা জন্য উপাত্ত স্থাপন অপরিহার্য যার জন্য প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত করে মূল্যায়ন করা হয়। এই গবেষণায় তথ্য উপস্থাপনের জন্য কয়েকটি পরিসংখ্যানের টেবিল ব্যবহার করা হয়েছে। এই টেবিলগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করে সুবিন্যাস্ত অবস্থায় ব্যাখ্যা সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমদিকে তারা আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহপ্রবন ছিল এবং কথা বলতে দ্বিধাবোধ করছিল। তারা আমাকে সরকারি জরিপের লোক বা এনজিও কর্মী ভেবেছিল। গ্রামবাসীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক স্থাপনের পর এবং আমার উদ্দেশ্য লেখাপড়া সংক্রান্ত জানার পর গ্রামবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে সহযোগিতা করে। আমার কাজ ছিল গ্রামের মহিলাদের নিয়ে। আমাদের দেশের গ্রামের মহিলার এখন পর্যন্ত বাইরের

Dhaka University Institutional Repository

লোকের সাথে কথা বলতে পারিবারিক ও সামাজিক বাধার সম্মুখীন হয়। যার কারণে প্রথমদিকে তথ্য সংগ্রহ করতে কিছুটা অসুবিধা হয়। গ্রামের মহিলাদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আরেকটি সমস্যা হয়েছিল যে গ্রামের মহিলারা বেশীর ভাগ সময় গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত থাকত।

১.৭ গ্রন্থ পর্যালোচনা

দারিদ্র্য, দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়ন ভিত্তিক কিছু গ্রন্থের পর্যালোচনা করা হলো-

কামাল সিদ্দিকী বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্য স্বরুপ ও সমাধান গ্রন্থে গ্রামীন বাংলাদেশে দারিদ্র্যায়নের ঐতিহাসিক চিত্র তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি ঔপনিবেশিক বাংলাদেশের দারিদ্র্যের তথ্যগত প্রমানের উৎসসমূহকে তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন এসব তথ্যের দুর্বল তত্ত্বগত ভিত্তি সত্ত্বেও এগুলো হচ্ছে ঔপনিবেশিক আমলে দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করার একমাত্র উৎস। এরপর কামাল সিদ্দিকী ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৬-৬৯ সাল বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরূপনের জন্য যেসমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর তিনি ১৯৭১ সাল অর্থাৎ স্বাধীনতাউত্তরকালে বাংলাদেশের দারিদ্র্যনিয়ে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে তার বর্ণণা দিয়েছেন। বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে গ্রামীন দরিদ্র্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করেন। তার সনাক্ত করনের ভিত্তি ছিল খাদ্য, পোষাক, আশ্রয়, শিক্ষার মতো কিছু কিছু মৌলিক চাহিদা পূরনের সুযোগ, স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের মালিকান, আয়-ব্যয়ের বিন্যাস এবং লাভজনক কর্মসংস্থান। সিদ্দিকী উৎপাদনের প্রধান উপকরণ কৃষি জমির ভিত্তিতে গ্রামীন সমাজকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। এই সাতটি শ্রেণীর দারিদ্র্যতা নিরসন করার জন্য সিদ্দিকী তাদের দৈনিক ক্যালরি এবং প্রোটিন গ্রহন, বসতবাড়ির অবস্থা, গড় পোষাক ভোগের বিন্যাস, সাক্ষরতা হার, সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজিরা, টেকসই ভোগ্যদ্রব্যের মালিকানা, গৃহস্থালীয় গড়পড়তা আয়-ব্যয়ের সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন যার দ্বারা গ্রামীন দরিদ্রদের জীবন যাপন পদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কামাল সিদ্দিকী উন্নয়ন নীতির অসঙ্গতি এবং দারিদ্র্যনিয়ে আলোচনাকালে দেখিয়েছেন যে সরকার দারিদ্র্য দূরীকরনের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করলেও তা বাস্তব পরিস্থিতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ন হওয়ার ফলে সরকারি নীতিমালা দারিদ্র্যদুরীকরনের কার্যকরী ভূমিকা রাখছে না। গ্রামাঞ্চলে

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি আলোচনা কালে পল্লী পূর্তকর্ম এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি অনেক গুনগত ও সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যের উপস্থাপন করেন এবং প্রামান করেন যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ত্রানমুখী লক্ষ্যভিত্তিক হওয়ার কর্মসূচিটি স্থায়ী অবকাঠামো তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতা গড়ে তুলতে পারেনি ফলে সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন সম্ভব হয় নাই। কামার সিদ্দিকী তার বইতে গ্রামীন খাতে প্রত্যক্ষ উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি আলোচনাকালে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি সমাবায় সমিতি, গ্রামীন শিল্পায়ন, গ্রামীন কৃষি ঋণ ব্যবস্থা, কৃষিখাতে উপকরন সরবরাহ নিয়ে অত্যন্ত নিখুতভাবে আলোচনা করে। দারিদ্র্যতা হ্রাস এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে এসব কর্মসুচি কতটুকু সফল ও কি পরিমান ব্যর্থ তা তুলে ধরেছেন। কামাল সিদ্দিকী ভূমি-সংস্কার ও দারিদ্র্য নিরসন বর্ণনাকালে দারিদ্র্যহ্রাসে ভূমি সংস্কারের ভূমিকা অত্যন্ত জোরালোভাবে আলোচনা করেন। তারমতে ভূমি হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশের উৎপাদনের প্রধান উপায় এবং সামাজিক মর্যদার বৈশিষ্ঠ্যমূলক প্রতীক। ফলে ভূমির পূনবন্টন এবং স্বত্বের সংস্কার সমাজের বিরাজমান রাজনৈতিক ক্ষমতার সমীকরন ও মতাদর্শগত আধিপত্যকে দরিদ্রদের অনুকুলে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে এবং রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রকেও প্রভাবিত করতে পারে। তার মতে চূড়ান্ত ও আপেক্ষিক দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমি-সংস্কারের একটি শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। লক্ষ্যদল কেন্দ্রিক গ্রামীন উন্নয়নের প্রচেষ্টা আলোচনা কালে তিনি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। এখানে তিনি কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরন সমালোচনাসহ আলোচনা করেন। গ্রামীন বাংলাদেশের দারিদ্র্য মোচনের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচনাকালে কামাল সিদ্দিকী রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ, গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোর পক্ষপাত, গণ আন্দোলন, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সমূহ, জনসংখ্যার চাপ, সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ কিভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা বিস্তারিত তুলে ধরেছেন।

কামাল সিদ্দিকী বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি নামক গ্রন্থে দারিদ্র্য বিষয়ক ধারনা অধ্যায়ে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা, দারিদ্র্যের পরিমান, বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া দারিদ্র্যের ব্যাখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্যগবেষণার অবস্থা আলোচনা করতে যেয়ে ঔপনিবেশিক আমলের দারিদ্র্যগবেষণা, পাকিস্তান আমলে দারিদ্র্যের পরিমান, ব্যাখ্যা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দারিদ্র্যের পরিমাপ ও ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। কামাল সিদ্দিকী উৎপাদন শক্তিসমূহের উদ্ভব আলোচনাকারে উল্লেখ করেছেন যে প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতার ধারা দিয়েই দারিদ্র্যকে ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি জগৎপুর গ্রামবাসীর পেশা, জনসংখ্যার বন্টন, খাদ্য গ্রহনের মাত্রা, স্বাস্থ্য, পানি ব্যবহার ও পয়ঃব্যবস্থা, চিকিৎসা ও শিক্ষার সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন এবং বলেছেন উৎপাদিকাশক্তির উন্নয়নে স্থির রয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে। উৎপাদন ও বিনিময় সম্পর্ক আলোচনাকালে পরিবার প্রধানের পেশা, কৃষি জমির পরিমান, বিভিন্ন প্রকার উৎপাদানক্ষেত্রের মালিকানা অ-অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত আহরন নিয়ে আলোচনার করেছেন। কামার সিদ্দিকী উপরিকাঠামো ও দারিদ্র্য আলোচনার কালে জগৎপুর গ্রামের প্রেক্ষিতে উৎপাদন ও বন্টনের উপর উপরি কাঠামের প্রভাব, যেমন- ধর্মীয় ও ধর্মীয়- সামাজিক সংস্থা ও আচার আচরন প্রভাবশালী আদর্শও মূল্যবোধ ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িকতা, উপদলসমূহ সমাজ, সালিশ, ইউনিয়ন পরিষদ, আত্নীয়তা, বিনোদন ও প্রমোদ, বাজারের ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পর্কে আলোচনাকালে উপরিকাঠামো ও দারিদ্র্যের মধ্যেকার সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি দেখান যে বিগত পঞ্চাশ বছরে নারী শিক্ষার ব্যাপারে কিছু উন্নতি ঘটেছে এবং নারী শিক্ষার পক্ষে মাতাবলম্বীদের সংখ্যাও বেড়েছে। মুসলমান ও ধনীদের তুলনায় হিন্দু ও দারিদ্রর মধ্যে পর্দা ও গৃহের বাইরে কাজের ব্যাপরে মনোভা বেশি নমনীয়। দারিদ্র্যই দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের কাজের জন্য ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছে। জনাব সিদ্দিকী জগৎপুরের দারিদ্র্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সাড়া বর্ননাকালে সরকার জগৎপুরের উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন তা তথ্যভিত্তিক উপস্থাপন করেন। সরকারি উন্নয়ন প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য হ্রাস করার চেয়ে সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারি ও গ্রামীন অভিজাতও ধনী শ্রেনীই বেশী লাভবান হয়।

দারিদ্র্যের প্রতি দারিদ্র্যের প্রতিক্রিয়া আলোচনাকালে জনাব সিদ্দিকী, ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক, যৌথ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পর্যায়ে প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি পেশাগত প্রতিক্রিয়া, দারিদ্র্যের ভোগ প্রতিক্রিয়া ও যৌথ ও রাজনৈতিক পর্যায়ে প্রতিক্রিয়া আলোচনাকালে

দেখেন যে, পঞ্চাশ বছর আগে জগৎপুরের দরিদ্রদের দারিদ্র্যতার বর্তমান অবস্থার চেয়ে কম ছিল। কামাল সিদ্দিকী বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যের শহুরে প্রেক্ষিত বর্ণনাকালে বাংলাদেশের শহর ও গ্রামীন খাতের মধ্যে সম্পদ বন্টনের প্রক্রিয়ায় শ্রেণী পক্ষপাতকে পাশ কাটিয়ে, শহুরে পক্ষপাত ঘটেছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য জনাব সিদ্দিকী শহুরে খাতের শ্রেণী বিশ্লেষণ করেছেন। শহরের জনগোষ্ঠীর শ্রেণী বিশ্লেষণ কালে লেখক সরকারি উন্নয়ন ব্যয়ের পক্ষপাতিত্ব, সরকারি ঋণ নীতিতে পক্ষপাত, খাদ্য রেশনিং নীতিতে পক্ষপাত, করনীতির পক্ষপাত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সরকারি ঋণ নীতিতে পক্ষপাত আলোচনাকালে লেখন দেখেন যে সরকারি খাতে ব্যাপক হারে ঋন প্রদান শহুরে দরিদ্রদের সাহায্যে করা চেয়ে রাতারাতি নব্য ধনী সৃষ্টি করতে সাহায্য করে ও এর ফলে দরিদ্রদের দারিদ্র্য আরো তীব্র হয়। সরকারি বিভিন্ন নীতিমালা কার্যপ্রনালীতে সুবিধাভোগী হচ্ছে শহুরে ও গ্রামীন ধনীরা, শহুরে ও গ্রামীন দরিদ্ররা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হচ্ছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে। বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যের বৈদেশিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষন কালে জনাব সিদ্দিকী বৈদেশিক বিনিয়োগ, চোরাচালান, মেধাপাচার বিদেশী সাহায্য আলোচনা কালে এসব সাহায্যের মধ্যে যে অনিয়ম ও দুর্নীতি তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন এবং বলেন বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ ও সাহায্য গ্রামীন দারিদ্র্যহ্রাস করার চেয়ে দারিদ্র্যকে আরো প্রকট করে তুলছে।

ড. মুহাম্মদ সামাদ বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যমোচনে এনজিওর ভূমিকা নামক গ্রন্থে বাংলাদেশের দারিদ্রতার অবস্থান, গ্রামীন দারিদ্র্যর সংজ্ঞা, গ্রামীন দরিদ্রদের সমস্যা ব্যাখা করতে যেয়ে দরিদ্র্যদের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করেন। মহিলাদের দারিদ্র্যতা বর্ণণা করতে গিয়ে লেখক উল্লেখ করেন যে গ্রামে দারিদ্র্যতার রূঢ়তম রূপ দেখা যায় মহিলাদের মাঝে। বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যমোচনে কর্মসূচি আলোচনা কালে লেখক বিগত কয়েক দশকের পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টার ত্রুটিগুলো তুলে ধরেন। বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে বোর্ডের গ্রামীন দারিদ্র্য কর্মসূচি ও গ্রামীন ব্যাংকের আয় বর্দ্ধক কর্মসংস্থানের কার্যক্রমগুলো তুলে ধরেন। লেখক উল্লেখ করেন যে গ্রামীন দারিদ্র্য কর্মসূচি গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অত্যন্ত সফলভাবে তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে এবং দিন দিন গ্রামীন ব্যাংকের দারিদ্র্য মোচনে প্রয়াস বিস্তৃত হচ্ছে। ড. মুহাম্মদ সামাদ গ্রামীন দরিদ্র

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচির ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ও গ্রামীন ব্যাংকের ভবিষ্যৎ সফলাতা কতটা স্থায়ী হবে তা নিয়ে আলোচনা করেন। ড. সামাদ বাংলাদেশে গ্রামীন দারিদ্র্যমোচনের কৌশলগত দিক ও জনগনের অংশগ্রহণঃ দক্ষিণ ও দক্ষিন পুর্বে এশিয়ার অভিজ্ঞতা আলোচনাকালে বলেন দক্ষিন ও দক্ষিন পুর্ব এশিয়ার দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশেই গ্রামীন দরিদ্র জনসংখ্যা সব চাইতে অধিক। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে দক্ষিন ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের উন্নয়নশীলদেশসমূহের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তার কার্যকারিতা সফলতা, অসফলতা ও ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেন। লেখক উল্লেখ করেন যে এনজিওসমূহ কর্তৃক পরিচালিত দারিদ্র্যমোচন উদ্যোগসমূহে মহিলাদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে গ্রামীন ব্যাংক শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ, ব্র্যাক শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ এবং অন্যান্য সংস্থাও অধিক হারে দরিদ্র মহিলাদের তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত করছে। ড. সামাদ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের অংশগ্রহনমূলক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির কয়েকটি সফল উদ্যোগ, যথাঃ ভারতের ভূমি সেনা আন্দোলন, নেপালের ক্ষুদ্র কৃষক ভূমি উন্নয়ন কর্মসূচি, ফিলিপাইনের সাবিলাকাস, শ্রীলঙ্কার অংশগ্রহনমূলক বিকল্প উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। লেখক বাংলাদেশে গ্রামীন দারিদ্র্যমোচনে এনজিওর ভূমিকা শীর্ষক প্রবন্ধে এনজিওর শ্রেনীবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেন। ড. সামাদ গ্রামীন দারিদ্র্যমোচনে এনজিও, মানবিক উন্নয়ন ও গ্রামীন দারিদ্র্যের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধিতে এনজিওর যে বিতর্ক রয়েছে তার প্রতি আলোকপাত করেন এবং পরিশেষে তিনি বলেন যে ত্রান ও পুবার্সনের বাইরে এনজিও সমূহকে যদি বিকাশমান শিল্পখাত হিসেবে বিবেচনায় আনলে এনজিওর ইতিবাচক ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শ্রমের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করে ও তাদের অংশগ্রহনকে উৎসাহিত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য মানোন্নয়নের সম্ভব হবে।

আমার বাংলাদেশ গ্রন্থের লেখক মেঘনা গুহঠাকুরতা। এই গ্রন্থের বাংলাদেশের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য ও নারী সমাজ শীর্ষক প্রবন্ধে মেঘনা গুহঠাকুরতা বলেন বাংলাদেশ প্রচন্ডভাবে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল একটি দেশ এবং উন্নয়নকাজের জন্য সর্বমোট ব্যয়ের শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ আসে বৈদেশিক সাহায্য থেকে। বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য আসে তিনভাবে খাদ্যদ্রব্য সাহায্য,

Dhaka University Institutional Repository

পন্যদ্রব্য সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য। প্রকল্প সাহায্যের পরিমান দিন দিন বেড়ে চললেও এবং সরকারি বিবৃতিতে গ্রামীন উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরনের কথা বলাহলেও অধিকাংশ সাহায্য যায় যোগাযোগ ও জনসংযোগ খাতে, শক্তি ও শিল্পের খাতে। নারী উন্নয়ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর আবির্ভাব আলোচনাকালে লেখক আন্তর্জাতিক পরিসরে নারী উন্নয়ন চিন্তা কিভাবে বৈদেশিক সাহায্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছে তার তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করেছেন। মেঘনা গুহঠাকুরতা উল্লেখ করেন যে ষাট এর দশকের শেষভাগ থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসুচি নেওয়া হয় দারিদ্র্য দূরীকরনের জন। এইসব উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পুরো মাত্রায় সফলতা অর্জন করতে না পারায় সমাজের সবচেয়ে দরিদ্রতম অংশে সাহায্য পৌছানো এবং তাদের নূন্যতম চাহিদা মেটানোর জন্য ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন ও নারী সমাজকে টার্গেট করা হয়। এভাবেই নারী উন্নয়ন ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। মেঘনাগুহঠাকুরতা উল্লেখ করেন যে নারী উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য এসেছে মূলত প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য এবং তা বাস্তবায়িত হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায়। নারী উন্নয়ন প্রকল্পগুলি অধিকাংশ পড়েছে জন্মনিয়ন্ত্রন স্বাস্থ্য, শিক্ষা কর্মসংস্থান ও রিলিফের খাতে। নারী উন্নয়নের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রন ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও বাংলাদেশে নারীদের অধস্তন অবস্থানের কারনে জন্মনিয়ন্ত্রন নীতি প্রবর্তিত হয়েছে কেবলমাত্র নারীদের উপলক্ষ করেই। বাংলাদেশের নারী উন্নয়নজনিত প্রকল্পে দ্বিতীয় ধারাটা হচ্ছে অর্থ উপার্জনকারী কর্মসংস্থান যোগাবার উদ্দেশ্য দাদিদ্র্য দূরীকরণ নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত। লেখকের মতে যেহেতু ভূমিহীন বা দিনমুজর শ্রেণীর প্রায় অর্ধেক অংশহচ্ছে নারী তাই উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের নূন্যতম চাহিদা মেটাতে পারলে দারিদ্র্যদুর হবে। মেঘনাগুহ ঠাকুরতা বলেন বিভিন্ন সরকারি ও বেরসকারি সংস্থা নারীদের অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করাতে বর্তমান সমাজে নারীরা তাদের সনাতনী ভূমিকার বাইরে আসতে পেরেছে এবং নারীরা তাদের পশ্চাৎপদতা থেকে একধাপ এগিয়েছে। নারী উপার্জনক্ষম হয়েও তার ফলভোগ করতে পারছে না এবং রক্ষনশীল সামাজিক মূল্যবোধ নারীর ক্ষেত্রে আরও নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করেছে বলে লেখক অভিমত প্রকাশ করেন। নারীকে তার অবস্থান ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে কেননা এট উন্নয়নের একটা আবশ্যিক অংশ। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি এই কৌশলকে কেন্দ্র করে তাদের সমিতিগুরি গঠন করলেও এই কাজে রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়িত্ব নিতে হবে বলে লেখক অভিমত প্রকাশ করেন। উপসংহারে লেখক বলেন পাশ্চাত্যের

Dhaka University Institutional Repository

নারী উন্নয়ন চিন্তা বাংলাদেশের নারী সমাজকে আন্দোলিত করতে সক্ষম। বাংলাদেশের নারীদের অবস্থানের প্রেক্ষিতে নারী সংগঠনগুলীকে এর সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে হবে বলে লেখক উল্লেখ করেন।

নায়লা কবির "অধঃস্তনতা ও সংগ্রাম বাংলা দেশের নারী" প্রবন্ধে লেখক নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করতে যেয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবস্থাদির আলোচনা করেছেন। নারীর অধঃস্তন অবস্থা ও তার পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচি জরুরী বলে তিনি মতামত প্রকাশ করেন। অতীত ও বর্তমান কালে বৈদেশিক সাহায্য সংশ্লিষ্ট উন্নয়নে প্রক্রিয়া এবং এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে নারীর অত র্ভূক্তি নিয়ে আলোচনাকালে নারী বিষয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। নায়লা করিব তার প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে নারী নির্যাতনের কাঠামোসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের মতে লিঙ্গীয় সামাজিক সম্পর্ক, পরিবার, জ্ঞাতিসম্পার্ক বিবাহ, পর্দা এবং লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের কারনে নারীরা তাদের অধঃস্তন অবস্থান থেকে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে পারছে না। পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ম্যাধমে ব্যবধান সৃস্টি করে নারীর কর্মকে পরিবারের চারদেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। নায়লা কবির বাংলাদেশের স্বাধীনতাপরবর্তী কালের লিঙ্গীয় সামাজিক সম্পর্ক পরিবার জ্ঞাতিসম্পর্ক ও বিবাহ সম্পর্কে আলোচনাকালে বলেন যে, স্বাধীনতাউত্তরযুগে গ্রামীন নারীদের সম্পর্কে ক্রমবর্ধমানভাবে ধারনা বিত ার লাভ করতে থাকে। নায়লা কবিরের আলোচনায় দেখা যায় নারী উন্নয়ন চিন্তা, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের সংযুক্ত করার ফলে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন আসায় নারীরা সনাতন কর্মপ্রক্রিয়া থেকে অর্থউপার্জনকারী কাজের সংগে যুক্ত হচ্ছে। নায়লা কবিরের মতে বাংলাদেশর মহিলাদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো আমাদের সমাজে প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধগুলো মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে। নায়লা কবিরের মতে আমাদের রাষ্ট্র নারী অবস্থানের উন্নয়নের ব্যাপারে যতটা আগ্রহী তার চেয়ে বেশী আগ্রহী এই বিষয়কে পুজি করে সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে। বেসরকারি সংস্থাগুলো এগিয়ে আসার ফলে নারীরা অর্থনৈতিক কর্মে সংযুক্ত হয়েছে। ৭০ দশক থেকে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছে তা নারী সমাজকে সনাতন কর্মপ্রক্রিয়া থেকে অর্থনৈতিক কর্মে সংযুক্ত করতে পেরেছে বলে লেখক অভিমত প্রকাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

দারিদ্র্য বিষয়ক পর্যালোচনা

২.১ দারিদ্র্যের সংজ্ঞা

দারিদ্র্য হলো একটি বিশেষ আর্থ- সামাজিক অবস্থার নাম। যখন সমাজে দারিদ্র্যজনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে তখনই এই অবস্থাটির সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্য হচ্ছে দারিদ্র্যের আর্থ সামাজিক বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার নাম। দারিদ্র্যতা এমন একটি আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বুঝিয়ে থাকে যেখানে মানুষ তাদের জীবন ধারনের ন্যনতম প্রয়োজন পুরনে ব্যর্থ। সামাজিক ভাবে পরনির্ভশীল ও মর্যাদার দিক থেকে নিম্ন মর্যাদার অধিকারীকে দরিদ্র বলে। দরিদ্র হচ্ছে একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। দারিদ্র্য শব্দটি জীবনমান, খাদ্য ও পোশাক পরিচ্ছদের সাথে সম্পর্কিত, সে জন্য এর ধারনা সমাজভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- একটি উন্নত দেশের গরীব লোকের জীবনমান একটি অনুন্নত দেশের সচ্ছল লোকের জীবনমানের চেয়ে উন্নত হতে পারে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক ভীতিপ্রদ সমস্যা। বর্তমান বিশ্বের কিংবদন্তী জননেতা নেলসন ম্যান্ডেলার মতে, বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে দারিদ্র্য নামের দৈত্যটি বাগে আনতে না পারা। জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী ১০৩ কোটি মানুষ এখনও চরম দারিদ্র্যের শিকার। প্রতিদিন ৩৪ হাজার শিশু অপুষ্টির কারনে মারা যায়। বিশ্বের উপরের দিকের ২০% ধনী মানুষ এরই মধ্যে পৃথিবীর ৮৬ শতাংশ সম্পদ কব্জা করে ফেলেছে। আর নিচের দিকের ২০ শতাংশ মানুষের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে মাত্র ১.৩ শতাংশ সম্পদ। এ থেকে বিশ্ব পরিসরে যে বৈষম্য ও দারিদ্র্য বিরাজ করছে তা স্পষ্টই বুঝা যায়। বৈষম্যের আরো সুনির্দিষ্ট একটি পরিসংখ্যান হলো বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ২০০ ব্যক্তির যা আয় তা পৃথিবীর ৪১ শতাংশ মানুষের মোট আয়ের চেয়ে বেশী। এই ভয়াবহ সামাজিক বৈষম্য বিশ্বে এমন এক আর্থিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে যাকে কেবল একটি অর্থনৈতিক সন্ত্রাস হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। একটি সমস্যা হিসেবে দারিদ্র্যের সৃষ্টি মানবজাতির ইতিহাসের সূচনাতে হয়েছিল। দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক ও জটিল বিষয়। এর আছে নানা ব্যঞ্জনা, গতিপ্রকৃতি এবং

Dhaka University Institutional Repository

অনুসঙ্গ। সহজ সরল সমীকরনে দারিদ্র্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না, প্রকাশ করা যায় না। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকার জন্য এর নানা উৎস ও বহুমুখী প্রকাশভঙ্গিই দায়ী। কেননা দারিদ্র্যকখনো আয়-বঞ্চনা কিংবা ভোগ ঘাটতিকে বোঝায়। আবার কখনো অপুষ্টি, অশিক্ষা কিংবা সম্পদহীনতাকে নির্দেশ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে দারিদ্র্য আসে ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা আর দুঃস্থতাকে সঙ্গী করে। উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণের মতে অর্থ-সম্পদের অভাব না থাকলেও শিক্ষাহীন কিংবা স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিও দরিদ্র। নিরাপত্তাহীনতাও যে কোন স্বচ্ছল,সবল ও সফল মানুষকে মুহূর্তে পরিনত করে দুর্বল দরিদ্র জনে। দারিদ্র্য একদিকে স্থানিক অন্যদিকে সময় নির্ভর। কখনো দীর্ঘস্থায়ী আবার কখনো সাময়িক। কখনো স্থির আবার কখনো গতিশীল কখনো একপ্রজন্মের, আবার কখনো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দারিদ্র্যবহমান। নিরাপত্তাহীনতা আর দারিদ্র্য প্রায় সমার্থক। তবে দারিদ্র্যের সঙ্গে পুষ্টি, আয় উপার্জন পরস্পরজড়িত। দারিদ্র্যতার সাথে বিদ্যুৎ, রাস্তা-ঘাটসহ ইত্যাদি অবকাঠামো জড়িত। দারিদ্রতা হচ্ছে ক্ষমতাহীনতা, কন্টরোধের কথা, কণ্ঠহীনতার কথা। দারিদ্র্যতা হচ্ছে মান সম্মান নিয়ে ভাল সামাজিক পরিবেশে বসবাস করতে না পারা। সুতরাং দারিদ্র্যহচ্ছে একটি Multiplex বিষয়। ইদানিং দারিদ্র্যকে দেখা হচ্ছে ব্যক্তির ভাল থাকা না থাকার স্থান, কাল ও অবস্থানগত পার্থক্যজনিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। ভাল থাকার মানেটা আপেক্ষিক। মানুষ থেকে মানুষে স্থান, কাল ও প্রেক্ষিত ভেদে তা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাল থাকা মন্দ থাকার অনুভূতি প্রকাশ করেন (রহমান ও রহমান,১৪০৮:১-২)। সুতরাং এই সব কারনে তাত্ত্বিকগণ দারিদ্র্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষন করেন। নীচে দারিদ্র্যের কতিপয় সংজ্ঞা দেওয়া হলো:-

সমাজতত্ত্ববিদ Booth (1949) এবং Rowntree (1941) দারিদ্র্যকে অভাব এবং বঞ্চনার মধ্যে দেখেছেন। রাউন্ট্রি তার দারিদ্র্যগবেষণার দু-ধরনের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হল, প্রাথমিক ও প্রধান দারিদ্র্য অপরটি অপ্রধান দারিদ্র্য। প্রাথমিক দারিদ্র্য হল জীবন ধারনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের জন্য জন্য যথেষ্ট আয় করতে অক্ষমতা। দ্বিতীয় শ্রেণীর দারিদ্র্যকে রাউন্ট্রি অভিহিত করেছেন এমন একটি অবস্থা যেখানে প্রকৃত আয় ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট নয়।

Townsend (1970) এবং Rein (1970) দারিদ্র্যতার জন্য সামাজিক স্তর বিন্যাস ও বৈষম্যকে চিহ্নিত করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক উপাদান যেমন- সম্পদ (বা আয়) ক্ষমতা। মর্যাদা, শিক্ষা ইত্যাদির ভিত্তিতে সমাজের মানুষকে উচ্চ-নিচ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা যায়। নৈতিকার দিক থেকে এবং আইনের চোখে সবাই সমান হলেও বাস্তব সমাজে সবাই সমান নয়। সবাই যেমন একই পরিরমান সম্পদের মালিক নয়, আবার সবাইর ক্ষমতাও একই মাত্রার নয়।

Miller এবং Roby (1968) অর্থনৈতিক মর্যাদাকে দারিদ্র্যের দীর্ঘস্থায়ীত্বের মুল বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তারা শিক্ষা এবং সামাজিক গতিশীলতাকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার মান নির্ণায়ক হিসাবে তুলে ধরেছেন।

Titmus (1962) মতে, সম্পদের উপর কর্তৃত্বহীনতা থেকে দারিদ্র্যের উদ্ভব হয়। Charle Booth তার Labour and Life of the people in London (1989) নামক গ্রন্থে তাদেরকে দারিদ্র্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেন, যারা দুবেলা অন্ন সংস্থানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। অন্যদিকে কঠোর পরিশ্রম করেও যারা দুবেলা অন্নের সংস্থান করতে পারে না এবং সব সময় খুব অভাবগ্রস্থ থাকেন, বুথ তাদেরকে খুব দারিদ্র্য বলেছেন, যা এখন চরম দারিদ্র্যনামে পরিচিত। গ্রামীন ব্যাংকের পরিচালক প্রফেসর ইউনুছ বলেছেন "দারিদ্র্য হচ্ছে সব রকম মানবাধিকারের অস্বীকৃতি। দারিদ্র্য দরিদ্রের সৃষ্টি নয়। দারিদ্র্য সৃষ্টি করেছে আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ, নীতিসমূহ।"

অর্থনীতিবিদ Ojha (1970), Dandkar ও Rath (1971) এবং Ahluwalia (1978) দারিদ্র্যকে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।Rose (1973) দারিদ্র্যকে মৌলিক প্রয়োজনের অভাব হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

Jackson (1972) অভাব ও বঞ্চনার সমস্যা হিসাবে দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করেছেন। Jackson অনুভব করেন যে, একটি লোকের ভোগের জন্য খাদ্য প্রবাহের সাথে সাথে বিভিন্ন সেবা মুলক প্রবাহের প্রয়োজন। আর ভোগযোগ্য সেবার প্রবাহ আসবে বাড়ি, কাপড় চোপড়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মত মজুত চলক থেকে যা স্বাচ্ছন্দ সামাজিক সক্রিয়তার জন্য একান্ত প্রয়োজন। যদি সে ভোগ্য পন্যের প্রবাহ না পায়, তাহলে সমস্যা যেটা, তা হবে অভাবের, আর মজুতের ব্যর্থতার জন্য যে সমস্যা, তা হবে বঞ্চনার।

Dhaka University Institutional Repository

Deasi (1978) দারিদ্র্যকে ক্ষুধা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে একটি পরিবার তখনই দরিদ্র বলে বিবেচিত হবে, যদি তার কোন সদস্যকে বছরের কোন না কোন দিন উপবাস করতে দেখা যায়। এটা অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে (নাথ, ১৪০১: ১৪৫-১৪৬)।

Encyclopaedia of Britannica অনুসারে "দারিদ্র্য হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যখন জনগন তার মৌলিক চাহিদা পুরন করতে অপারগ হয়।"

Encyclopaedia of Americana অনুসারে দারিদ্র্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত পণ্যের অভাব।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্যসেনের (১৯৮১) মতে দারিদ্র্য ধারনাটির উৎপত্তি হয়েছে বঞ্চনা থেকে অর্থাৎ দারিদ্র্যেকে বলা যেতে পারে একটি বঞ্চনার কাহিনী। বঞ্চনা একটি সামাজিক ধারনা যা কাল এবং স্থানভিত্তিক। উন্নয়নশীল দেশসমূহে দারিদ্র্যকে চরম বঞ্চনার সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয় যা জীবন ধারনের ন্যূনতম চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অপর পক্ষে উন্নত বিশ্বে দারিদ্র্য ধারনাটি মূলতঃ আপেক্ষিক বঞ্চনা নির্দেশক যা একটি গ্রহনযোগ্য এবং নির্দিষ্ট শ্রেনীর মানদন্ডে নির্ধারিত জীবনযাত্রার মান অর্জনের ব্যর্থতা নির্দেশ করে। অমর্ত্য সেনের স্বত্বাধিকার এবং সক্ষমতা থিসিস অনুযায়ী আমরা দারিদ্র্যকে ন্যূনতম জীবন যাপন মান অর্জনে স্বত্বাধিকারের অভাব অথবা অক্ষমতার অবস্থানকে বুঝায়। জীবন যাপনের এই ন্যূনতম সূচক গঠিত হবে বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, খাদ্য, শৌচ ব্যবস্থা, কাজের নিরাপত্তা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট মান আর পরিমান দিয়ে। তাই খাদ্য বাসস্থান চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা দিয়ে একটি ন্যূনতম জীবনযাপনের অধিকারী করে তোলার ব্যর্থতার অবস্থাকে আমরা দারিদ্র্যবলতে পারি।

দারিদ্র্যের বহুমুখিতাই এর বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞার উদ্ভব হয়েছে। দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করা হয় পুষ্টির অভাব হিসাবে। খাদ্য গ্রহণ, পুষ্টি এবং দরিদ্র তিনটিই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হলেও পৃথক বিষয়। পুষ্টি যেমন শুধু খাদ্য গ্রহন দিয়ে হয় না, তেমনি দারিদ্র্য ও শুধু পুষ্টি দিয়ে নির্ণয় করা যায় না। অপুষ্টি এবং দারিদ্র্য একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হলে খাদ্য গ্রহন দিয়ে পুষ্টি নির্ণয়ের চেয়ে স্বাস্থ্যগত অবস্থা দিয়ে পুষ্টি নিণয় করে। দারিদ্র্য এবং জীবনযন এর মানকে প্রতিফলিত করে। দারিদ্র্যকে অক্ষমতা হিসাবে সজ্ঞায়িত করা যায়। এ অক্ষমতা হলো, ন্যূনতম জীবনমান অর্জনের অথবা মৌলিক প্রয়োজন পুরনের। ইদানিং

কালে দারিদ্র্যকে দেখা হচ্ছে ব্যক্তির ভাল থাকা না থাকার স্থান, কাল ও অবস্থানগত পার্থক্য জনিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্যে ন্যূনতম যে বস্তুগত সুযোগ সুবিধার দরকার তার অনুপস্থিতিই দারিদ্র্যের সৃষ্টি করে। আর এই অভাব বোধই হচ্ছে ভাল না থাকা। মানুষের অভাববোধের পরিবর্তনশীল অনুভূতির সাথে দ্রুতই পরিবর্তিত হচ্ছে দারিদ্র্যের সীমারেখা, গভীরতা ও ক্ষেত্রসমূহ। তাই ক্ষমতাহীনতা ও প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় কথা বলতে না পারাও দারিদ্র্য। চিন্তা, কাজ ও পছন্দ করার ক্ষেত্রে বাধাও এক ধরনের দারিদ্র্য। স্বাধীনতাহীনতাও তাই দারিদ্র্য। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এই মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর পরেও প্রচলিত পুঁজিবাদী সরকারি রাষ্ট্রযন্ত্র, সমাজ ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর পক্ষাপাতদুষ্ট স্বার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে দারিদ্র্যের স্থায়ী ইমারত। রাষ্ট্রীয় সংকুচিত সুযোগ, পাঁচিলঘেরা নীতিও প্রতিষ্ঠান সম্পদ ও ক্ষমতার অসম বন্টন এবং বৈরী সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলে দরিদ্র সম্প্রদায় (রহমান ও রহমান, ১৪০৮:২)।

২.২ দারিদ্র্যের প্রকারভেদ

ক) প্রয়োজনের তুলনায় সংগতির অভাবকে অনাপেক্ষিক বা চূড়ান্ত দারিদ্র্য বলা হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে একজন লোক জীবন ধারনের ন্যূনতম চাহিদা না মিটাতে পারলে তাকে দারিদ্র্যবলা হয়। এটা হল অনাপেক্ষিক দারিদ্র্য।

খ) অন্যদের তুলনায় সংগতির অভাবকে বৈষম্য বা আপেক্ষিক দারিদ্র্য বলা হয়। সামাজিক জীব হিসাবে একজন লোক বা একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে আয়েকজন লোক অথবা আরেকটি শ্রেণী থেকে অধিকতর দরিদ্র বাল যায়। এই প্রকারে দারিদ্রকে আপেক্ষিক দারিদ্র্য বলে অভিহত করা হয় যা বৈষম্য মূলক বন্টন ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। অর্থনীতিবিদগনের মতে, যারা প্রতিদিন মাথাপিছু ২১২২ কি: ক্যালরি পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ কয়তে সক্ষম তাদেরকে সাধারণ দরিদ্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। আর যারা প্রতিদিন মাথা পিছু ১৮০৫ কি: ক্যালরি পর্যন্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম তারা প্রকট দরিদ্র জনগোষ্ঠী হিসাবে আখ্যায়িত। বাংলাদেশে গ্রাম ও শহর অঞ্চলে এই দুই ধরনের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাস করে।

এছাড়া সাধারনভাবে নির্দিষ্ট কতকগুলো সূচক ব্যবহার করে প্রচলিত পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। সূচকগুলো মধ্যে আয়ের পরিমান,

ভোগের পরিমান ও ক্যালরি গ্রহণের পরিমান উল্লেখযোগ্য (রহমান ও রহমান, ১৪০৮:৩)। তবে দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে আরো কিছু সূচক বা পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি (Cost of Basic Needs Method-CBN), মানব সম্পদ বিষয়ক দারিদ্র্যসূচক (HPI) মাথা গণনা সূচক (Head count index). বাংলাদেশের সরকারিভাবে দারিদ্র্যসীমা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ন্যূনতম ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা দিয়ে। এক্ষেত্রে প্রতিদিন ন্যূনতম ২১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহনের মাত্রাকে ধারা হয়েছে দারিদ্র্য। আবার ১৮০৫ ক্যালরির নিচের মাত্রাকে ধরা হয়েছে চরম দারিদ্র্য। অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর জীবন ধারনের ন্যূনতম চাহিদা হিসাব করে দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণ করা হয় (Khan and Howlader, 2003:59)। তাই বলা যায়, যে জনগোষ্ঠী দৈহিকভাবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা ২১২২ কিলো ক্যালরি পূরন করতে পারে সেই দরিদ্র জন গোষ্ঠী। গ্রামাঞ্চলের বসবাসরত জনগোষ্ঠীর যে অংশ নিজেদের জীবনধারনের জন্য দৈহিক ন্যূনতম ২১২২ কিলো ক্যালরি চাহিদা পূরনে করতে পারে তাদেরকে বলা যায় গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

জীবনযাত্রার মান

সাধারণভাবে দারিদ্র্যকে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান অর্জনে অক্ষমতা হিসেবে ধরা যেতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বলতে সেইসব জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যার জীবন যাপনের মৌলিক চাহিদা পূরনে করতে অক্ষম। সঙ্গত কারণেই এই অক্ষমতা সীমিত সামর্থের সাথে সম্পর্কিত। অতএব একথা বলা যায় কোন জনগোষ্ঠীকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করতে তার জীবন যাত্রার মান দারিদ্র্য রেখা দ্বারা নির্ধারিত নূন্যতম গ্রহণযোগ্য মানের চেয়ে কম হিসেবে বিবেচনা করা হয় (আরেফিন, ২০০৭ : ২৪)।

ক্যালরি গ্রহণভিত্তিক অনপেক্ষ দরিদ্র ও চরম দারিদ্র্য: বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত ২০০০ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহন পরিমাপে ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে অনপেক্ষ দারিদ্র্যএর হার ৪৪.৩৩ শতাংশ, আর গ্রামাঞ্চলে ৪২.২৮ শতাংশ, সেই সাথে চরম দারিদ্র্যের এর হার জাতীয় পর্যায়ে ১৯.৯৮ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ১৮.৭২ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩:১২৬-১২৭)।

Dhaka University Institutional Repository

মাথাপিছু মাসিক আয়

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়ও ব্যয় জরিপ ২০০০ এর তথ্য অনুসারে মাথাপিছু মাসিক আয় পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে, উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু আয় ৫৭৩.৭২ টাকা, আর গ্রামাঞ্চলে ৫৫০.৮২ টাকা। সেই সাথে নিম্ন দারিদ্র্যরেখা ব্যবহার করে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু আয় ৪৯৫.১৯ টাকা, আর গ্রামাঞ্চলে ৪৮৪.৬৪ টাকা (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩ : ১৩১)।

শিক্ষা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের ১৫ বৎসর ও তার উর্দ্ধে জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার প্রায় ৫৮ শতাংশ। আবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সূত্রে ১৫ বছর ও তদুর্ধ্বে জনগোষ্ঠীর ২০০২ সালে অনুমিত সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে খানা আয় ও ব্যয় জরিপ এর তথ্য অনুযায়ী দরিদ্র পরিবারের ৬ থেকে ১০ বৎসর বয়সের ছেলেদের মধ্যে স্কুলে ভর্তির হার ৬৫ শতাংশ আর মেয়েদের মধ্যে তা হচ্ছে ৬৭ শতাংশ। এছাড়া খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০০ থেকে দেখা যাচ্ছে দশ শতক দরিদ্রতম পরিবারে ১৫ বৎসর বয়সোর্ধ ব্যক্তিরা ১.১ বৎসর শিক্ষালাভ করেছে (রহমান, ১৪০৯:৩)।

স্বাস্থ্য: বিবিএস হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ২০০০ সালে বাংলাদেশে ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা ৪২১৮ জন। আর একই সালে স্থুল জন্ম হার (প্রতি হাজারে) জাতীয় পর্যায়ে ১৯ এবং গ্রামাঞ্চলে ২০.৮। সেই সাথে স্থুল মৃত্যহার (প্রতি হাজারে) জাতীয় পর্যায়ে ৪.৯ এবং গ্রামাঞ্চলে ৫.৩। প্রত্যাশিত গড় আয়ুস্কাল ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৬৮.২ এবং গ্রামাঞ্চলে ৬৬.৬। শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে) ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৫৮ এবং গ্রামাঞ্চলে ৬২। সেই সাথে ১ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি ১ হাজার জন্মে) ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৪.২। আর মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে প্রসবে) ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৩.২ এবং গ্রামাঞ্চলে ৩.৩। এছাড়াও গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার ২০০০ সালে ৫৩.৬. এবং উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি) ২০০০ সালে ২.৬ (আরেফিন, ২০০৭ : ২৫)।

পুষ্টি: বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী অপুষ্টির শিকার শিশুর হার ২০০০ সালে ৪৯ শতাংশ। একই সময়ে উল্লিখিত শ্রেণীর কম ওজনের শিশুর হার ৫১ শতাংশ। প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক

ত্র্যান্ড হেলথ সার্ভে (DHS) ১৯৯৬-৯৭ এবং ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশী স্টানটেড এবং কম ওজনের। আবার গ্রাম ও শহরের শিশুদের ক্ষেত্রে অপুষ্টির পার্থক্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। ১৯৯৯-২০০০ সালের DHS অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে স্টানটেড শিশুর হার ৪৭ শতাংশ এবং কম ওজনের শিশুর হার ৪৯ শতাংশ। প্রাসঙ্গিক ভাবে মাতৃঅপুষ্টি যা Body-Mass Index (BMI) দ্বারা পরিমাপ করা হয় এবং অপুষ্টির সীমা ১৮.৫ এর ভিত্তিতে বাংলাদেশে অপুষ্টির হার সূচক অনেক বেশি। DHS অনুযায়ী এই সূচকে মাতৃ অপুষ্টির হার ১৯৯৯-২০০০ সালে ৪৫ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩ : ১৩৫)।

বাসস্থান: জীবনযাত্রার মান বিবেচনায় বাসস্থানসূচক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক তথ্যে দেখা যায়, ৮৯-৯০ এ ৬০ শতাংশ গ্রামীন পরিবারের বসবাসের অবস্থা ছিল শোচনীয়, গৃহায়ন সূচক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অক্ষমতার আরও করুন দুটি ধরন তুলে এনেছে। তাহলো ৩২ শতাংশ পরিবার শোচনীয় অবস্থায় একটি মাত্র ঘরে গদাগাদি করে থাকছে এবং ১০ শতাংশ পরিবারের বাস গাছের পাতা কিংবা ঐ জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি ঘরে। প্রাসঙ্গিকভাবে DHS- এর তথ্যে বাসস্থানের ধরন সম্পর্কে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মোট ২৯.২ শতাংশ (বাঁশের/খড়ের) কাঁচা ঘরবাড়ি যেখানে গ্রামাঞ্চলে ৩১.৮ শতাংশ, আর টিনের ছাদের (Roof material) ঘরবাড়ি মোট ৫৮.৭ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ৫৯.৩ শতাংশ আছে (Mitra et.al. 1997:13)।

২.৩ দারিদ্র্য রেখা নির্মান:

দারিদ্র্য রেখা একটি সমাজের ন্যূনতম গ্রহনযোগ্য জীবনযাত্রার মান নির্দেশ করে। এই রেখার মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে দুটি অংশে বিভিক্ত করা হয় যার একাংশ গরিব এবং অপর অংশ গরিব নয়। যখন কোন ব্যীক্ত গরিব বলে চিহ্নিত হয় তার অর্থ হচ্ছে তার জীবন যাত্রার মান দারিদ্র্য রেখা দ্বারা নির্দেশিত ন্যূনতম গ্রহনযোগ্য মানে চেয়ে কম।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর্থার ইয়ং দারিদ্র্যসমীক্ষাকল্পে দারিদ্র্য রেখা নির্মান কৌশল প্রথম বের করেন। এরপর ১৮৮৯ সনে চার্লস বুথ দারিদ্র্যের উপর গবেষনায় দুটো দারিদ্র্য রেখা নির্মান করেছেন। একটি সাধারন দারিদ্র্যের এবং আরেকটি প্রকট দারিদ্র্যের। দারিদ্র্যরেখা দুটি ধারনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়:

ক) জীবনযাত্রার মান: এবং খ) এই মানের ন্যূনতম গ্রহনযোগ্য তর। আবার জীবনযাত্রার মান একটা বহুমাত্রিক ধারনা যা ব্যক্তির সকল ভোগসামগ্রী এবং কর্মকান্ডের অংশ গ্রহণের উপর নির্ভরশীল যেহেতু জীবনযাত্রার মানের বহুমাত্রিক নির্ধারিক রয়েছে, তাই দারিদ্র্যরেখার জন্য এই প্রতিটি নির্ধারকের একটি ন্যূনতম গ্রহনযোগ্য সীমারেখা প্রয়োজন। এই নির্ধারকগুলোর প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদি। নীতিগতভাবে যদি কোন ব্যক্তি (বা পরিবার) এই মৌলিক চাহিদাগুলোর যে কোন একটির ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়, তবে তাকে দরিদ্র্যশ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। মৌলিক চাহিদার এই বহুমাত্রিক ধারনা প্রায়োগিক বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে। মৌলিক চাহিদার যে কোন একটি নিয়ামকের ন্যূনতম পরিমান কি হবে এক্ষেত্রে একমত হওয়া বেশ কষ্টসাধ্য কিন্তু মৌলিক চাহিদার সকল নির্ধারকের ন্যূনতম পরিমান নির্ধারন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এছাড়া মৌলিক চাহিদার যে কোন একটি নিয়ামকের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর অক্ষমতা আয় স্বল্পতা বা দারিদ্র্য ছাড়াও ব্যক্তির রুচি বা পছন্দক্রমের তারতম্যের কারনের ঘটতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে একজন ধনী ব্যক্তি ও গরিবশ্রেণী অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, তার অস্বাভাবিক পছন্দক্রমের কারনে, আয়স্বল্পতার ফলে সৃষ্ট বঞ্চনার জন্য নয়। এই ধরনের জটিলতা এড়িয়ে দারিদ্র্যরেখা নির্ধারন সহজসাধ্য করার জন্য একমাত্রিক নির্দেশকের ব্যবহার বেশী প্রচলিত। দারিদ্র্য পরিমাপের উপরোক্ত কৌশলে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ: সনাক্তকরণ এবং সমষ্টিকরণ (সেন, ১৯৮১) সনাক্তকরনের মূল বিবেচ্য হচ্ছে 'দরিদ্র শ্রেনীর অন্তভূক্ত কারা তা নির্ধারন করা। আর সমষ্টিকরনে 'দারিদ্র্যের সার্বিক তর' প্রকাশ করে (মুজেরী, ১৯৯৭:৬৯)।

জীবনযাত্রার মানের একমাত্রিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে সূচক হিসেবে আয় অথবা ব্যয়ের ব্যবহারই বেশি। অনেকে আয়কে জীবনযাত্রার মান নির্ধারনের একটি সন্তোষজনক সূচক হিসেবে পছন্দ করেন।কারন ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষেত্রে আয়ের পরিমান তার পছন্দ অনুযায়ী সামগ্রী অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হচ্ছে আয় সংক্রান্ত তথ্যের অসম্পূর্ণতা। ব্যক্তি বা পরিবারের আয় সঠিকভাবে পরিমাপ করা দুরূহ, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত দেশে যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী গরিব এবং বেশিরভাগ পরিবারের আয়ের একটা বড় অংশ কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট খাতের চিরায়ত কর্মকান্ড থেকে উদ্ভুত যা

Dhaka University Institutional Repository

আর্থিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক আয়ের অনেকাংশের উৎপত্তি হয় ব্যয়সাশ্রয় এবং সার্বজনীন সম্পদের ব্যবহার থেকে। আয় পরিমাপের এসব দুর্বলতার কারনে সূচক হিসাবে ব্যয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়। সাধারনতঃ জরিপের মাধ্যমে আয় অপেক্ষা ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য অধিকতর গ্রহনযোগ্য ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব।

এজন্য বাস্তবে দারিদ্র্যরেখা নির্ণয়ের জন্য একক সূচককের ব্যবহারই অধিক। এক্ষেত্রে দুটি সাধারন পদ্ধতি বিদ্যমান। প্রথম পদ্ধতিতে খাদ্য এবং অন্যান্য সামগ্রী সম্বলিত একটি মৌলিক চাহিদা তৃপ্ত করতে সক্ষম দ্রব্য-গুচ্ছ স্থির করা হয় এবং চলতি মূল্যে এই দ্রব্য-গুচ্ছ ক্রয় করতে যে আয় প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা হয়। মৌলিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম এই ন্যূনতম দ্রব্যগুচ্ছ ক্রয়ক্ষম আয়ের সংগে অন্যান্য চাহিদার জন্য কিছু পরিমান আয় (সাধারণতঃ ন্যূনতম আয়স্তরের একটি ভগ্নাংশ) যোগ করে দারিদ্র্যরেখার মান স্থির করা হয়। যদি Qf খাদ্যসামগ্রী যার ক্রয়মূল্য PF এবং অন্যান্য Qnf অন্যান্য মৌলিক চাহিদার দ্রব্য গুচ্ছ যার ক্রয়মূল্য Pnf, তবে দারিদ্র্যরেখা (Pl) এভাবে প্রকাশ করা যায়:

$PL = \lambda(Pf\ Qf + Pnf\ Qnf), \lambda S1$

এখানে λ একটি গুনিতক। P এবং Q কে উপরোক্ত সমীকরনে ভেক্টররাশি হিসাবে ধরা হয়েছে। উপরোক্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা লক্ষনীয়। প্রথমতঃ মৌলিক দ্রব্যের ধারনা ব্যক্তি নির্ভর। একব্যক্তির কাছে যে দ্রব্য মৌলিক চাহিদা হিসেবে পরিগনিত, অন্যের কাছে তা মৌলিক চাহিদা হিসেবে গ্রহনযোগ্য নাও হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অনেক মৌলিক চাহিদা সামগ্রী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর এই ধরনের সরকার প্রদত্ত সামগ্রীর উপর অধিকারের প্রভেদ একটি সমস্যা হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে। তৃতীয়তঃ ভোক্তার শ্রেণী, সময় এবং স্থানভেদে একই দ্রব্যের মূল্যস্তর ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে (মুজেরী,১৯৯৭: ৭০)।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দারিদ্র্যরেখাণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ধারন করা হয় ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ করা হচ্ছে কিনা, তার ভিত্তিতে। এই পদ্ধতি বর্তমানে উন্নয়শীল দেশ সমূহে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে প্রথমতঃ ন্যূনতম পুস্টি গ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় যে সর্বনিম্ন ব্যয় তা নির্ধারন করা হয়। অবশ্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পুষ্টির মাত্রা নির্ধারন একটি দুরুহ কাজ। এজন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের খাদ্য

Dhaka University Institutional Repository

ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম ক্যালরি চাহিদার যে মানদন্ড তা ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে উক্ত ক্যালরি চাহিদা মেটাতে সক্ষম ন্যূনতম ব্যয়ের পরিমানের সংগে খাদ্য বহির্ভূত প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানোর জন্য নির্ধারিত গুণক ব্যবহার করা হয় (মুজেরী,১৯৯৭:৭০)।

উপরোক্ত পুষ্টিভিত্তিক দারিদ্র্যরেখা নির্ধারনে কিছু মৌলিক সমস্যা আছে। প্রথমত: খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারনে দৈহিক চাাহিদা একটি ভাল মানদন্ড হলেও প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যগুচ্ছ, নির্ধারণ একটি জটিল সমস্যা। কারন কর্মক্ষম জীবন ধারনের জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট খাদ্যসামগ্রী গ্রহনের কোন মানদন্ড নেই। দ্বিতীয়ত: প্রয়োজনীয় পুষ্টি মাত্রা ব্যক্তির ভৌগলিক অবস্থান, তার কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই মাত্রা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়, এমনকি একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সময়ের সংগে বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৃতীয়ত: প্রদত্ত মানদন্ড আর বাস্তব ক্যালরি গ্রহন এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটা অবস্থার কথা চিন্তা করা যেতে পারে যেখানে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে তার আয় বিশেষজ্ঞগণ প্রদত্ত ক্যালরি পরিমান গ্রহনের জন্য ব্যয় না করে অন্যত্র ব্যয় করছে যদিও তার এই প্রদত্ত ক্যালরি গ্রহনের জন্য যে পরিমান খাদ্য ক্রয় করা প্রয়োজন তা করার ক্ষমতা রয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এই ধরনের ব্যক্তি দরিদ্র শ্রেনীভুক্ত নয় কারন ইচ্ছা করলেই ঐ ব্যক্তি এই মানদন্ডে প্রদত্ত ক্যালরি গ্রহন করতে পারত এবং অদরিদ্র শ্রেনীভুক্ত হতে পারত।

এক্ষেত্রে যে বিষয়টি মৌলিক তা হচ্ছে ব্যক্তির পছন্দক্রম যা তার দারিদ্র্যঅবস্থার নির্ধারন করে। যদি দারিদ্র্য ধারনাকে একটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয় যার উৎস ব্যক্তির উপযোগ তবে কোন উক্ত মাপকাঠিতে দরিদ্র সেটাই বিবেচ্য, তা সে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যে কারনেই হউক না কেন। এক্ষেত্রে বিবেচ্য হচ্ছে যদিও উক্ত ব্যক্তি উপযোগ সর্বাধিকরণ করছে। তবুও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার অবস্থান দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত। অন্যদিকে যদি দারিদ্র্যসীমা কল্যান সূচকের সর্বনিম্ন অবস্থান নির্দিষ্ঠ করে, তবে সকল ব্যক্তি কল্যানের একই মান অর্জন করতে পারে প্রদত্তবাধা সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পছন্দ ক্রম ব্যবহারের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পছন্দক্রম প্রযোজ্য নয়, যা বিবেচ্য তা হচ্ছে ব্যক্তির অর্জিত কল্যানের স্তর। অর্থাৎ ন্যূনতম কল্যাণস্তর অর্জনের দৃস্টিভঙ্গীতে ব্যক্তির পছন্দক্রম বিবেচ্য নয়। অন্যদিকে জীবন যাত্রার মান

ধারনায় ব্যক্তির পছন্দক্রম দরিদ্র এবং অদরিদ্রদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত বলে গন্য হবে যদি তার উপযোগ সর্বাধিকরণ পছন্দ স্তর দারিদ্র্যসীমার উপরে তার কল্যাণ নির্ধারন না করে।

দারিদ্র্যকে যেভাবে প্রায়োগিকভাবে ব্যবহার করা হউক না কেন, দরিদ্র রেখা ধারনাটি অনেকাংশে সুস্থির নয়। দুই ব্যক্তি বা পরিবারের আয় স্ত রের মধ্যে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান হলেও তাদের অবস্থান দারিদ্র্যরেখার ভিন্ন দিক হতে পারে। এজন্য বাস্তবে বিভিন্ন পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটি নির্দিষ্ট দারিদ্র্যরেখার উপর নির্ভরতা কমানোর প্রচেষ্টা করা হয় (মুজেরী,১৯৯৭:৭১)।

২.৪ দারিদ্র্যের পরিমাপ

সাধারনভাবে নির্দিষ্ট কতকগুলো সূচক ব্যবহার করে প্রচলিত পদ্ধতিতে দারিদ্র্যপরিমাপ করা হয়। সূচকগুলোর মধ্যে আয়ের পরিমাপ, ভোগের পরিমাপ ও ক্যালরি গ্রহনের পরিমান উল্লেযোগ্য। এ সূচকগুলোর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এড়াতে এবং আরো কিছু বিষয়কে গুরুত্ব দিতে কিছু মিশ্র (Composite) সূচক ব্যবহার করা হয়। কারন শুধু একটি সূচকে কোন ব্যক্তির অবস্থান খারাপ হলেও অন্য সুবিধার কারনে সে দরিদ্র নাও হতে পারে। যেমন, আয়ের পরিমান কম হলেও অন্যান্য অনুকূল সামাজিক অবস্থার কারনে ভোগ সুবিধা সন্তোষজনক পর্যায়ে থাকতে পারে। তাই সমন্বিত আয় দারিদ্র্য(IPI) বা মানবসম্পদ বিষয়ক দারিদ্র্যসূচক (HPI) ব্যবহার করা হয়। এছাড়া দারিদ্র্যের তীব্রতা নির্ণয়ে Foster Greer Thorbecke (FGT) পদ্ধতিও ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া মৌলিক চাহিদাভিত্তিক দ্রব্যাদির মূল্যমান (Const of Basic Needs (CBN) পদ্ধতিতে একটি দারিদ্র্যরেখা তৈরী করে সামঞ্জস্যতা তুলনা করে দারিদ্র্য। নিরুপন করা হয়। মাথাগননা সূচক (Headcount Index) পদ্ধতিতে সাধারনত মোট জনসংখ্যা থেকে দারিদ্র্যরেখায় নিচের আয় শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত লোকদের পৃথক করে দারিদ্র্যের আনুপাতিক হার নির্ধারন করা হয়। হালে অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতিতে (participatory Poverty Assessment বা PPA) নানা অবস্থা যাচাই করে দারিদ্র্যমাত্রা নিরুপন করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে Well-being or Ill-being Analysis ও দারিদ্র্যনির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যারা দরিদ্র তাদের মতামত গ্রহন করা হয় বলে এই পদ্ধতির গ্রহনযোগ্যতা দিন দিনই বাড়ছে (রহমান ও রহমান, ১৪০৮:৩-৪)। দারিদ্র্যের বহুমুখীতার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক শাস্ত্রে দারিদ্র্যপরিমাপের দৃষ্টি একমুখী পরিমাপ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বহুমুখী পরিমাপের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। এটা করতে গিয়ে অনেক সময় আর্থ-সামাজিক নির্দেশক মালাকে দারিদ্র্যরেখার ভিত্তিতে নির্মীয়মান সাধারনীকৃত দারিদ্র্যবিরুদ্ধে স্থাপন করা হয়, যা সংগত নয়। এই দুটো নির্দেশক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং পরস্পর বিরোধী নির্দেশক নয়, বরং দারিদ্র্যের মত বহুলগঠনজাত প্রত্যয়ের জন্য পরিপূরক নির্দেশক। দারিদ্র্যপরিমাপ সিস্টেমে দারিদ্র্যরেখা নির্মানের জন্য একটি সাধারনীকৃত দারিদ্র্যসূচক ব্যবহার করা যেতে পারে, যার পরিপূরক হতে পারে আর্থ-সামাজিক নির্দেশক সমূহ। সারণী ২.১ ও ২.২ এ ধরনের সূচকের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হলো ।

সারণী ২.১

দারিদ্র্যনির্দেশক মালা

সাধারনীকৃত দারিদ্র্যসূচক

১. দারিদ্র্যজনসংখ্যার অনুপাত (H)

$H = Q/N$

যেখানে Q হল দারিদ্র্যসংখ্যা, N হল মোট জনসংখ্যা

২. দারিদ্র্যফাঁক অনুপাত (I)

$I = (Z-M)/Z$

$I = \sum^{q} /QZ$

i = I i of Q

যেখানে g হল দারিদ্র্যআয়ের সাথে দারিদ্র্যরেখার ফাঁক Z হল দারিদ্র্যরেখার আয়, M হল দরিদ্র্যের আয়ের গড় আয়।

৩. দারিদ্র্যসূচক (সাধারণীকৃত)

$P = h\ (Z-M)/Z = HI$

যেখানে Z হল দারিদ্র্যরেখার মাথাপিছু আয় বা ভোগ M হল দরিদ্র্যের মাথাপিছু গড় আয় I হল দারিদ্র্যআয় ফাঁক অনুপাত ।

৪. ক) দারিদ্র্যসূচক (এন.সি কাকাওয়ানি)

Dhaka University Institutional Repository

$P=H\ \frac{z-n}{u}$

$=HI$

(নাথ, ১৪০১: ১৫৪)

যেখানে U বলতে কমিউনিটির মাথা পিছু গড় আয় বুঝায়

খ) দারিদ্র্যসূচক (ক অনুযায়ী বিকল্প (ন.চ নাথ)

$P=Q\ \Sigma\ Z\text{-}YI\ /NU$

$i=l\text{--------}i\ \text{of}\ Q$

যেখানে Yi হল দরিদ্র জনের আয় পৃথক পৃথক ভাবে।

গ) দারিদ্র্যসূচক (ক অনুযায়ী বিকল্প ন.চ নাথ)

$p= \sum^{q} z\text{-}Yi/nz$

$i=l\text{--------}i$

ঘ) দারিদ্র্যসূচক (ডান্ডেকার এবং রাথ)

$p= \sum^{q} z\text{-}Yi/qui$

$i=l\text{--------}i$

$\text{or, } P = \frac{q(z-m)}{qu}$

৫. দারিদ্র্যসূচক (অমর্ত্য সেন)

$p = H(i + G(1\text{-}i)$

৬. দারিদ্র্যসূচক (ন.চ নাথ)

$p = H\left[\frac{z-m}{u} / 1\text{-}G\right]$

৭. দারিদ্র্যসূচক (ন.চ নাথ)

$p = \frac{q(z-m)}{Nu-Nz} = \frac{q}{N}\left(\frac{z-m}{u-z}\right)$

৮. দারিদ্র্যসূচক (ন.চ নাথ)

$$p = a_1 \frac{q}{N} + a^2 \frac{z-m}{z} + a^3 G$$

যেখানে a1, a2 এবং a3 যথাক্রমে H, i এবং G, O ওজন (Weight) (নাথ, ১৪০১ : ১৫৫)।

সারণী ২.২

দারিদ্র্যনির্দেশক মালা

স্বতন্ত্র আর্থ-সামাজিক নির্দেশক মালা

১. মাথাপিছু আয়/ভোগ

২. মোট ভোগব্যয় এবং খাদ্যের আপেক্ষিক অনুপাত বা Engels coefficient

৩. জনসংখ্যার আয় বন্টনের বৈষম্যের মাত্রা

৪. মাথা পিছু জমি।

৫. মাথা পিছু পুজি ও অন্যান্য অভূমি সম্পদ

৬. সঞ্চয় ও বিনিময় হার।

৭. ঋণগ্রস্ততার পরিমান

৮. শিক্ষা জ্ঞান এবং সংস্কৃতির মান

৯. গৃহায়ন অবস্থা

১০. পুষ্টির অবস্থা এবং মাথাপিছু অধিগ্রহণ

১১. শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা ও ওজন, রুগ্নতার ঘটনা সংখ্যা এবং প্রকৃতি)

১২. স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মান। (পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সেবার সুবিধার মান ইত্যাদি)।

১৩. কর্মসংস্থান মর্যাদা এবং পেশাগত ধরন

১৪. মাথাপিছু জ্বালানী ভোগ

১৫. কাপড় চোপড় এবং জুতার স্টক ও ব্যবহারের প্রকৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. প্রত্যাশিত গড় আয়ু

১৭. নিরাপত্তা অবস্থা।

১৮. সামাজিক ক্ষমতায় অংশীদারিত্বের প্রকৃতি

১৯. ভৌত এবং সামাজিক অবকাঠামোর অবস্থা (যাতায়াত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান)।

২০. প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিপর্যয়ের ঘটনা সংখ্যা।

২১. দুর্ভিক্ষ এবং অনাহারের ঘটনা।

২২. সংকট কাটিয়ে উঠার ক্ষমতা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অবস্থা।

২৩. রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ এবং স্বাধীনতার মাত্রা।

২৪. জীবনযাপনে সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তি মান।

২৫. সামাজিক সম্পর্কে শোষনের মাত্রা।

উপরোক্ত নির্দেশক সামগ্র দারিদ্র্যপরিমাপ ও বিশ্লেষণের জন্য পুরোপুরি না হলেও প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো অন্তর্ভূক্ত করে। সারণী থেকে বুঝা যায় যে সাধারণীকৃত দারিদ্র্যসূচকের মত একটি নির্দেশক ব্যবহার করে দারিদ্র্যঅবস্থা বিচার করার প্রচেষ্টা নেয়া যায় এবং এর সাথে স্বতন্ত্র আর্থ-সামাজিক নির্দেশকগুলো ব্যবহার করে বিশ্লেষণাত্মক চিত্র পাওয়া যায়। এই দু:ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করে দারিদ্র্যের সামাগ্রিক রুপ অংকন দেয়া যায়। সারণীতে উল্লেখিত বিভিন্ন সাধারনীকৃত দারিদ্র্যসূচক ব্যবহার করা যেতে পারে তথ্যের পর্যাপ্ততা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুযায়ী। আবার সাধারণীকৃত দারিদ্র্যসূচক এবং স্বতন্ত্র আর্থ-সামাজিক নির্দেশকগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা দেখাতে পারে। তখন নিয়ন্ত্রন নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে সাধারণীকৃত দারিদ্র্যসূচক। তাই এ দু'ধরনের নির্দেশক সম্মিলতভাবে ব্যবহার করলে দারিদ্র্যের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় (নাথ, ১৪০১: ১৫৬)।

দারিদ্র্যপরিমাপের কতগুলো বিষয়ের উপর নজর দিতে হয়। প্রথমটি হল, অর্থনৈতিক নির্দেশকের পরিমানে দামের সমস্যার সমাধান করা অর্থাৎ আপাত মূল্যকে প্রকৃত মূল্যে রুপান্তরিত করা এবং বিভিন্ন জায়গার মূল্যকে এক জায়গার মূল্যে এনে তুলনামূলক স্তরে নিয়ে আসা।

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্যপরিমাপের জন্য দ্রব্য ও সেবাগুলোকে সঠিক নির্বাচন করা যাতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে তুলনা করা যায়। ভৌত দ্রব্যগুলোকে পরিমান ও গুন একসাথে বিবেচনা করে হিসেব করা। এছাড়া বাজার জাত এবং গৃহে উৎপন্ন ভোগদ্রব্যের সমাধান করা ও মূল্যের একত্রিত করার সমস্যার সমাধান করা ও প্রয়োজন। গুনগত ও পরিমান গত নির্দেশক গুলোর প্রবাহী ও স্টক নির্দেশক গুলোর পরিমাপ ব্যবস্থা সমস্যার সমাধান ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ন। এছাড়া সময়ের নিরিখে স্থায়ী ও অস্থায়ী দারিদ্র্যপরখ, পরিবেশগত সমস্যাকে সামাজিক দারিদ্র্যনিরুপনের আঙ্গিকে বিচার করার জন্য ব্যবস্থা নির্ণয় করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

সর্বশেষে বলা যায় দারিদ্র্যপরিমাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো, তথ্যের পর্যাপ্ততা, হিসেবে পারিমাপের সঠিকতা, নির্দেশকমালার সচেতন এবং সাবধাণ বাছাই দারিদ্র্যের গতিপ্রকৃতি পরিমাপে তথা বিশ্লেষণে এবং সর্বোপরি দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল নির্ণয়ে এবং কর্মসূচি গ্রহনে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সাধারণত পারিবারিক আয় ব্যয় জরিপ এবং পুষ্টি জরিপ এ দুটি জরিপ উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্যপরিমাপের জন্য প্রধান এবং বিস্তৃত তথ্যের ভিত্তি ও উৎস। তাই এ দুটি জরিপ কাজের গুনগতমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্যের পরিমাপ সমস্যা সমাধানে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ (নাথ, ১৪০১: ১৫৭)।

২.৫ উন্নয়ন বিষয়ক ধারণা

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে সামাজিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে মানুষ সমাজে জন্মগ্রহন করে নিজেদের জীবনে উৎকর্ষ সাধনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। আদিম সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ যখন সহজ-সরল ও শ্রেণীহীন সমাজে বাস করতো, যখন তারা ফলমুল, শাক-পাতা, মাছ, পশু পাখি ইত্যাদি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত তখন থেকেই মানুষ জীবন ধারন প্রনালীর উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ বেছে থাকার জন্য এবং জীবনকে উন্নত করার জন্য সর্বদা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সমকালীন অর্থনীতিতে উন্নয়ন কামনা সার্বজনীন। বিশেষ অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের সাথে উন্নয়ন কামনা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রধান অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যে রুপায়িত করেছে। উন্নয়নশীল দেশে এ কথা স্বীকৃতি পেয়েছে যে দেশের সাধারন মানুষের জীবন যাত্রার মান যথাযথভাবে উপরে না উঠতে পারলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। অর্থনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা বা মুক্তির সমন্বয়ে রাজনৈতিক মুক্তি সাধারণ মানুষের জীবনে পুরো তাৎপর্য এনে দেয় ফলে উন্নয়নতত্ত্বের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা।

বিগত শতাব্দী ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারার এক বিপ্লবী বর্ষ। জাতীয় মুক্তি ও অর্থনৈতিক মুক্তি এ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে একই সুত্রে চলতে আরম্ভ করেছিল। শতাব্দীর শুরুতে একটি বিশ্বযুদ্ধ মানব সমাজে সব হিসাবকে ওলট পালট করেছিল। বিশ্ব অর্থনীতির শক্তিধর দেশগুলোর অর্থনৈতিক ভিত নড় বড়ে হয়ে উঠেছিল। শতাব্দীর ৩য় দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবল অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন জন কেইস প্রদত্ত বিখ্যাত থিউরী "দি জেনায়েল থিউরী'র" আলোকে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হল এবং তারা সফল হল। এরপর সংঘঠিত হয় ২য় বিশ্বযুদ্ধ। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব যুদ্ধের মিত্র শক্তি ও অক্ষ শক্তি তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা নিয়ে এগিয়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল প্লানের আওতায় তার মিত্র ইউরোপকে কোটি কোটি ডলার সাহায্য দিল এবং তাতে তারা তাদের সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হল। অন্যদিকে অক্ষ শক্তির দেশ জাপানও বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটিয়ে নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এগিয়ে এল, অন্যদিকে মিত্রশিক্তির দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শুরু হল স্নায়ু যুদ্ধ। একদিকে উপনিবেশিক দেশগুলি একে একে মুক্তহতে লাগল অন্যদিকে বিশ্ব দুই ব্লকে বিভক্ত হতে লাগল। সোভিয়েতে ইউনিয়রে প্রভাবিত দেশগুলো সমাজতান্ত্রিক আদর্শে তাদের অর্থনেতিক উন্নয়নের জন্য তৎপর হয়ে উঠল অন্যদিকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবান্বিত ব্লক পুজিবাদকে তাদের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ধরে নিল। এভাবে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই দুই ব্লকে বিভক্ত হয়ে গেল। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত নতুন দেশগুলো এই দুই ব্লকে বিভক্ত হয়ে নিজেদের উন্নয়ন সচেষ্ট হল।

২য় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশ ঔপনিবেশিকতার শিকল ভেঙ্গে স্বাধীনতা লাভ করে। নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত এদেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তাদের অন্যতম জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু দীর্ঘ দিনের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষন এসব দেশের অর্থনীতিকে এমনভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে যে, এদের পক্ষে ন্যূনতম সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া সহজসাধ্য ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনৈতিকভাবে এই সকল দেশ স্বাধীনতা পেলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তারা কখনো ভোগ করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি। বিশ্ব অর্থনৈতিক শক্তিগুলো তাদের সাথে ঔপনিবেশিক আচরণ করছে। বিশ্বকে অনুন্নত ও উন্নত এই দুই ব্লকে বিভক্ত করেছে। রাজনৈতিকভাবে মুক্ত হলেও অর্থনৈতিক ভাবে এই সকল দেশ বিভিন্ন ভাবে শোষিত হতে থাকে। যার প্রকৃত চিত্র নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ থেকে বুঝা যায়-

১৯৮৪ সালে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব প্যারেজ দা কুইয়ার এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, "বিশ্বের সমস্ত সম্পদের ৮০ শতাংশ ভোগ করে উন্নত দেশের ২০ শতাংশ মানুষ। অন্যদিকে অনুন্নত দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ ভোগ করে অবশিষ্ট ২০ ভাগ সম্পদ। আর সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশ সবচেয়ে দরিদ্র্য ২০ শতাংশের চেয়ে ১৩৫ গুন বেশি সম্পদশালী। অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়ন উভয় নিরিখে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে বিদ্যমান এই বৈষম্য বেড়েই চলছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত দেশগুলোর সামনে প্রধান লক্ষ্য ছিল দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ সরকারই পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশগলোর অভিজ্ঞতার আলোকে উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেই উন্নয়ন মনে করা হত। তৎকালীন পন্ডিতবর্গ মনে করতেন যে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেই স্বাভাবিক ভাবে জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন তথা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান হবে।

অনুন্নত দেশে উন্নয়ন বলতে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বুঝায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি জীবন যাপনের উন্নতমান, জনপ্রতি আয়বৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও ভোগ্য দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধিকেই উন্নয়নের মাপকাঠি বলে চিহ্নিত করা হয়। অনুন্নত দেশে উন্নয়নের সংকট মানে অর্থনৈতিক সংকট নয়। প্রকৃত পক্ষে উন্নয়ন হচ্ছে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগে সম্পৃক্ত। উন্নয়ন একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া এবং উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নগামী সকল দেশেই এই প্রক্রিয়া কমবেশী অব্যাহত রয়েছে। দেশভেদে উন্নয়নের উদ্দেশ্য, উন্নয়ন, অগ্রাধিকার, কলাকৌশল এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ভিন্নতর। অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে উন্নয়নের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

Jhon Montogomeery (1966): উন্নয়নের অর্থ হল অর্থনীতিতে বিশেষ করে কৃষি, শিল্প অথবা এই খাত গুলোকে কার্যক্ষম করে তোলার জন্য অবকাঠামো তৈরী, মূলধন এবং আংশিকভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেবার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়ন করে।

Meier ও Baldwin (1957): যে পদ্ধতির মাধ্যমে দীর্ঘকাল মেয়াদে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।

প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ W.W Rostow (1960) মানুষের কতকগুলি প্রবণতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলো হল- ১. মৌলিক বিজ্ঞান প্রসারের প্রবণতা ২. অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারের প্রবনতা ৩. নতুন কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি আবিস্কারের প্রবণতা ৪. বস্তুগত অগ্রগতি সাধনের প্রবণতা ৫. ভোগ ও সঞ্চয়ের প্রবণতা ৬. সন্তান লাভের প্রবণতা। অধ্যাপক রষ্টোর মতে এই সকল প্রবণতাসমূহ যে কোন সমাজের উপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে যার ফলশ্রুতি হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

A.Young (1928)-এর মতে, উন্নয়ন হলো কোন ব্যক্তি বা সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির একটি জটিল প্রক্রিয়া। অগ্রগতি এই অর্থে যে, এর ফলে ব্যক্তি বা সমাজের জৈবিক মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ হয় এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ ঘটে। অতি সম্প্রতি উন্নয়ন কথাটির সঙ্গে টেকসই শব্দটি যুক্ত হয়েছে। এর অর্থ হলো বৈষম্যহীন ও খুঁতবিহীন ক্রম উন্নয়ন পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থার সর্বনিম্নে ক্ষতি স্বীকার করে উন্নয়ন।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন উন্নয়নকে মানুষের ইতিবাচক স্বাধীনতার সাম্প্রসারিত রূপকে বুঝিয়েছেন। তিনি এর মাধ্যমে ব্যক্তির সক্ষমতা ও স্বত্ত্বাধিকারকে নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তির সক্ষমতা হলো জীবনধারনে তার পছন্দ পূরণ বা দ্রব্যের ও কর্মের ওপর তার স্বাধিকার। এ স্বত্ত্বাধিকার ব্যক্তির জীবনমানকে উন্নত করে। অমর্ত্য সেন বলেছেন "আয় বৃদ্ধি কোন জাতির জন্যে চরম লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌছানোর একটি উপায় মাত্র। উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সক্ষমতা, মানুষের নিজের জীবনের ওপর অধিকার। মানুষ কি করতে পারছে, কি করতে পারছে না, সেটাই উন্নয়নতত্ত্বের আলোচ্য হওয়ার কথা। অমর্ত্য সেনের ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ফ্রিডম বই এর মুল কথাই হচ্ছে পছন্দ বা স্বাধীনতা তার মতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে স্বাধীনতার দিক দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দেখতে হবে এবং স্বাধীনতার থেকেও একটা বড় অর্থ ধরতে হবে। জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে চাইলে রাষ্ট্রকে জনগনকে নানা ধরনের স্বাধীনতা ও তাদের পছন্দ পূরনের সুযোগ করে দিতে হবে। তার মতে আমাদের চারপাশে সবকিছু নানা প্রতিকুলতার মধ্যে চলছে, এটা কাম্য নয়। এর পরিবর্তন করতে হবে বেশির ভাগ মানুষের পছন্দের আলোকে। চাওয়া ও পাওয়ার এই অধিকারের বিষয়টি অমর্ত্য ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই নয়া ভাবনা ছড়িয়ে দিয়ে উন্নয়ন অর্থনীতি চর্চায় তরুন প্রজন্মের গবেষকদের মনে নৈতিকতার ভিত্তিকে শক্তভাবে গেথে দিয়েছেন অমর্ত্য সেন। স্বাধীনতা সকল মানুষের অরাধ্য। নির্ভয়ে রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতির নানা কর্মকান্ড মানুষ অংশগ্রহন করতে আগ্রহী। মূলত মানুষেরই গড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের বাধার কারনে সকলের পক্ষে এই স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব হয় না। প্রতিষ্ঠানসমূহের আরো জনকল্যানধর্মী ভূমিকা কি করে নিশ্চিত করা যায় সে লক্ষ্যে আমাদের সামাজিক চাপ সৃষ্টি করতে হয় নীতিনির্ধারকের ওপর, যাতে তারা এসব প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক পরিবর্তনে উদ্যোগী হন। ইতিবাচক পরিবর্তনের আরেক নাম সংস্কার।

সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রগতি, প্রবৃদ্ধি, অগ্রগতি, বিবর্তন ইত্যাদি নানা শব্দের মাধ্যমে উন্নয়ন বুঝান হয়। তবে শাব্দিকভাবে উন্নয়ন বলতে ইতিবাচক পরিবর্তন বা অগ্রগতিকে বুঝায়। উন্নয়ন বর্তমান অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থায় পরিবর্তন। ধরে নেয়া হয় বর্তমান অবস্থা হল 'অনুন্নত'। 'পশ্চাৎপদ' স্বল্প প্রবৃদ্ধি ও কাল যুগের সময়কাল তাই এই সময়কাল অতিক্রম করে পরবর্তী ধাপে পৌছানো যা কিনা বাঞ্চনীয় তাই উন্নয়ন। উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে একটি মই এর সাথে তুলনা করা যায়। মইএর ধাপ পেরিয়ে শীর্ষস্থানে পৌছান হল উন্নয়ন। এখানে স্বত:সিদ্ধ অনুমিত সত্য হল, মই এর শীর্ষ ধাপে অবস্থান করছে পাশ্চাত্যের সভ্য ও উন্নত দেশসমূহ যারা সভ্যতা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারক ও বাহক। আর মই এর সর্বনিম্নে থাকছে অনুন্নত পশ্চাৎপদ ও অসভ্য দেশ বা সমাজ সমূহে। তাই মই এর সর্বনিম্ন ধাপে যারা অবস্থান করছে তাদের প্রয়াস হল মই এর ধাপ পেরনো। এই ধাপ অতিক্রম করার মাধ্যমে মই এর শীর্ষে পৌছানোর মাধ্যমে উন্নত অবস্থায় পৌছানো সম্ভব। উন্নয়ন ধারনাটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা প্রবৃদ্ধি অর্জন এ বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ধরে নেয়া হয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে অনুন্নত দেশগুলো তাদের ক্ষুধা, দারিদ্র্যতা, বেকারত্ব, স্বল্প উৎপাদন ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

বহুবিধ সমস্যার সমাধান করতে এবং দেশের জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। উন্নয়ন সকল মানুষের ও সকল সমাজেরই কাম্য। উন্নয়নের নামে যুদ্ধ হয়েছে এবং বিপ্লব ঘটানো হয়েছে। সরকারের সফলতা ও দর্শন মূল্যায়ন করা হয়েছে সেই সরকারের উন্নয়নকে উৎসাহিত করার ক্ষমতা ও দক্ষতার মাধ্যমে। উন্নয়ন ধারনাটি আধুনিক বিশ্ব সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসাবেই চিহ্নিত এবং গৃহীত। তাই উন্নয়ন নামক সোনার হরিণটির পিছনে ঔপনিবেশোত্তর সমাজগুলো ৪০ দশক থেকে যে যাত্রা শুরু করেছিল তা এখনও চলছে। উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক ধারণাকে যুক্ত করে উন্নত ও অনুন্নত এই বিভাজনকে তীব্র করা হয়। এটা করা হয়েছে চল্লিশের দশকের শেষভাগে যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রোমান অনুন্নত শব্দটি ব্যবহার করেন তখন থেকেই বিশ্বের একটা অংশকে চিহ্নিত করা হয় "অনুন্নত অঞ্চল হিসাবে"(আলম, ১৯৯৯:৪-৫)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন অনুন্নত দেশগুলো দ্রুত সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে, তখনই উন্নত পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতিবিদরা এসব নব্য স্বাধীন দেশগুলোকে উন্নত দেশের মতো শিল্পায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের পরামর্শ দেয়। তারা বুঝাতে চেষ্টা করে যে উন্নত দেশগুলো শিল্পায়নের ফলেই উন্নত হতে পেরেছে। ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশগুলোকে উন্নয়নের পরামর্শ দেয়। এজন্য তারা প্রথমদিকে বিভিন্ন সাহায্য দিয়ে শিল্পায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। অনুন্নত দেশগুলো সুস্পষ্টভাবে বুঝাতে পারে যে বর্তমান বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় অনুন্নত দেশসমূহের শিল্পায়ন সম্ভব নয়।

শিল্পায়নের তত্ত্ব ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হওয়ার পর বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানীরা নগরায়নের তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তারা উন্নত দেশের উদাহরন দিয়ে বলেন যে, অনুন্নত দেশসমূহ ও উন্নত দেশের মত নগরায়নের মাধ্যমে উন্নত হতে পারবে। উন্নত দেশসমূহে গ্রামীন এলাকা থেকে লোকেরা শহরে আসে এবং শহর বিকাশের মাধ্যমে উন্নত হয়।

ষাটের শতকে আধুনিকীকরনের উন্নয়নের তাত্ত্বিক মর্যাদা লাভ করে। নগরায়নের তত্ত্ব ও অনুন্নত দেশসমূহের নিকট ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হওয়ার পর বুর্জোয়া সাজবিজ্ঞানীরা আধুনিকীকরন তত্ত্ব উপস্থাপন করে। আধুনিকীকরন অর্থ হল পাশ্চত্যকরন। আধুনিকীকরনের অর্থ হলো

অনুন্নত দেশকে উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যে রুপান্তর করা বা উন্নত দেশের মত গড়ে তোলা। আধুনিকীকায়ন তত্ত্ব উন্নয়নকে অর্থনীতির পরিমন্ডল থেকে বের করে নিয়ে এসে কতগুলো মূল্যাবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই সাংস্কৃতিক চেতনা পাশ্চাত্যের উন্নতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ লাভ করেছে বলেই এর বিচ্ছুরনই অধুনা অনুন্নত দেশের উন্নতির প্রধান উপাদান বলে আধুনিকায়ন তাত্ত্বিকরা উল্লেখ করেন। এ তত্ত্বের পদ্ধতিগত যুক্তি হল, উন্নয়নকামী দেশসমূহ আধুনিক কলাকৌশল আভ্যন্তরীন সামঞ্জস্যের প্রয়োজনেই অত্যন্ত আগ্রহভরে প্রয়োগ করে থাকে। এর ফলে এই সব দেশে সাংস্কৃতিক প্রসরন অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে ও সমঝোতার মাধ্যমেআত্মপ্রকাশ করে বলে আধূনিকায়নতাত্ত্বিকরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। আধুনিকীকরণ সম্পর্কে অনেকগুলো তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তন্মধ্যে ৫টি দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান। এ. আর দেশাই আধুনিকীকরনের তত্ত্ব সমূহকে প্রধান ৫টি ভাগে ভাগ করেন। যথা:

১. The ideal typical index approach.

২. The diffusionist approach

৩. The psychological approach

৪. The Historical approach of radical Social scientists.

৫. The Marxist approach

প্রথমত: Ideal typical index approach হচ্ছে উন্নত ও অনুন্নত সমাজের মধ্যেকার পার্থক্যনির্ধারনী। এটা কতগুলি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে উন্নয়নকে প্রত্যক্ষ করে। Economic development and cultural change নামক জার্নালের প্রখ্যাত সম্পাদক Manning Nash এর ভাষায়, The first mode is the index method the gerenal features fo a developed economy are abstracted as an idealtype and then constracted with the equally ideal typical features of a poor economy and society. In this mode developmetn is viewed as the trans formation of one type into another (আলম, ১৯৮১:১০)।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে Diffusionist approach বলতে মনে করেন যে, সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহে উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত দেশ অনুপ্রবেশ। এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকদের ধারনা হলো এই যে, অনুন্নত দেশসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

অনুন্নত এই জন্য যে, তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, সংস্থা, মূল্যবোধ, কৃৎকৌশল এবং পূজির অভাব রয়েছে, যার ফলে তারা অনুন্নত অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় পৌছাতে পারছে না।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি- Psychological approach-এর সমর্থকরা মনে করেন যে, অনুন্নত দেশের লোকদের আচরনগত পরিবর্তন করতে পারলে এই সব দেশগুলোকে উন্নত করা যাবে। পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী না হওয়া পর্যন্ত উন্নত হওয়া যাবে না।

চতুর্থ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে- The historical approach of radical Social Scientist. এই দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত এবং অনুন্নত সমাজকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেন।

পঞ্চম The Marxist Approach: মার্কসীয়রা মনে করেন যে, অনুন্নত দেশগুলো অনুন্নত থেকে যাওয়ার কারন হলো এই যে, এই সব দেশগুলোকে অনুন্নত রাখা হয়েছে, উন্নত পুঁজিবাদীদেশগুলোর ঔপনিবেশিক এবং নয়া ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতির মাধ্যমে। বিশ্ব জুড়ে দুটো প্রক্রিয়া রয়েছে- যার ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই দরিদ্র হচ্ছে এবং অল্প কিছু দেশ ধনী হচ্ছে। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, অনুন্নয়নের কারন অনুসন্ধান করতে হলে এবং অনুন্নয়নের সমস্যা সম্পর্কে জানতে হলে বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার বিকাশ সম্পর্কে জানতে হবে, যা বানিজ্যিক পুঁজিবাদ থেকে শুরু করে শিল্প পুঁজিবাদ হয়ে সর্বশেষ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে বিকাশ লাভ করেছে। মার্কসবাদীদের মতে উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশগুলোকে তাদে বর্তমান পশ্চাদপদ অবস্থা থেকে উন্নত হওয়ার জন্য সাহায্য করছে না। বরং এই সব দেশগুলো সাহায্য দিচ্ছে দাসত্ব এবং শোষনের জন্য। তাদের মতে উন্নয়নের প্রচেষ্টা, সাহায্যদান এবং আধুনিকীকরন এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে প্রকৃত অবস্থাকে লুকানোর জন্য এবং শোষণ করার কায়দা মাত্র। (আলম, ১৯৮১:১৮-১৯) মার্কসবাদীদের মতে, পুঁজিবাদী শ্রেণী এবং উপনিবেশ শোষণ হচ্ছে ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক অনুন্নত দেশের অনুন্নয়নের কারন। তাই উন্নয়নের জন্য এই দুটোকে প্রথম উচ্ছেদ করতে হবে।

উন্নয়ন সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানি ও মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানির মত পার্থক্য থাকার কারনহল তারা তাদের নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে থেকে উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আজকের অনুন্নত বিশ্বের ৯০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে, সংখ্যাগরিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

লোকজন মানবেতর জীবনযাপন করছে। এইসব অনুন্নত বিশ্বের উন্নয়নকে অভিজাত নগরকেন্দ্র বা মর্যাদাসূচক প্রকল্পের দ্রুত বিস্তার দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। অনুন্নত বিশ্বের জন্য "উন্নয়ন মানে হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরন।" সম্প্রতি জাতিসংঘ থেকে উন্নয়নের একটি যুগপযোগী সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞায় উন্নয়ন বলতে এমন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে সকল মানুষের জীবন মানের উন্নতি হবে। মূলত: প্রতিটি মানুষ যাতে সম্মানজনক ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট জীবন যাপন এবং অপরিহার্য বৈষয়িক প্রয়োজন মিটাতে পারে তা নিশ্চিত করার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে উন্নয়নের ধারনা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নয়নকে বিবেচনা করা হয় একদিকে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে জীবনযাত্রা মানের সুষম উন্নতির মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি অর্জন।

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মৌল লক্ষ্য হল উন্নয়ন অর্জন ও নিশ্চিত করা। উন্নয়ন আর্থিকভাবে অনগ্রসর দেশে বহুশ্রুত রাজনৈতিক শ্লোগান। উন্নয়ন হলো একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন ঘটে। উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য দারিদ্র্যদুরীকরণ এবং কর্মসংস্থান হলো উন্নয়নের প্রধান প্রধান অঙ্গ। উন্নয়ননের প্রকৃত অর্থ হলো সামগ্রিক সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন এবং যার কাঠামো মানুষের মৌলিক চাহিদা মিটবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধের পরির্তন। উন্নয়ন বলতে প্রযুক্তিগত প্রাতিষ্ঠানিক এবং বন্টন ব্যবস্থার পরির্বতন অর্থাৎ সমস্ত আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উর্ধ্বমুখী পরিবর্তন নির্দেশ করে। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন, অর্থাৎ জনগনের দারিদ্র্যমোচন, বেকারত্ব দূর করা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে দরিদ্র জনগনের জীবনের মান উন্নয়ন করা। উন্নয়নের প্রকৃত দাবী হলো 'উন্নয়ন নয়- চাই মুক্তি'। সত্যিকারের উন্নয়ন নিছক উৎপাদন বৃদ্ধি কিংবা বৈষয়িক উন্নয়ন নয়, সত্যিকারের উন্নয়ন হলো মানবিক উন্নয়ন, আত্মনির্ভরতার পথে পরনির্ভরতার থেকে মুক্তি, জনগনের বহুমুখী সৃজনী প্রতিভার উদ্বোধন। বিচ্ছিন্নতার আগ্রাসী অক্টোপাস থেকে মুক্তি তথা সার্বিক মুক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬. গ্রামের সংজ্ঞা

গ্রাম সমাজ বলতে এমন এক জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যারা একই ভৌগলিক অঞ্চলে বসবার করে এব যাদের মধ্যে পারস্পারিক পরিচিতি ও সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। আদিম যুগে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করার পাশাপাশি এক পর্যায়ে মানুষ কৃষি কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবন বিকাশ লাভ করে। আর এ কৃষিভিত্তিক জীবন যাপনের অপূর্ব পরিনতি হল গ্রামীন বসতি। গ্রামীন সমাজে লোকজনে পরস্পরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে এবং গ্রামীন সমাজের প্রধান পেশা সাধারণত কৃষি। একই বংশে জাত সন্তান সন্ততি এবং তাদের বংশধরদের নিয়ে কয়েকটি পরিবারের ছোট একটি উপনিবেশ এই ছিল আদিম পল্লীর স্বাভাবিক রুপ।

মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশে তার বসতির রুপান্তর ঘটেছে ধাপে ধাপে। পল্লীর অভ্যুদয় হয়েছে বসতি স্থাপনের ধারানুক্রমে বেশ কিছু পরে। সভ্যতার উষালগ্নে আদিম মানুষ যখন গুহা ছেড়ে সমতলে এলো তখনো তার নির্দিষ্ট কোনো বসতি ছিলো না। ফলমূল আহরন আর পশুপাখি শিকার করে মানুষ যাপন করতো যাযাবর জীবন। খাদ্য আহরনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানুষকে নিয়ে ছিলো খন্ড খন্ড এইসব যাযাবর দল। অরণ্য থেকে ফলমূল আহরন আর পশুপাখি শিকার পর্ব শেষে পশুচারনকে যখন মানুষ উপজীবিকা হিসেবে নিতে পারলো তখনো তাকে যাযাবর জীবন যাপন করতে হয়েছে। পশু খাদ্যের সীমাবদ্ধতা যুথবদ্ধ কিছু মানুষকে এই পর্বেও স্থান থেকে স্থানান্তরে পশু পালনের জন্য যেতে বাধ্য করেছে। চারনভূমি নিয়ে বিভিন্ন যাযাবর গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো। বৈরী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য এবং সহযোগিতার দৈনন্দিন প্রয়োজনে কোনো একটি গোষ্ঠীভূক্ত নর-নারীর ভেতরকার সম্পর্ক দৃঢ় করে তুললো। অসভ্য জীবন থেকে যখন মানুষ বর্বর জীবনে পদার্পন করলো পশুচারন মধ্যে দিয়ে তখন যুথবদ্ধ জীবন যাপনের তাগিদ বাড়লেও নির্দিষ্ট স্থানে বসতি স্থাপনের সুযোগ এলো না ঐ বিশেষ জীবিকা অর্জনের জন্যই।

খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার থেকে ছয় হাজার বছর আগে মানুষ যখন মাটিতে বীজ বুনে ফসল ফলনোর কৌশল শিখে গেলো তখন তাকে কেবল পশুচারন করে আর জীবিকা নির্বাহ করতে হলো না। এর ফলে মানুষের সামাজিক জীবনে এলো এক বড় পরিবর্তন। পশুচারনের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

স্থান থেকে স্থানান্তরে যাযাবর বৃত্তির দায় থেকে সে মুক্ত হলো এবং অবশেষে একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে বসতি স্থাপন করে বসবাস সম্ভব হলো (হাই,১৯৯০: ৯)। কেবল বর্তমানের জন্য নয়, আগামী দিনের জন্যও খাদ্য মজুদ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করে মানুষ তার জীবনে শৃংখলা এবং নিয়মের প্রবর্তন করতে সক্ষম হলো। কৃষি কাজের জন্য প্রকৃতির নিয়ম কানুন সম্পর্কেও তার ধারনা কিছুট স্পষ্ট হলো এবং প্রকৃতির সংঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবিকাঅর্জনে পদ্ধতি বিন্যস্ত করতে প্রয়াস পেলো। এক স্থানে মোটামুটি স্থায়ী বসবাসের সুযোগ থেকে এলো বাড়ী ঘর ইত্যাদি তৈরির ব্যাপারে আগের চেয়ে উন্নত ক্যকৌশলের ব্যবহার। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিরোধ এবং যুদ্ধ তিরোহিত হয়নি বলে এইসব বাসগৃহ ছিলো পরস্পর সন্নিবিষ্ট। কর্ষনযোগ্য ভূমির সঙ্গে বাসগৃহের যোগাযোগ নিশ্চিত করায় জন্য যখন বসতির সাথে রাস্তার সৃষ্টি হলো তখন গ্রামের রূপ আরো সুস্পষ্ট হলো। যেহেতু মাটি থেকে ফসল ফলানোর পরিমান নির্ভর করতো মানুষের সংখ্যার ওপর সেই জন্য গোষ্ঠীর আয়তনও বেড়ে গেলো কৃষি আবিষ্কারের পর। জন্মহার বৃদ্ধি এবং যাযাবর জীবন যাপন জনিত কারনে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে এটা সম্ভব হলো। সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে গোষ্ঠীভূক্ত মানুষের একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কে এলো পরিবর্তন। এই পরিবর্তন গোষ্ঠীর চরিত্রকেও বদলে দিলো অমূল। এতদিনের প্রচলিত মানুষের গোষ্ঠীগত সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়ে এক নুতন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারে সৃষ্টি হলো। পরিবারের আত্মপ্রকাশে গোষ্ঠীগুলো ভেঙ্গে গেলো অথবা তার অন্তর্নিহিত শক্তি দুর্বল হয়ে এলো। এরফলে পরিবারে পরিবারে সংঘর্ষ অনিবার্য হতে পারতো কিন্তু তা এড়ানো সম্ভব হয়েছিল গ্রাম সমাজের উৎপত্তিতে। কৃষি আবিষ্কারের পর উপজাতি ও গোষ্ঠীর স্থানে পরিবার উৎপাদন ও বিনিময়ের ভূমিকা পালন করতে পারলেও অন্যান্য যে সমস্ত দায়িত্ব গোষ্ঠী পালন করতো তা পরিবারের ক্ষুদ্র আকার দিয়ে পালন করা সম্ভব ছিলো না। নিজেদের মধ্যে বিবাদ, বিসংবাদ এড়ানো, বৈরী গোষ্ঠীসমূহের আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি প্রয়োজনে কৃষিভিত্তিক পরিবারগুলোকে একত্রিত হয়ে গ্রামেবসতি স্থাপন এবং গ্রাম সমাজের সৃষ্টি করতে হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবেষ্টিত চারিদিকে চাষযোগ্য জমি রাস্তাঘাট, গাছপালা বেষ্টিত স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসরত সংগঠিত জনপদ গ্রাম নামে পরিচিত। গ্রাম বলতে এমন একটি অঞ্চল বুঝায় যেখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশ কৃষিজাত পন্য, হস্তশিলম উৎপাদন এবং গবাদি পশু ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে জীবিকার্জন করেন (হাই, ১৯৯০: ১০)।

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ গ্রামীন উন্নয়ন

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সফলতার চাবিকাঠি নিহিত গ্রাম্যবাংলার উন্নয়নে। কেননা বাংলাদেশ বলতে আমরা বুঝি শতকরা ৭৫ ভাগ অধিবাসী অধ্যুষিত গ্রামবাংলাকে । গ্রাম বাংলার উন্নয়ন এবং বিশাল কৃষক জনতার মুক্তি ব্যাতিরেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। গ্রাম উন্নয়ন বা পল্লী উন্নয়ন বলতে গ্রামের সকল শ্রেণী বা সকল স্তরের মানুষের সম-উন্নয়ন বোঝায়। শ্রেনী, বর্ণ ও স্তর ভেদে গ্রামীন সকল মানুষের জীবনধাবনের মানে সমান উন্নয়ন ঘটলে তাকেই বলা হয় গ্রাম উন্নয়ন। এক শ্রেনীর অসামান্য আয়- বৃদ্ধির মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বেড়ে যে উন্নয়ন হয়, সেই উন্নয়ন অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করলেও সমাজবিজ্ঞানীরা তাকে যথার্থ অর্থে উন্নয়ন বলতে চান না। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে গ্রামীণ সকল মানুষের সমভাবে আয়ও জীবন ধারনের মান উন্নয়ন মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন বা পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।

উন্নয়নকামী ৩য় বিশ্বের দেশগুলোতে গ্রাম উন্নয়ন একটি বহুল আলোচিত বিষয়। দক্ষিন এশীয় উপমহাদেশে গ্রামীন জীবনের সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ঔপনিবেশিক যুগেই শুরু হয়েছিল। বস্তুত আজকের গ্রামীন জীবনের যে সব সমস্যা তা ঔপনিবেশিক শাসনেরই ফলশ্রুতি। ঔপনিবেশিক যুগে ঘনায়মান গ্রামীন জীবনের সংকট সম্পর্কিত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিভিন্ন ভাবে ঔপনিবেশিক যুগেই প্রতিফলিত হয়েছিল। বঙ্গীয় প্রজস্বত্ব আইন,দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট দূর্ভিক্ষ কোড, ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট, ঋন শালিসী বোর্ড প্রভৃতি গ্রামীন জীবনের সংকট সম্পর্কে ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষনের কাঠামোটির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্যই আপাতদৃষ্টিতে গ্রামীন জনগনের জন্য কল্যাণকর এইসব ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছিল। গ্রামীন বা দারিদ্র্য সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসকদের উৎকণ্ঠা প্রতিফলিত হয়েছে ডাফারিনের গোপন প্রতিবেদনে আজ থেকেএকশ বছর আগে। সেকালে রুরাল আপলিফমেন্ট বলতে বোঝাত কচুরিপানা সাফ করা অভিযান, মশক দমন অভিযান, মহামারী নিবারন অভিযান গ্রামীন রাস্তাঘাট নির্মান ও সংস্কার ইত্যাদি। জেলা বোর্ড ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি সংস্থার তদারকিতে এইসব আপলিফটমেন্টর কাজ চলতে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রেইফেসেনের অনুকরনের সমবায় আন্দোলনেরও সূচনা হয়। কিন্তু এই সব উদ্যোগের মধ্যে শাসকবর্গের প্রধান ধারনা ছিল গ্রামের মানুষ মূর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা নিজেদের ভালমন্দও বোঝে না তাই তাদের

মধ্যে ভালমন্দের ধারনাটি স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যা গ্রাম্য বর্হিভূত শক্তিসমূহই পালন করবে প্রশিক্ষনের ভূমিকা। এতে ছিল গ্রামের মানুষের প্রতি করুনা বর্ষনের মান সিকতা।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে গ্রামীন জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক আচরন সংক্রান্ত ঔপনিবেশিক মূল্যায়নের পরিবর্তন হযেছে। অর্থনীতিবিদ শুলজ, নৃবিজ্ঞানী সোলট্যাক্স ও অর্থনীতিবিদ ডেভিড হপাবের গবেষনায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গ্রামের মানুষ প্রাপ্ত সাম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে সক্ষম। প্রচলিত প্রযুক্তির আওতায় প্রাপ্ত সম্পদের কোন বিকল্প ব্যবহারই উৎপাদনের তারতম্য ঘটাবে না। সুতরাং গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্তভাবে নির্ভর করে উন্নতমানের প্রযুক্তি প্রচলনের উপর। উন্নত প্রযুক্তি প্রচলন বলতে উফশী জাতের শষ্যের চাষ, শংকর জাতের গবাদিপশু, হাস মুরগি ও মৎস্য চাষ প্রভৃতিকেই বোঝানো হয়ে থাকে। শুলজের দৃষ্টিতে কৃষকরা দক্ষ কিন্তু দরিদ্র। তাদের দারিদ্র্যের অবসান সম্ভব উন্নত প্রযুক্তির প্রচলনের মাধ্যমে। উন্নয়কামী ৩য় বিশ্বের দারিদ্র্যের অবস্থান পল্লীতে বেশি হওয়ার পল্লীউন্নয়ন উন্নয়নশীল দেশের বহুল আলোচিত একটি প্রত্যয়। বিশ্বব্যাংকের মতে পল্লী উন্নয়ন হলো- "Rural development as stratege designed to improve the economic and Social life of a specific group of people the rural poor. It involves extending the benefits of development of the poorest among those who seek a livelihood in the rural areas. The group inclueds small scale farmesrs, tenants and the landless Rafiqual Islam (1990) গ্রাম উন্নয়ন প্রসংগে বলেন- Rural development may there fore be defined as a procoss of developing and utiling natural and human resources, technologis, infrastructual facilities, institutions and organization and government policies and programmes to encourage and speed up economic grouth in rural areas, to provides jobs and to improve the quantity of rural life tourds self sustenance.

গ্রামীন উন্নয়নকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা। কারো মতে গ্রামের কম আয়ের লোকদের জীবন ধারনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা এক সেই প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার উদ্যোগকে গ্রাম উন্নয়ন বলে আখ্যায়িত করা যায়। এই সংজ্ঞায় কৃষি উন্নয়নকে গ্রাম উন্নয়নের সমার্থক হিসাবে দেখা হয়নি। সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ান এখানে স্বীকৃত, তবে গ্রামের সব শ্রেণীর জন্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে গ্রাম উন্নয়নকে কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারনের প্রক্রিয়া অথবা সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তন করে গ্রামবাসীদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে বলেছেন গ্রাম উন্নয়ন। আবার অনেকে বলেছেন গ্রাম উন্নয়ন পৃথক কোন ব্যাপার নয়। সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা নিজ নিজ কর্মসূচি যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বাস্তবায়িত করলেই গ্রামের প্রাপ্য স্বত:স্ফূর্তভাবেই মিলে যাবে। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরিকল্পনার এই স্বয়ংক্রিয় প্রতিফলই গ্রাম অঞ্চলে উন্নয়নের রূপ নেবে। এই সব সংঙ্গায় কোনোটাতেই স্থানীয় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষমতা বলয়ের উল্লেখ করা হয়নি। এইসব সংজ্ঞায় বহিরাগত, 'পরিবর্তনকামী' মাঠ-কর্মীর ভূমিকাকে বড় করে দেখা হয়েছে। এই সব পরিবর্তন কামী মাঠকর্মী স্থানীয় অথবা জাতীয় ক্ষমতা বলয়ের প্রেক্ষিতে গতিশীল গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারন মানুষের কল্যানে নিবেদিত হতে পারে কি না সে সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। আসলে গ্রাম উন্নয়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। এখানে শুধু কারিগরি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক দেখেলেই চলবে না, রাজনৈতিক বিবেচনাও প্রাধান্য দিতে হবে।

পল্লী উন্নয়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পল্লী বাসীদের পারিপার্শ্বিক নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং নিয়ন্ত্রনের এই দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সুফল লাভ নিশ্চিত করা যায়। পারিপার্শ্বিক নিয়ন্ত্রনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে যখন পল্লীর সাধারন মানুষ সংঘবদ্ধ হতে পারবে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে ভেতর পল্লী ও বাইরের (নগর) শোষন বা কর্তৃত্বকে খর্ব করার ক্ষমতা অর্জন করবে। পল্লী বাসী বিশেষ করে তাদের দরিদ্র অংশ যদি নিজেরা আগ্রহী হয়ে সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাহলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্য গৃহীত কর্মসূচিতে বাইরের অর্থাৎ রাষ্ট্রের সাহায্য সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন হবে, কিন্তু বাইরের নিয়ন্ত্রন ও কর্তৃত্ব পল্লীবাসীর স্বত:স্ফূর্ত উন্নয়ন কামনাকে স্মিমিত করে রাখলে এই দক্ষতাবৃদ্ধি পুরোপুরি হবে না। পারিপার্শ্বিককে এই সংজ্ঞায় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রকৃতিগত শক্তিসমূহের আকর হিসেবে দেখানো হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন, যে কোনো ধরনের উন্নয়নই একটি দীর্ঘ প্রচেষ্টা, অনেকগুলি কর্মসূচি সমন্বিত বাস্তাবায়নের ফলাফল। যদি পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতিমালা বা সিদ্ধান্ত তাৎক্ষনিক ভিত্তিতে বা বিক্ষিপ্তভাবে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য বা বর্তমান কোনো

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য গৃহীত না হয়ে সুশৃংখলভাবে অভ্যান্তরীন সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মসূচী চিহ্নিত করতে সহায়ক হয় তাহলে উন্নয়ন উদ্দেশ্যে সঙ্গে নীতিমালা বা সিদ্ধান্তের সম্পর্ক অনায়াসেই খুজেঁ বের করা সম্ভব।অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা গিয়েছে যে যেখানে উন্নয়ন নীতির মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত রযেছে সেখানে তিন ধরনের উদ্দেশ্য অর্জনে পল্লী উন্নয়নের কর্মসূচি নেয়া হয়ে থাকে। এগুলি হলো ঃ (ক) কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি (খ) পল্লীবাসীদের সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সংগঠন শক্তিশালী করা এবং (গ) সামাজিক অর্থনৈতিক বৈসাম্য দূরীকরন (হাই,১৯৯০:৬৫-৬৬)। অনুন্নত দেশে এর যে কোন একটি উদ্দেশ্যে প্রতি গুরুত্ব কখনো কখনো দেয়া হলেও একাধিক বা তিনটির ভিত্তিতেই উন্নয়ন নীতিমালা তৈরি করা হয়ে থাকে।দরিদ্র মানুষের জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মাত্রার বস্ত্রের সরবরাহ, স্বাস্থ্য সম্মত বাসস্থান, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদন অন্যতম উৎপাদনশীল উপাদানের হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এভাবে দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পুরনের জন্য একদিকে দেশের সার্বিক উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন অন্যদিকে এই উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল যাতে দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পুরনে সক্রিয় থাকে তার প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় পল্লীবাসী মানুষের উন্নয়নের নামই পল্লী উন্নয়ন।

২.৮ গ্রামীন উন্নয়ন প্রধান প্রধান সূচকসমূহ

গ্রামীন উন্নয়নের প্রধান প্রধান সূচকসমুহ হলো-

(ক) জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

(খ) কৃষি খাত থেকে ছদ্ম বেকারত্ব দূর করা ও অকৃষি খাতে শিল্প, বানিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্বি।

(গ) পল্লী এলাকার মানুষের মধ্যে আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য কমিয়ে আনা।

(ঘ) স্বপ্ল সুদে প্রতিষ্ঠানিক ঋনের সুযোগ, এবং

ঙ) গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন।

ক) জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিঃ

বাংলাদেশে চাষযোগ্য জমির পরিমান দিন দিন কমে আসতেছে। ফলে জমির পরিমান বাড়িয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ নাই। ফলে বর্তমানে কৃষি প্রবৃদ্ধির হার মূলত উৎপাদন শক্তির বিকাশের ওপরই নির্ভরশীল এবং ভবিষ্যতে এর ওপর নির্ভরশীলতা আরো বাড়বে। বছরে একাধিক ফসল চাষ করে একদিকে যেমন জমির শষ্যঘনতা বাড়নো যায় তেমনি অন্যদিকে উফসী প্রযুক্তি ব্যবহার করেও একর প্রতি ফলন প্রচুর পরিমানে বাড়নো যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে এক চতুর্থাংশ জমিতে উফসী প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ জমি বর্গাচাষ পদ্ধতিতে আবাদ করা হয়। সমগ্র দেশ জুড়ে তে ভাগা পদ্ধতি অনুযায়ী বর্গাপদ্ধতি এখনো চালু না হওয়ার কারনে বর্গাচাষীদেরকে উফসী প্রযুক্তির অন্তর্ভূক্ত করা যাচ্ছে না।

খ) কৃষি খাত থেকে ছদ্ম বেকারত্ব দুর করাও অকৃষি খাতে শিল্প, বানিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিঃ

বাংলাদেশের কৃষি খাতে ছদ্ম বেকারত্বের হার বর্তমানে প্রকট। বাংলাদেশে এমন অনেক কৃষি জমি আছে যেখানে কয়েক ভাই মিলে একটি জমি চাষ করে। পর্যবেক্ষন করে দেখা গেছে ঐ সমস্ত জমিতে কয়েক ভাইয়ের মধ্যে দুএকজনকে উৎপাদন থেকে সরিয়ে নিলেও মোট উৎপাদন তেমন পরিবর্তন হয় না। এখানে উক্ত দু'একজনকে ছদ্ম বেকার বলা যেতে পারে। কারন তাদের প্রান্তিক উৎপাদন শীলতা শূন্যের কোঠায়। এ সমস্ত ছদ্ম বেকারগন কৃষিতে বাড়তি বোঝা হয়ে আছে। তাছাড়া কৃষিখাতে মৌসুমী বেকারত্ব তো রয়েছেই। এই ছদ্ম বেকার ও মৌসুমী বেকারদের অকৃষি খাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা পল্লী উন্নয়নের জন্য খুবই জরুরী (বনিক, ১৯৯৩:৭৮-৭৯)।

অকৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য গ্রামে গঞ্জে রাস্তা ঘাট বাজার ইত্যাদি গড়ে তোলা প্রয়োজন। বর্তমানে এই বিপুল সংখ্যক ছদ্ম বেকার ও মৌসুমী বেকারদের বাইরে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ছয় লাখ নতুন শ্রমিক শ্রম বাজারে প্রবেশ করে এবং তাদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন দেখা দেয়। যদি কুটির শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক শতকরা ছয়ভাগে উন্নত কথা যায় তবে প্রায় এক পঞ্চমাংশ কে প্রতিবছর কুটির শিল্পে নিয়োগ করা যায়।

গ) পল্লী এলাকার মানুষের মধ্যে আয় ও সম্পদ বন্টনে অসমতা কমিয়ে আনা:

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, মৃত্যু, আয় বৈষম্য বর্তমানে প্রকট। অসহনীয় দারিদ্র্য নিমজ্জিত বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরনের জন্য প্রথমেই তাদের আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন এবং এই আয় বাড়ানোর জন্য প্রত্যেক সক্ষম মানুষের অনুকূলে লাভজন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মতে শুধু ব্যক্তিগত আয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পুরনের সামর্থকে পরিস্ফুট করে না। অন্যান্য বহু বিষয় আমাদের মত দরিদ্র দেশগুলোতে জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, যেমন- স্বাস্থ্য সুবিধার প্রাপ্যতা, মৌলিক শিক্ষার সুযোগ, মহামারীমুক্ত পরিবেশ, নিরাপদ জীবন যাপনের উপযোগী মুক্ত পরিবেশে ইত্যাদি। এগুলো সরকারি কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে। প্রাথমিকভাবে এইসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাথে সম্পদের যে প্রান্তিক বৃদ্ধি তাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশ বাড়ানো (বনিক, ১৯৯৩:৮২)।

ঘ) স্বল্প সুদে প্রাতিষ্ঠানিক ঋনের সুযোগ:

পল্লী অঞ্চলে কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি প্রসারের সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋনের প্রয়োজন। শুধু কৃষিতেই নয়, অকৃষি খাত, যেমন কুটির শিল্প, ব্যবসা, পরিবহন, পশুপালন ইত্যাদি খাতেও প্রাতিষ্ঠানিক ঋনের প্রয়োজন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এ ধরনের ঋন পল্লীর জনগনকে শুধু যে স্থানীয় মহাজনদের আকাশচুম্বি সুদের হার থেকেই রক্ষা করে তাই নয় বরং তা এর ব্যবহারকারীদের আয় বাড়াতে ও সম্পদের মালিক হতে সাহায্য করে।

ঙ) গ্রামীন ক্ষমতা-কাঠামোর পরিবর্তন:

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা কাঠামোর একটি নিজস্ব ধারা রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে যারা সালিশ দরবার, বিচার আচার করেন তাদের বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করা হয়। যেমন- মাতুব্বর, প্রামানিক, সর্দার, মন্ডল, প্রধান ইত্যাদি। এই মাতুব্বর শ্রেনীই গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করে। গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে যারা অবস্থান করে সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রন তাদেরই হাতে থাকে। একজন মাতবর গড়ে প্রায় ১২ একর জমির মালিক। সরকার কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ভর্তুকি মূল্যে যে সেচের ব্যবস্থা করেছেন তার সিংহভাগ সুবিধাই ভোগ

করেছেন এই মাতবর শ্রেনী। মাতব্বরদের মোট আবাদী জমির ৪৪ শাতংশ এখণ সেচের আওতায় যেখানে জাতীয় হার ২৬ শতাংশ গ্রামের মাতব্বর শ্রেনীর সংগে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা এবং প্রশসানিক আমলাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারনে গ্রামীন ভৌত অবকাঠামোগত নির্মান কাজ থেকে শুরু করে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্ম তাদের নিয়ন্ত্রনে। এভাবে গ্রামীন ঐতিহ্যবাহী ক্ষমতা কাঠামো এখন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। যতদিন পর্যন্ত এই গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন করা না যাবে ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের সত্যিকারের গ্রামীন উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না (বনিক, ১৯৯৩:৮৩)।

২.৯ গ্রামীন নারীর দারিদ্র্যতা

বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০০১ সালের আদমশুমারির হিসেব অনুযায়ী ১২ কোটি ৯২ লাখ ৪৭ হাজার ২৩৩ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৬, ৫৮, ৪১, ৮১৯, এবং মহিলা সংখ্যা ৬, ৩৪, ০৫, ৮১৪। অর্থাৎ দেশে প্রতি ১০৩.৮ জন পুরুষের অনুপাতে নারী হচ্ছেন ১০০ জন। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই অনুপাত ছিল প্রায় ১০৬ জন পুরুষ। দেখা যাচ্ছে মোট জনসংখ্যায় নারীর সংখ্যা ধীরে ধীরে পুরুষের সংখ্যার কাছাকাছি এগুচ্ছে। কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে মেয়েদের স্থান পুরুষের তুলনায় অবনমিত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে ব্যাপক Gendergap। এদেশে যুগ যুগ ধরে নারীরা পুরুষের কর্তৃত্বের অধীন, পরিবারে লালনকারী এবং শিশুর জন্মদাতা হিসেবেই পরিগনিত হয়ে এসেছে। অধিকাংশ সমাজে দরিদ্র বেকার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগনের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে নারী। অধিকন্তু লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও অধস্তনতাজনিত বাড়তি চাপ ও নারী সহ্য করে।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এমনকি আইনগত দিক থেকে পুরুষের চেয়ে অনেক নিম্নে অবস্থান করছে। আমাদের সমাজে নর-নারীর অবস্থান দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য তা যতটা না জৈবিক তার চেয়ে বেশী সামাজিক কারণে হয়ে থাকে। সামাজিক কিছু রীতিও মূল্য বোধ জন্মের পর থেকে পৃথকভাবে শিশুদের সামাজিকীকরন ব্যবস্থা চালু করে। এইরীতি ও মূল্যবোধ সমাজ থেকেই সৃষ্টি। ফলে এই রীতি ও মূল্যবোধ ছেলেদের এক রকম এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে অন্য রকম আচরনের শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের সমাজব্যবস্থায় পুরুষকে বেশী প্রধান্য দেওয়া হয় এবং পুরুষকে ক্ষমতার আধার হিসাবে দেখা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমতার কথা উল্লেখ থাকলেও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, চাকুরি, বিবাহ, বংশ নিধার্রন, সম্পদের, মালিকানা ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। শিক্ষা দেশের সামাজিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হলেও বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে যা ব্যয় হয় তার সিংহভাগই চলে যায় পুরুষের পেছনে। মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। এডুকেশন ওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুরুষদের তুলনায় দেশের নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে ১২ শতাংশের ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৪৭.৬ শতাংশ এবং নারী সাক্ষরতার হার ৩৫.৬ শতাংশ। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী ৩০ বছরে নারী শিক্ষার অগ্রগতি মাত্র ২৭.৬ শতাংশ। বাংলাদেশের নারীর শিক্ষাগ্রহনের ক্ষেত্রে এগিয়ে এলেও যুগের সাথে এগোয়নি দেশের নারী শিক্ষা। গ্রাম সমাজ ও দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারে নারীর শিক্ষার মূল্য খুবই কম। গ্রামের মেয়েরা স্কুলে যাবার বদলে ঘরে বসে থেকে মাকে সাহায্য করে। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের পিছিয়ে থাকার কারন হিসেবে মূলতঃ দারিদ্র্যকে দায়ী করা হয়। এছাড়া সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে, সন্তান ধারন, সাংসারিক কাজের বোঝা, জেন্ডার পক্ষপাতিত্ব, স্কুলের দুরুত্ব ইত্যাদি কারনে নারী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে মেয়েরা বৈষম্যর শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের ৭০% নারী পুষ্টিহীনতহায় ভুগছেন। বিশ্ব ব্যাংকের এক গবেষণার ফলাফল দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের একজন পুরুষ গড়ে প্রতিদিন ২,২৯৯ ক্যালরি গ্রহন করেন আর একজন নারী গ্রহন করেন গড়ে ১.৮৪৯ ক্যালরি। বাংলাদেশের একজন গৃহবধু পরিবারের সবার শেষে এবং সর্বশেষ তলানীটুকু আহার হিসেবে গ্রহন করেন। প্রতিটি পরিবারই মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে যে সে নিজেই নিজের পরিবারে খাদ্যের দিক থেকে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। রক্তশূন্যতা সমগ্র বিশ্বব্যাপী নারীর একটি প্রধান রোগ। বিশ্বে সকল নারীর ৪৩% এবং গর্ভবতী নারী ৫১% লৌহজনিত রক্তশূন্যতায় ভোগেন। নারীদের স্বাস্থ্যের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ হাজার নারী প্রসবকালীন জটিলতায় মারা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিসেফের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবছর ৬,০০,০০০ জটিল ডেলিভারী কেসের মধ্যে ৯০% পরিচালিত হয় অপ্রশিক্ষিত ধাত্রীর হাতে। প্রতিবছর প্রায় ৪ মিলিয়ন নারী সন্তান জন্ম দেন, এদের মাঝে ৬০% রক্তশূন্যতা এবং অপুষ্টিতে ভোগেন। ৫ বছরের নীচে ছেলে শিশুর তুলনায় মেয়ে শিশুর ক্যালরির গ্রহনের হার শতকরা ১৬ ভাগ কম। ৫-১৪ বছরের বয়সের ছেলের তুলনায় মেয়ে ১১ ভাগ কম এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী শতকরা ২৯ ভাগ কম। পুরুষের আয়ুষ্কাল হচ্ছে ৫৯.১ বছর। অন্যদিকে নারীদের ৫৮.৬ বছর। শিশুর মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬৭। ১-৪ বছরের মধ্যে প্রতি হাজারে ছেলে শিশুর মৃত্যুর হার ১১.৪, অন্যদিকে মেয়ে শিশুর মৃত্যুর হার ১১.৮ (চৌধুরী, ২০০২:২৭৫)।

বিয়ের ব্যাপারে ছেলেদের মতামতকে গুরুত্বের চোখে দেখা হলে মেয়েদের মতামতের কোন মূল্য দেয়া হয় না, এ ব্যাপারটি গ্রামে বেশী লক্ষ্য করা যায়। বিয়ের ব্যাপারে পাত্রীর পছন্দ অপছন্দের তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। গুরুজনরা যা ভাল মনে করেন সেটাই করে থাকেন মেয়েদের ক্ষেত্রে। আমাদের সমাজে বংশ নির্ধারনের ক্ষেত্রেও নারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়। যেহেতু সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে একজন মায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য অথচ মায়ের সেই ভূমিকাকে গুরত্ব না দিয়ে সন্তানের উপর পিতার অধিকারকেই বড় করে দেখা হয়। বাংলাদেশের বংশ নির্ধারিনের ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য অধিকার একচেটিয়া ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি সন্তানের নামও বাবার নামানুসারে হয়। আমাদের সমাজে ধরে নেওয়া হয় যে, বাবার সাথে রক্তের সম্পর্ক থাকে। এর পিছনে কোন যুক্তি নেই। এটি সামাজিক নিয়ম হিসাবে চলে আসছে। পিতৃপ্রধান মূল্যবোধের মাধ্যমেই এটা নির্ধারিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক এ সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা জন্ম লগ্ন থেকেই অসমতার শিকার। পুত্র সন্তানের প্রত্যাশা তার সবচেয়ে বড় প্রমান। অনেক সময় পুত্র সন্তান তথা বংশের বাতির জন্য পুরুষেরা দ্বিতীয় বিয়ে করে। কিন্তু কন্যা সন্তানের প্রত্যাশায় কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করেছে এমন কথা শোনা যায় না। কন্যা সন্তানের লালন-পালনকে অলাভজনক মনে করা হয়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে কন্যা সন্তান যেন ক্ষনিকের অতিথি। উপরন্ত তাদেরকে অর্থনৈতিক বাঝা বলে মনে করা হয়। এভাবে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতার জন্ম দেয়।

পরিবার ও সমাজে নারীর অধীনস্থ অবস্থানের জন্য আরও যে কারনটি দায়ী তা হলো সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। এই ব্যবস্থায় ছোট থেকেই ছেলে ও মেয়েদের আলাদাভাবে বেড়ে উঠার মানসিকতা গড়ে তোলা হয়। ছেলেদের যেখানে চঞ্চলতা, উচ্ছলতা, খেলাধুলা প্রভৃতিতে উৎসাহিত করা হয় সেখানে মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হয় ধীরতা, স্থিরতা এবং ঘরের কাজে মনোনিবেশের আদেশ। Ayesha Noman, Shoma chatterjee, Rita sood এরা তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে সামাজিকীকরন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছোট থেকেই ছেলেদের জগৎ ও মেয়েদের জগৎ দুটো আলাদা করে দেয়া হয়। মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ ও ছেলেদের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। প্রচলিত মূল্যবোধের মাপকাঠিতে তাদেরকে ধৈর্য্য সহনশীলতা ও ত্যাগ- এই তিন গুনের সমাহারে আদর্শ নারী হিসেবে গড়ে ওঠার শিক্ষা দেয়া হয়। এমন কি নিজের হীন মর্যাদাকের স্বীকার করে নেয়ার মানসিকতাও শেখানো হয়। ফলে তখন থেকেই শুরু হয় মেয়েদের অধস্তনতার প্রক্রিয়া (মঈন, ১৯৯৮:৬০)।

ধর্মীয় ধান ধারনার ফলশ্রুতি পর্দা প্রথা মেয়েদের বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে রাখে। প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মনে করা হয় সে মেয়েরা নিজেদের রক্ষনাবেক্ষনে অক্ষম। আর তাই তাদের আচরন ও চলাফেরা নিয়ন্ত্রন করার উদ্দেশ্য তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় পর্দা প্রথা। কিন্তু এই পর্দা প্রথা মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষনের চেয়ে তাদের উপর পুরুষদের অধিকার ও ক্ষমতা প্রয়োগের একটি মাধ্যমে পরিনত হয়। যখনই একটি মেয়ে কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পদার্পন করে তখনই তার চলাফেরার একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেয়া হয়। এই পর্দা প্রথার কারনে মেয়েরা ঘরের চার দেয়ালের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের গতিশীলতা হয় ব্যাহত। পর্দা প্রথার দমনমূলক বৈশিষ্ট্য মেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। অনেক বিধি নিষেধ ও নির্দেশাবলীর চাপে তাদের নীচে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় যা থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ সাধ্য নয় (মঈন, ১৯৯৮:৬১)।

সমাজে বিদ্যমান প্রথাগত লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজনও সমাজে নারী এবং পুরুষের পৃথক পৃথক অবস্থানের জন্য দায়ী। শ্রমবিভাজন অনুযায়ী সাধারনত পুরুষের পরিবারে অন্নসংস্থানকারীর ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে মহিলারা তাদের দেখাশোনা ও সন্তান লালন পালন সহ ঘরের যাবতীয় কাজ করবে বলে ধারনা করা হয়। ফলে পুরুষেরা হয় পরিবারের কর্তা আর পুরুষদের উপর নির্ভরশীল বলে সারাদিনের অক্লান্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিশ্রমের পরও মহিলারা তাদের অধীনে থেকে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও নিম্ন মর্যাদার জীবন যাপনে বাধ্য হয়। প্রচলিত জাতীয় আয় (GDP) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষদের উৎপাদনশীলতার যেখানে প্রায় ৯৮ শতাংশ হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীদের উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ গননা করা হয়। গৃহস্থালীর কাজ প্রায় এককভাবে নারী সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু কোথাও নারীদের গৃহস্থালীর কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হয় না (সুলতানা,১৪০৮:১৯৩)। তাই বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীদের এই অদৃশ্য অবদান স্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায় যা পরিমাপ করা হয় না। শুধু ঘরের অঙ্গিনায় নারী যে শ্রম দিচ্ছে তা একজন পুরুষ শ্রমিকের গড় শ্রমের তুলনায় অনেক বেশি। আইএলও-র এক সমীক্ষায় প্রকাশ, নারীর মোট গৃহস্থালী শ্রম যোগ করলে তা অনেক দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেক হবে। অন্য এক হিসেবে, আমেরিকার মেয়েদের বিনিময় মূল্যহীন গার্হস্থ্য শ্রম বাজার দরে কিনতে হলে ১৯৭৮ সালে ডলারের মূল্য তা দাড়াতো মাথাপিছু প্রায় বার্ষিক ১৪,০০০ ডলার। এক বছরে বর্তমান বিশ্বে নারীর মজুরিবিহীন গৃহ শ্রমের মূল্য ১১ লক্ষ কোটি ডলার। আফ্রিকার মোট উৎপাদিত ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ খাদ্য প্রত্যক্ষভাবে নারীর শ্রমের ফসল। বাংলাদেশে বর্তমানে ৪৬% নারী শ্রম শক্তির অন্তর্ভূক্ত। এর মধ্যে মোট ৭৩.৬% নারী কৃষি কাজে যুক্ত এবং মজুরিবিহীন গৃহ শ্রমে নারীর অংশগ্রহন ৭১%। বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মনে করা হয় যে, একজন পুরুষ অর্থ উপাজর্ন করে পরিবারকে রক্ষার জন্য অন্যদিকে একজন নারী শ্রম দেন গৃহকর্মের বাইরে অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য। বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজে একজন নারীর গৃহের বাইরে শ্রমদান এখন পর্যন্ত সহজ গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। বাংলাদেশের প্রধান জীবিকা কৃষি কাজকে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে, পুরুষ প্রধানত জমিতেই কাজ করেন আর একজন নারী বীজ রক্ষা করা, ধান কাটা, ধান সিদ্ধ করা, শুকানো, ভানা সবশেষে বাজারে বিক্রি এবং খাদ্য হিসেবে গ্রহনের জন্য উপযুক্তভাবে তৈরি করেন। একজন নারী এ সকল কাজ তার গৃহস্থালির কাজের অংশ হিসেবে করে থাকেন কোন মজুরি ব্যতিরেকেই। বাংলাদেশের একজন নারী কোনো অবস্থাতেই তার গৃহস্থালির কাজের জন্য কোন মজুরি পান না। বাংলাদেশে পারিবারিক কাজে সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োজিত শ্রমশক্তি হচ্ছে মোট শ্রমশক্তির ৪৫.৮%। এর মধ্যে পুরুষ হচ্ছেন ১৯.৮% এবং নারী ৮২.৫%। একটি গ্রামীন নারী কর্মকান্ড সীমক্ষায় দেখা গেছে যে, গ্রামে নারীরা দৈনিক ৮ থেকে ১২ ঘন্টা প্রত্যক্ষ বা

Dhaka University Institutional Repository

পরোক্ষভাবে উৎপাদনশীল কর্মে ব্যয় করে থাকে। এই কর্ম না করলে পরিবারটিকে এই কর্মের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হতো। অপরদিকে গ্রামীন পুরুষরা দৈনিক ৫ থেকে ৮ ঘন্টা উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োজিত থাকে। এরপর ও নারীকে মনে করা হয় দুর্বল ও অনুৎপাদনশীল প্রানী। বিআইডিএসএর এক গবেষণায় রহমান দেখিয়েছেন যে, নারীরা সপ্তাহে পুরুষের তুলনায় ২১ ঘন্টার বেশি সময় কাজ করে থাকেন। বাংলাদেশের শহর অঞ্চলেও একজন নারী বিভিন্ন ভাবে মজুরি থেকে বঞ্চিত হন। কাজের ক্ষেত্রে অধিক পরিশ্রম করা সত্ত্বেও পুরুষের তুলনায় নারী অর্ধেক মজুরি পান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই পান না। বাংলাদেশে এখণ অন্যতম প্রধান শিল্প পোশাক শিল্প যার সিংহভাগ কর্মী গ্রাম থেকে স্থানান্তরিত দরিদ্র নারী। যারা পোশাক শিল্পের মোট শ্রম শক্তির ৮৫% শিক্ষার্থী হিসেবে কর্মে যোগ দেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষনকালীন সময়ে কোনো মজুরি পান না এমনকি প্রশিক্ষণ শেষে একজন দক্ষ নারী শ্রমিক পুরুষের তুলনায় ২২.৩ কম মজুরি পান। অথচ নারী তার শ্রম দিয়ে কোটি কোটি টাকা উপার্জনে সহায়তা করছেন। বাংলাদেশের একজন পুরুষ শিল্প মালিক নারী শ্রমিকের শ্রমকে শোষণ করে ধনী হচ্ছেন আর নারী দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছেন। প্রতিমাপাল মজুমদার তার গবেষণায় লক্ষ্য করেছেণ, কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকরা নানাভাবে শোষনের শিকার হচ্ছেন, যা শ্রম বাজারে প্রবেশের পূর্বে তাদের কাছে ছিল প্রায় অপরিচিত। যে আর্থিক নিরাপত্তার আশায় তারা মজুরি কর্ম গ্রহন করেছিলেন সে আর্থিক নিরাপত্তা তারা বহুক্ষেত্রে পানা। নারীরা মজুরি কর্ম গ্রহন করার পর দেখা গেছে তারা মজুরিতে, পদোন্নতি প্রাপ্তিতে, বেতনসহ ছুটি, বোনাস ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে বৈষম্যর শিকার হচ্ছে। এমনকি শ্রম ঘন্টাতে ও নারী পুরুষ বৈষম্য বিরাজমান। তাই মজুরি শ্রমের বদৌলতে মহিলারা তাদের ভোগমান পূর্বের তুলনায় কিছুটা উন্নত করতে পারলেও জীবনযাপনের অন্যান্য মানদন্ডের বিচারে তাদের জীবনে উন্নতি না হয়ে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছেন অন্য আর এক ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে।

নারীর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো তার প্রজনন ক্ষমতা। নারী এর দ্বারা সমাজ, দেশ ও বিশ্বের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মশক্তি উৎপাদন করছে। এই শ্রমের স্বীকৃতি নেই, সম্মান নেই। উপরন্তু এই প্রজনন ভূমিকার দোহাই দিয়ে নারীকে অর্থনৈতিক উৎপাদন থেকে বিছিন্ন করে রাখা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়িত করেছে অনুন্নত

Dhaka University Institutional Repository

জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কিত করে। বিশ্বব্যাংকের মতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা ও অজ্ঞতা, উচ্চ শিশু মৃত্যু ও ব্যাপক অপুষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা যে জনসমষ্টির মধ্যে পরিচালিত হয় তারাই দরিদ্র। এই হিসাবে বাংলাদেশের এক ব্যাপক জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের কবলে নিমজ্জিত। আর এ জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই হচ্ছেন এ দেশের পিছিয়ে পড়া নারী সমাজ যারা সব সূচকের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বহুগুনে পিছিয়ে আছেন। যখন বিশ্বে সম্পদের সংকট দেখা দেয় নারী সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হন কারন নারীরা দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম। নারী সম্পদের সর্বশেষ অংশ ভোগ করেন তাই দারিদ্র্য আর ক্ষুধা নারীদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। দারিদ্র্যের নারীমুখীকরন মূলত নানামাত্রিক জেন্ডার বৈষম্যরই ফলশ্রুতি। দারিদ্র্য, সুযোগ ও ক্ষমতাহীনতা এর প্রধান কারন। বিশ্বের ১৫৫ কোটি মানুষের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ৭০% নারী। পৃথিবীতে পল্লী অঞ্চলের ৫৫ কোটির বেশি নারী দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। এছাড়া বিশ্বে প্রায় ১০ কোটি গৃহহীন এবং ২ কোটি ৭০ লক্ষ উদ্বাস্তুর ৭৫ থেকে ৮০ ভাগই নারী ও শিশু। বাংলাদেশের দারিদ্র্যতা প্রকট এবং এর তীব্রতা গ্রামীন এলাকায় সর্বোচ্চ। গ্রামে যাদের কাছে দারিদ্র্যসবচাইতে রূঢ়তম রূপ নিয়ে দেখা দেয়, তারা হলো দরিদ্র মহিলা।

২.১০ উন্নয়ন ধারার ব্যাখ্যা ও নারীর অবস্থান

বাংলাদেশের নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাষিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার কুসমন্ডকতা ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীকে করে রাখার হয়েছে অবদমিত। নারীর মেধা ও শ্রমশক্তিকে শুধুমাত্র সাংসারিক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। সমাজও দেশ গঠনের কাজে তাকে কখনও সম্পৃক্ত করা হয়নি। সভ্যতার আদিকাল থেকে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে মহিলা জনগোষ্ঠী পুরুষের কর্তৃত্বাধীন এবং সমাজের ব্যাপক অবহেলিত অংশ। সভ্যতার অগ্রগতিতে নারী সমাজের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে, কিন্তু তা যথেষ্টভাবে স্বীকৃতি নয়। জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সর্বস্তরে তারা গৌন মর্যাদা ভোগ করে থাকে। পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পেশা প্রভৃতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের তুলনায় সুবিধা বঞ্চিত একটি গোষ্ঠী।

পুরুষ শ্রেষ্ঠত্ব ও নারীর অধীনস্ততা আমাদের সমাজব্যবস্থায় অতি প্রাচীন ও স্বীকৃত বাস্তবতা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এর জন্য অনেকাংশে

Dhaka University Institutional Repository

দায়ী। এখানকার সমজাকাঠামো নারীর আচরন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কঠোর অনুশাসনের প্রতিষ্ঠানিকীকরণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। নারী সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে পুরুষরা পরিবারের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব নিয়োজিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা জন্মলগ্ন থেকেই অসমতার শিকার। আমাদের সমাজে প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতার জন্ম দেয়। এখানে পুরুষের ক্ষমতার সাথে পরিবারিক, আদর্শিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রক্রিয়া জড়িত। ধর্মীয় ধ্যান ধারনার ফলশ্রুতি পর্দা প্রথা, সমাজে প্রচলিত সমাজিকীকরণ প্রক্রিয়া পিতৃতন্ত্র, লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজন, প্রচলিত মূল্যবোধ ও ধ্যান ধারণা এবং সর্বোপরি প্রথাগত ঐতিহ্যক মনোভাব পরিবার ও সমাজে নারীর অধীনস্থ অবস্থানের জন্য দায়ী।

দেশের শতকরা ৪৬ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই দুই-তৃতীয়াংশই নারী। এখন পর্যন্ত নারীর অনেক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয় নাই। সংসারের পরিসরে নারীর শ্রমবিনিয়োগের কোন মাপকাঠি এখানও উদ্ভাবন করা যায়নি। চাকুরি ও স্ব-কর্মসংস্থান উভয় ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারী পিছিয়ে আছে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজের উন্নয়ন কর্মকান্ড অংশগ্রহন ব্যতীত জাতীয় সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের নারী সমাজকে বিভিন্ন সমাজিক অথনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়। নারী উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে নারী উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় সে সাম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা অবশ্যক।

পাকিস্তান যখন বিভক্তিকরণ হয় তখন সরকার নারী উন্নয়নের জন্যে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। এ ব্যাপারে তাদের কোন চিন্তাভাবনাই ছিল না। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী নেতৃত্বে এবং সরকারি অনুকূলে নারীদের একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। এর নাম হচ্চে, আল পাকিস্তান উইমেনস অ্যাসোসিয়েশণ (APoA), আপওয়া নামে সংগঠনটি পরিচিত ছিল। প্রধানত সরকারি আমলাদের স্ত্রীদের নিয়ে সংগঠনটি গঠিত হয়। তারা নিজেদের জন্য মিনা বাজার ও নানা ধরনর অনুষ্ঠানের আয়োজনে করলেন, অন্যদিকে দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য দুধ ও খাবার বিতরন করলেন। আপওয়ার সদস্যরা শ্রেণীগত দিক থেকে উচ্চবিত্ত হওয়ায় নারীর ওপর শোষনের রুপকে তারা সনাক্ত করতে পারেন নাই। তারা

Dhaka University Institutional Repository

মনে করেন উচ্চবিত্ত মহিলাদের মুক্তি হচ্ছে পারিবারিক গন্ডির মধ্য থেকে খানিক বাইরে আসা, যাতে তারা স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে উঠতে পারেন, আর সমাজ কল্যাণ মানে হচ্ছে দরিদ্র মহিলাদের জন্যে কিছু অর্থ কিংবা দুধ পাওয়র ব্যবস্থা করা। নারীর সামাজিক অবস্থানের অর্থনৈতিক বা ধর্ম ও পুরুষতান্ত্রিক বঞ্চনা, এসব শোষনের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন না তুলেই তারা দীর্ঘদিন কাজ চালিয়েছেন। ষাটের দশকে আখতার হামিদ খান কুমিল্লা একাডেমীতে নারী উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে খুব ভাল ভাবে উপলব্ধি করলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী এখনো অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। গৃহের অভ্যন্তরে নারীর অবরোধকে তিনি নারী উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করলেন। তাই আখতার হামিদ খান গ্রামের সাধারন নারীদের ঘর থেকে বের করে আনার কাজটা করতে চাইলেন। তিনি আহবান জানালেন কুমিল্ল কোটবাড়ীতে সবাইকে জমায়েত হতে। ১৯৬৬ সালে দলে দলে মেয়েদের কুমিল্লা কোটবাড়িতে জমায়েত হতে দেখে আখতার হামিদ খান হতবাক হয়ে গেলেন। সাধারন নারীদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি আপত্তয়ার অজ্ঞতার কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু নারী উন্নয়নে সরাসরি তার তাৎপরতার উদ্দেশ্য হিসেবে স্থান পেলো না। তিনি কৃষির আধুনিকীকরণের প্রতিবন্ধকতা দুর করার জন্য কৃষকের স্ত্রীকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। নারীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি চেয়েছিলেন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রেনের জন্য। সত্তর দশকের প্রাক্কালে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় মধ্যাবিত্ত শ্রেনীর মহিলাদের নেতৃত্বে আরএকটি নতুন সংগঠন গড়ে ওঠে। এর নাম হচ্ছে মহিলা পরিষদ। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মহিলারা স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং শহুরে বাঙালী মহিলাদের দু:খদুর্দশা দুরীকরনের জন্যে নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। এসব সংগঠন শহুরে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের নিয়ে গড়ে ওঠা সংগঠন হওয়ার গ্রামীন মহিলা কিংবা সাধারন মহিলাদের ভাগ্য উন্নয়ন সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা তাদের মধ্যে ছিল না। সাধারণ মহিলাদের প্রতি কেবল মাত্র সমাজ কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া অণ্য কিছু তারা ভাবেন নি (নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৮৬ : ১০-১১)।

৬০ এর শেষ ৭০ দশকের প্রারম্ভে একদল উন্নয়ন বিশারদের আবির্ভাব ঘটে-যারা গবেষনার ভিত্তিতে দেখেছেন যে তৃতীয় বিশ্বে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছিল তাতে নারীরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি, এবং যতক্ষণ না নারীরা এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করবে ততক্ষণ সেই সমাজের প্রকৃত

উন্নয়ন সম্ভব হবে না। এ সালে গবেষক ও বিশেষজ্ঞদেরকে Women in Development School (WID) নামে সম্বোধন করা হয় এবং তারা উন্নয়ন চিন্তার এক বিশেষ ধারা সৃষ্টি করে। এই ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বরং বলা যায় এই বিশেষ উন্নয়ন চিন্তার প্রভাবেই জাতিসংঘ ১৯৭৫ থেকে আন্ত র্জাতিক নারী দশকের ঘোষনা করে। এই আঙ্গিকে নারী বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা ও গবেষণা করার জন্য জাতিসংঘ একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করে যার নাম দেয়, United Nations International Research ad Training Institute Advancement of Women (INSTRAW) । এ সকল কার্যক্রমের এক স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হল যে বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে নারী উন্নয়নের জন্য বেশ পরিমান র্অথ বরাদ্দ হয় যার সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নারী বিষয়ক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। Women in Development নিয়ে আলোচনা করা পূর্বে উন্নয়ধারা প্রবর্তনের সঙ্গে আরেকটি সমান্তরাল উন্নয়নধারার কথা বলতে হয়। এটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাহায্যের ক্ষেত্রে একটি নতুন উন্নয়ন কৌশলের প্রবর্তন।

ষাট-এর দশকের শেষভাগে লক্ষ্য করা যায় যে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্যের ঝোঁক ছিল দ্রুত শিল্পায়ন ও সবুজ বিপ্লবের উপর। এবং দুই ধরনের উন্নয়ন পদ্ধতির ভিত্তি ছিল একটি বিশেষ তত্ত্বে: এক বার উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিকীকরণ সাধিত হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং সেই বৃদ্ধির ফল সমাজের গরিব শ্রেণীতেও আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়বে। এই কৌশলের নাম The trickle down approach । কিন্তু বাস্তব ও তাত্ত্বিক উভয় দিক থেকেই এই তত্ত্বের সমালোচনা হয়। এবং এই সমালোচনার ভিত্তি থেকেই জন্ম নেয় নতুন এক উন্নয়ন কৌশলের যেটা ৭০ দশকের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় নীতিগুলোতে প্রকাশ পায়। যুক্তারাষ্ট্রে এই নতুন কৌশল প্রবর্তিত হয় ১৯৭৩ সালে কংগ্রেসএ উত্থাপিত New Directions Aid program হিসাবে, ও ১৯৭৫ সালে যুক্তরাজ্যের সরকারের শ্বেতপত্রের মাধ্যমে প্রবর্তিত হয় "দরিদ্রদের উদ্দেশ্য উন্নয়ন সাহায্য"। এই একই সময়ে বিশ্বব্যাংকের ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রতি সাহায্য নীতি ও আরম্ভ হয়। এই নতুন কৌশলের মূলমন্ত্র ছিল basic needs approach অর্থাৎ ন্যূনতম চাহিদার উপর আলোকপাত করা, যার সংযুক্ত পদ্ধতি হচ্ছে target group পদ্ধতি। যেহেতু উৎপাদনের ফসল সবার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে না বরং কিছু শ্রেণী সেগুলি আত্মসাৎ করছে এবং তাতে শ্রেণী দ্বন্দ্ব বা গরিবীকরণ বেড়েই চলছে সুতরাং এমন একটি

কৌশল নিতে হবে যার মাধ্যমে সমাজের সবচেয়ে দরিদ্রতম অংশে সাহায্য পৌছানো যায় এবং তাদের ন্যূনতম চাহিদা মেটানো যায়। এর জন্য বিশেষ কিছু গোষ্ঠীকে যেমন ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন ও নারী সমাজকে টার্গেট করা হয়। নারীরা যেহেতু সমাজের অধস্তন অবস্থার বাস করছে, সম্পদের উপর পুরুষের সমান তাদের নিয়ন্ত্রন নেই, তাই তারাও এই বিশেষ কৌশলের উপলক্ষ্য। এভাবেই নারী উন্নয়ন সম্বন্ধে চিন্তা এই Basic Needs কৌশলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারি নীতির অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এবং প্রায় প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্য কার্যক্রমে নারী উন্নয়নের একটি বিশেষ খাত গঠন করা হয়েছে। নীতিগতভাবে বাংলাদেশের দুভাগে এই কৌশলে লাভবান হয়েছে। এক বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হওয়াতে সে এই নব উন্নয়ন কৌশল উপলক্ষ্য হতে পেরেছে এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ভূমিহীন। ক্ষুদ্র কৃষক ও নারী সমাজ। সুতরাং এদেরকে উপলক্ষ্য করে যে উন্নয়ন নীতি তা স্বভাবতই গৃহীত হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডে (গুহঠাকুরতা, ২০০০:৩৩-৩৪)।

বাংলাদেশের নারী ও উন্নয়ন নিয়ে লেখালেখির মধ্যে White চারধরনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে (Abdullah, 1974) এর কাজ, যে অনুযায়ী উন্নয়নকে একটি ভাল বিষয় হিসেবে দেখা হয় এবং এর সুফল যাতে নারীরাও ভোগ করেন, তাদের জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারনে তারা যেন এ থেকে বঞ্চিত না হন তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নারীরা হচ্ছেন অদৃশ্য সম্পদ যাদের উপেক্ষা করার কারনে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে বলে মনে করা হয়। (Wallace et al. 1987)। তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি যার প্রতিনিধিত্ব করেন Lindenbatum (1974), যা হলো এই যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া সচরাচর বিদ্যমান শ্রেণী বৈষম্যকে বাড়িয়ে দেয় এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা তৈরি করে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, এসবের প্রভাব বিশেষ করে নারীদের জন্য বেশি নেতিবাচক হয়ে থাকে, যা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া দরকার। সবশেষে চতুর্থ দৃষ্টিভঙ্গিটা সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরও বেশি সমালোচনার চোখে দেখে (যেমন Mecarthy, 1984)। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নারীদের জন্য নেওয়া বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো মূলত শোষণমূলক, এবং এটা বলা হয় যে নারীও পুরুষের মধ্যে একটা,

বৈপরীত্য বৈশিষ্ট্য দাড় করানোর মাধ্যমে 'টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচ এর পৃথক কিন্তু সমান' এই দর্শন গ্রামীন অঞ্চলে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির ভিত্তিতে দুর্বল করে দেয়। এ যুক্তিও দেওয়া হয় যে, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার উপর লিঙ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করার মাধ্যমে হয়তো এদের আসল প্রকৃতিকেই আড়ালে রাখা হয়, কারন সমস্যাগুলো মূলত লিঙ্গ-সম্পর্কিত নাও হতে পারে (নাহার, ২০০২:৭৯)।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালে নারী উন্নয়ন সম্পর্কে বেশ কিছু সাধারন জরিপ চালানো হয়েছিল। যেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী নারীদের জীবন সম্পর্কে যে অজ্ঞতা রয়েছে বলে ভাবা হতো তা দুর করা (White, 1990:101) কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল বা অর্থনৈতিক শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পরিবর্তে এসব কাজ ছিল মূলত সাধারণ বক্তব্য নির্ভর, ফলে বাংলাদেশের নারী সম্পর্কিত জ্ঞান, White যেমনটা উল্লেখ করেছেন, নারীদের জীবন যে অজানা রয়ে গেছে এই ধারনাটিও বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। এই ধারণাটা এখনও বহাল আছে। উদাহরনস্বরূপ, The Fifty percent women in Development and policy in Bangladesh (Khan, 1988) শীর্ষক এক গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুছ লিখেছেন, যখন আমাদের সমাজের বাকি অর্ধেক অংশ (অর্থাৎ নারী) সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রসঙ্গ আসে বিষয়টা চাঁদের অন্য অংশ সম্পর্কে জানার মত। আমরা জানি যে এটির অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এ সম্পর্কে আরও বেশি কিছু জানার আগ্রহ আমাদের কখনো হয়নি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের দরিদ্র গ্রামীন নারীদের নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশই ছিল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, প্রজনন ক্ষমতা; মর্যাদা, পর্দা, প্রভৃতি বিষয়ের উপর (White, 1992:101-102)। যে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বিষয়ের উপর মনোযোগ নেওয়া হয়েছে তা বেশ স্পষ্ট। যেমন, প্রজনন ক্ষমতা গবেষণার একটা প্রধান বিষয় রয়ে যাওয়ার কারনে হচ্ছে রাষ্ট্র তথা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন এখানও একটা বড় ধরনর চিন্তার বিষয়। আর এক্ষেত্রে দরিদ্র গ্রামীন নারীদেরও শরীরেই এ সমস্যার চূড়ান্ত উৎস নিহিত রয়েছে বলে ভাবা হয়।

আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে বেশ কিছু নতুন বিষয়ের উপর কাজ হয়েছে,যেমন যৌতুক, পতিতাবৃত্তি, নারী নির্যাতন, লৌকিক ধর্ম প্রভৃতি। আর এই সময়ে উন্নয়নের বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের

উপর আরও বেশি এবং তীক্ষ্ম দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। তথাপি নারীর সক্রিয়তা তাদের সৃজনশীলতা, সংগ্রামের ক্ষমতা, আশা আকাঙ্খার উপর দৃষ্টি দিয়েছে, এমন কাজ এখন পযন্ত সংখ্যায় খুব অল্পই রয়ে গেছে। এর পরিবর্তে আমরা আমাকে এখনও Birds in a cage (Adnan, 1989) জাতীয় শিরোনামের দেখাপাই, যেগুলোয় বাংলাদেশের দরিদ্র গ্রামীন নারীদের নিক্রিয় ভূমিকাতেই তুলে ধরা হয় (নাহার, ২০০০:৮০-৮১)।

প্রচলিত পথা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশের নারীরা সমাজের মূলস্রোতধারা থেকে পিছিয়ে আছে। কিন্তু নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সমতার ভিত্তিতে সম্পৃক্ত করতে না পারলে প্রত্যাশিত অগ্রগতি সম্ভব নয়। নারী উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে যখন নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন, স্বনির্ভর, সামাজিক সকল প্রকার শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদালাভে সক্ষম করে তুলতে হবে। নারী উন্নয়ন বলতে বুঝায় নারী উন্নয়ন হলো এমন একটি পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে নারীদের জন্য জীবনের অবশ্যকীয় প্রয়োজনগুলো যেমন খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পরিবেশ ও ব্যবস্থা থাকে এবং দেশের নীতি নির্ধারিনে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মহিলাদের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে অবদান রাখার সুযোগ থাকে। নারী উন্নয়ন তখনই পুরোপুরি সম্ভব যখন এদেশের নারীরা আর্থিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হবে, নারী-পুরুষ উভয়েই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে, মেয়েদের ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে এবং এদেশের মানুষের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে।

২.১১ নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা

বিংশ শতাব্দীর ৬০ এর শেষ ও ৭০ এর দশকের প্রারম্ভে একদল উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তৃতীয় বিশ্বে যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছিল তাতে নারীরা অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনি এবং যতক্ষণ না নরীরা এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করবেন, ততক্ষণ উক্ত বিশ্বের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে না। এ ধারনাকে Women in Development (WID) নামে সম্বোধন করা হয় যা উন্নয়ন চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধারা সৃষ্টি করে। এর প্রভাবে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ঘোষণা করে এবং ১৯৭৬-৮৫ সময়কে আন্তর্জাতিক নারী দশক ঘোষনা করে। তাছাড়া ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ সব ধরনের নারী বৈষম্য দূরীকরনের সনদ Convention on Elimination of all forms of discrimination Against Women (CEDAW)

অনুমোদন করে। জাতিসংঘের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় চারটি বিশ্ব নারী সম্মেলন মেক্সিকো (১৯৭৫) কোপেনহেগোন (১৯৮০), নাইরোবী (১৯৮৫) এবং বেইজিং (১৯৯৫)। নারী দশক, নারী বর্ষ ও বিশ্ব নারী সম্মেলন বিশ্বব্যাপী নারীদের সচেতনতা এবং অধিকার আদায়ে ভূমিকা পালন করে আসছে (চৌধুরী,২০০২:২৬১)। নারী উন্নয়নে জাতিসংঘের উদ্যোগ এবং বাংলাদেশের নারীদের উপর এর প্রভাব নিয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

২.১২ বিশ্ব নারী সম্মেলন জাতিসংঘের ভূমিকা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নারী মুক্তি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে আন্দোলনে পরিচালিত হয়েছে। এই আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বিশ্বের নারীরা জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছেন। ১৯৪৫ সালে নারী পুরুষের মধ্যে সমতার নীতিমালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য প্রথম আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ সনদ গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রসারের উদ্দেশ্যে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে এক ঘোষনাপত্র গ্রহন করে বলা হয়েছিল যে, নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সকল সংস্থায় নারীর ভোটদান ও নির্বাচনের অধিকার এবং সরকারি যে কোনো দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকবে। ১৯৬২ সালে জাতিসংঘ সাধারন পরিষদ বিবাহে সম্মতি, বিবাহে ন্যূনতম বয়সসীমা এবং বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কিত কনভেশন অনুমোদন করে।

১৯৬৭ সালে ৭ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারন অধিবেশনে গৃহীত হয় নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিলোপ সাধন বিষয়ক ঘোষনা পত্রটি। উক্ত ঘোষণাপত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যকে ন্যায়সঙ্গতভাবে 'মানবিক মর্যাদার বিরুদ্ধে মহাঅপরাধ', বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নারীদের অবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের ২৫মত অধিবেশনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরনের বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হয় এবং আলোচ্য দলিলটির খসড়া প্রণয়ন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া স্থিরকৃত হয়। উক্ত কমিশনের অধিবেশনে গৃহীত দলিলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধির দ্বারা মাতৃত্ব রক্ষা, সমান কাজে সমান মজুরি, নারীর শ্রমরক্ষা, শিশুরনিরাপত্তা ও রক্ষনাবেক্ষনে জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব ইতাদি সম্পর্কে আইন প্রনয়নের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত নারীবর্ষকে (১৯৭৫) সামনে রেখে দেশে দেশে নারী সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি প্রদর্শিত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নারীর স্বার্থে নতুন নতুন আইন তৈরির তৎপরতা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। দীর্ঘ তিন শতকের উপলব্ধিকে সামনে রেখে জাতিসংঘের নানাবিধ পদক্ষেপের পরেও ফললাভের কেন্দ্রে আশানুরূপ সাফল্য লাভে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীবর্ষ ঘোষণার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল জাতিসংঘ (চৌধুরী, ২০০২:২৬২)।

মেক্সিকো সম্মেল (১৯৭৫)

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে 'সমতা উন্নয়ন ও শান্তি' এই শ্লোগান ঘোষিত হয়। এই সম্মেলনে নারী উন্নয়নের লক্ষে একটি বিশ্ব কর্মপরিকল্পনা (The world plan Action) গৃহীত হয়। মেক্সিকো ঘোষনার প্রারম্ভে স্বীকার করা হয় যে, বিশ্বব্যাপী নারীরা নির্যাতিত। এটি নির্যাতনকে অসমতা এবং অনুন্নয়নের সমস্যার সাথে সম্পর্কিত করে এবং নারীদেরকে যে কোন ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানায়। মেক্সিকো সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়েকটি প্রধান সিদ্ধান্ত হলো- ক) আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের (১৯৭৫) উদ্দেশ্য বাস্ত-বায়নের জন্য বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা (World plan of Action) অনুমোদন করা।

খ) ১৯৭৬-৮৫ সময়কে জাতিসংঘের নারী দশক ঘোষনা করা।

গ) নারী দশকের জন্য সেবামূলক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ) নারীবিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা ও গবেষণা করার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা যার নাম দেয়া হয় United Nations International Research and Training institute for the Advancement of women (IN STRAW).

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ

১৯৭৯ সালে ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারন পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরনে সনদ বা CEDAW (সিডও)। বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ, নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন এবং সাধারন পরিষদের মধ্যে পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার সফল পরিনতি ছিল এই সনদ। সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক নাগরিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই সাথে জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রনয়ন করে বৈষম্যমূলক আচরন অবসানের জন্য সনদে আহবান

জানানো হয়েছে। এছাড়া কনভেনশনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা স্থাপন দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রচলিত যেসব সামাজিকও সাংস্কৃতিক ধারা বৈষম্যকে স্থায়ী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, সেগুলো পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে এই সুপারিশমালায় রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সমান অধিকার শিক্ষার সমান সুবিধা ও পাঠ্যক্রম অনুসরনে সমান সুযোগ , নিয়োগ ও বেতন প্রদানে ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা এবং বিবাহ ও মাতৃত্বের ক্ষেত্রে চাকুরির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। সনদে পারিবারিক জীবনে নারীর পাশাপাশি পুরুষের সমান দায়িত্বের কথা ও উল্লেখ করা হয়েছে। সিডওসনদে রয়েছে মোট ৩০ টি ধারা। ১ থেকে ১৬ ধারা নারী পুরুষের সমতা সংক্রান্ত ১৭ থেকে ২২ ধারা সিডওর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক এবং ২৩ থেকে ৩০ ধারা সিডওর প্রশাসন সংক্রান্ত। সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে “নারীর প্রতি বৈষম্য অধিকারের সমতা ও মানব মর্যাদার প্রতি সম্মানের নীতির লংঘন ঘটায়, নিজ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষের মত সমান শর্তে নারীর অংশ গ্রহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।” সমাজ ও পরিবারের সমৃদ্ধির বিকাশ ব্যাহত করে এবং নিজ দেশ ও মানবতার সেবায় নারীর সম্ভাবনার পূর্ন বিকাশ আরও কঠিন করে তোলে (চৌধুরী, ২০০২:২৬৩)।

কোপেনহেগেন সম্মেলন (১৯৮০)

এই সম্মেলনে ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন গৃহীত বিশ্ব কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। সম্মেলনে নারীর দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি শীর্ষক কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। কোপেনহেগেনে সম্মেলনের উপবিষয় (Sub theme) ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান। কোপেনহেগেন সম্মেলনের মূল প্রস্তাবসমূহ ছিল নিম্নরূপ

ক) জাতিসংঘের নারী দশকের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পে নারীর স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।

গ) উন্নয়নে নারীদের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য যথার্থ প্রশাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ঘ) নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দাতা ও গ্রহীতা দেশগুলো যেন সতর্ক দৃস্টি রাখে তা নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ) জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ইনপুট দিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের সমতা আনতে হবে।

চ) তথ্য, শিক্ষা এবং আত্মনিয়ন্ত্রনের প্রয়োজনীয় উপায় যোগানের মাধ্যমে পারিবারিক আয়তন নির্ধারন করার অধিকার দিতে হবে।

ছ) নারীদর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্যের দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে (চৌধুরী,২০০২:২৬৪)।

নাইরোবি সম্মেলন (১৯৮৫)

জাতিসংঘে নারীদশকের (১৯৭৬-৮৫) শেষ প্রান্তে তৃতীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাইরোবীতে। এর উদ্দেশ্য ছিল নারী দশকের বিষয়বস্তু সমতা উন্নয়ন ও শান্তি, কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করা। এই সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ নারী উন্নয়নের জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ গৃহীত হয়। এতে লিঙ্গীয় সমতা, নারীর ক্ষমতা মজুরিবিহীন কাজের স্বীকৃতি, মজুরিযুক্ত কাজের অগ্রগতি নারীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা উন্নত শিক্ষার সুযোগ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়। উক্ত ঘোষনার বিভিন্ন অংশ রয়েছে, যেমনঃ নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলের পটভূমি, সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি, বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা। বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ১৪টি অবহেলিত গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছিল যেমন, ১. খরায় আক্রান্ত, ২. শহরের দরিদ্র নারী, ৩. বৃদ্ধ নারী ৪. যুবতী নারী, ৫. অপমানিত নারী, ৬. দুঃস্থ নারী, ৭. পাচার এবং অনিচ্ছাকৃত পতিতাবৃত্তির শিকার নারী, ৮. জীবিকা অর্জনের সনাতন উপায় থেকে বঞ্চিত নারী, ৯. পরিবারের একক উপার্জনশীল নারী, ১০. শারীরিক এবং মানসিকভাবে অক্ষম নারী, ১১. বিনা বিচারে আটক নারী, ১২. শরনার্থী এবং স্থানচ্যুত নারী ও শিশু, ১৩. অভিবাসী নারী, ১৪. সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী নারী।

নারীর অগ্রগতির পথে বাধাসমূহ দূর করার সুস্পষ্ট পদক্ষেপের কথা নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশল বর্ণিত আছে যার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৮৬-২০০০ সাল পর্যন্ত। এই দলিলটি তৈরি করা হয়েছে সমতা নীতির ভিত্তিতে যা সমর্থিত হয়েছে জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন

মানবাধিকারে ঘোষনা, মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য আন্তজাতিক দলিল এবং নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদে (চৌধুরী, ২০০২:২৬৫)।

নারী এবং পরিবেশের উপর জাতিসংঘ সম্মেলন রিওডিজেনেয়ো (১৯৯২)

এ সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হচ্ছে পরিবেশে ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং তারা হচ্ছে সবচাইতে দরিদ্র। সুতরাং ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত পরিবেশ বিপর্যয়ের সময় তারাই সবচাইতে দুর্ভোগের শিকার হন। এই কারনেই নারীর জীবন খাদ্য, জ্বালানী, পানি, আশ্রয়সহ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তারা শুধু ভোক্তা হিসাবেই প্রকৃতির সাথে জড়িত নন, পরিবেশগত সম্পদের উৎপাদক এবং ব্যবস্থাপক হিসাবেও সম্পর্কিত। সুতরাং উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা অথবা যে কোনো বিষয়ের জন্য কৌশল নির্ধারিনের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন, পরিবেশ এবং নারী বিষয়টি পারস্পারিক সম্পর্কিত। এ সম্মেলনে রাষ্ট্রসমূহের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশল সমূহে বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল।

জাকার্তা ঘোষনা (১৯৯৪) এবং কর্মপরিকল্পনা

১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নারীর অগ্রগতির জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি নেয়া। এই সম্মেলনের মাধ্যমে নারীর অগ্রগতির উপর বিশ্বব্যাপী এবং আঞ্চলিক পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা গেছে ১৯৮৫ সাল থেকে নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হবার পর অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যা নারীর উপর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় প্রভাব ফেলেছে। এই সম্মেলনে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই কর্মপরিকল্পনা ১৪টি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়কে চিহ্নিত করে যেমন: নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সুযোগ এবং অংশ গ্রহনে নারীর অসমতা, পরিবেশ এবং জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায়

নারীর ভূমিকা এবং গুরুত্বের স্বীকৃতির অভাব, ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগের অভাব, নারীর মানবিক অধিকার খর্ব, স্বাস্থ্য সেবায় সুযোগের অভাব এবং অসমতা, গনমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক চিত্র, নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদ্ধতির অভাব, শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর ভূমিকার স্বীকৃতির অভাব ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন (ICPD) ১৯৯৪

১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন। কায়রো সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে স্থিতিশীল রাখা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যক্ষুধা, রোগ ও অপুষ্টির জন্য দায়ী। সম্মেলনের রিপোর্ট ব্যাখ্যা করে যে পরিবারে আয়তন সীমাবদ্ধ রাখতে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা সবসময় কমসংখ্যক শিশু চায় কারন তারাই এতে সরাসরি ভুক্তভোগী। সম্মেলনে সবাই একমত হন যে, সবচাইতে প্রয়োজন হচেছ দায়িত্বশীল যৌন আচরনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ঠিক রাখা এবং গর্ভধারন অনিরাপদ গর্ভপাত এবং যৌনবাহিত রোগ থেকে কমবয়সীদের রক্ষা করা।

তবে যৌনতা এবং প্রজনন, স্বাস্থ্য বিষয়, বয়োঃসন্ধিকালে যৌন শিক্ষা ও সেবা এবং গর্ভপাত সম্মেলনের সবচাইতে বিতর্কিত বিষয় ছিল। বেশ কিছু মুসলিম দেশ ও ক্যাথলিক পন্থীগন সম্মেলনের খসড়া কর্মপরিকল্পনার কিছু সুপারিশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। জাতিসংঘের এবং ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে। অবশেষে কিছু আপত্তি সত্ত্বেও সম্মেলনে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনায় নারীদেরকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে রাখা হয়।

সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন (১৯৯৫)

সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত সম্মেলন ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১১৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগন অংশগ্রহন করেন এবং এর উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্যদূরীকরণ, পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জন এবং নিরাপদ ও যথার্থ সমাজ নির্মান। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতির মাঝে অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল নারী পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়ন। এই সম্মেলনেও একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বেইজিং সম্মেলন (১৯৯৫)

১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের আয়োজনে সর্ববৃহৎ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৮৯টি দেশ অংশগ্রহন করে। বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের সামগ্রিক রূপরেখা হিসেবে একটি কর্মপরিকল্পনা (Platfrom for action) গৃহীত হয়। এই কর্মপরিকল্পনা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, নাইরোবী কর্ম কৌশল, জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলোকে সমর্থন করে। বিগত বছরগুলোতে জাতিসংঘ আয়োজিত শিশু, পরিবেশ, মানবাধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে বিশ্ব সম্মেল এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে বেইজিং কর্মপরিকল্পনা। আরো গুরুত্ব দিয়েছে বিশ্ব আদিবাসী আন্তর্জাতিক বর্ষ, আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ, সহনশীলতার জণ্য জাতিসংঘ বর্ষ, গ্রামীন নারীর জন্য জেনেভা ঘোষনা এবং নারী নির্যাতন বন্ধ সংক্রান্ত ঘোষনার প্রতি। বেইজিং ঘোষনায় বলা হয়েছে, ২০০০ সালের মধ্যে নাইরোবী অগ্রমুখী কর্মকৌশলের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করার বিষয়টি। বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন এক অন্যতম এজেন্ডা। নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে নাইরোবী অগ্রমুখী কর্মকৌশল দ্রুত বাস্তবায়িত করাই এর লক্ষ্য। বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনা স্পষ্ট করে দেখিয়েছে যে নারীর অধিকার সমতা ও উন্নয়নে বাধা আছে বহু রকমের। ৩৬২ প্যারাগ্রাফসমৃদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা বা প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' ১২টি বিষয়কে নারী প্রগতি ও উন্নয়ন সমতার বাধা হিসেবে বিবেচনা করে তা থেকে উত্তরনের কৌশল ও সরকারি-বেসরকারি স্তরে সংশ্লিষ্ট সকলের করনীয় নির্দিষ্ট করেছে । বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্চে: ১. নারী ও দারিদ্র, ২. নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ৩. নারী ও স্বাস্থ্য ৪. নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, ৫. নারী ও সশস্ত্র সংঘাত, ৬. নারী ও অর্থনীতি, ৭. ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারী, ৮. নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, ৯. নারীর মানবাধিকার, ১০. নারী ও তথ্যমাধ্যম, ১১. নারী ও পরিবেশ, এবং ১২. মেয়ে শিশু (চৌধুরী, ২০০২:২৬৭)।

২০০০ সালে জেন্ডার সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি শীর্ষক 'বেইজিং +৫' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যাতে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশণ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়। ২০০৫ সালে জাতিসংঘের সদর দপতরে নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন (সিএসডব্লিউ) এর ৪৯ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বেইজিং+১০ শীর্ষক

পর্যালোচনা বৈঠক। ১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বেইজিং ঘোষনা ও বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ নির্ধারিনের লক্ষ্যে আলোচনায় বসেন জাতিসংঘের ১৬৫ টি সদস্য রাষ্ট্রের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিরা। ১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীর জন্য ১২টি উদ্বেগের বিষয় চিহ্নিত করে গৃহীত হয় বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন। দশ বছর পর এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বেইজিং+১০ শীর্ষক সম্মেলনে বলা হয় এখনও দেশে দেশে নারী নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। গত এক দশকে দেশে দেশে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহন করলেও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ও দেখা দিচ্ছে। এর মধ্যে নারী পাচার ও এইচআইভি এইডস অন্যতম। এছাড়া নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.১৩ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারীর অবস্থান"

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (২) ধারায় বলা আছে, রাষ্ট্র ও গনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। বাংলাদেশ নারী বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহন করেছে। সকল আন্ত র্জাতিক ঘোষনা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের তাত্ত্বিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) বাংলাদেশ ২.১৩ (ক) ১৬.১গ চ) ধারা সংরক্ষনসহ ১৯৮৪ সালে স্বাক্ষরকরে। বলা হয় ঐ ধারাগুলো মুসলিম আইনের পরিপন্থী। পরে ১৯৯৭ সালে ১৩ ক এবং ১৬ ১(চ) ধারায় আপত্তি প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশ সরকার সিডও সনদের ১৩(ক) ধারাটি হচ্ছে-"জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, একই অধিকার, বিশেষ করে পারিবারিক কল্যাণের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামজিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আর ১৬(১)(চ) ধারায় রয়েছে, "অভিভাবকত্ব প্রতিপালন করা, ট্রাষ্টিশীপ ও পোষ্য সন্তান গ্রহন, অথবা অনুরুপ ক্ষেত্রে, যেখানে জাতীয় আইনে এসব ধারনা বিরাজমান, একই অধিকার ও দায়িত্ব সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূন।" জানা যায় সিডও সনদের ২ এবং ১৬(১)(গ) ধারার উপর অবশিষ্ট আপত্তি বাংলাদেশে প্রত্যাহার করে নি। কারন এ ধারা দুটিতে সম্মাতি দেয়ার সঙ্গে বিদ্যমান কিছু আইন সংশোধন, পরিতবর্তন ও বাতিলের প্রশ্ন জড়িত। তবে প্রচলিত যে আইন

আছে তার সুষ্ঠ প্রয়োগের মাধ্যমে নারী নির্যাতন অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভবহতো। কিন্তু সামাজিক পশ্চাৎপদতা এবং আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগের অভাবে বাংলাদেশের নারী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত (চৌধুরী, ২০০২:২৭৩)।

জন্মের পর থেকে নারী বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। কন্যা সন্তান বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতাকে দেখাশোনা করতে পারে না বলে মেয়ে শিশুকে গুরুত্বহীন মনে করা হয়। মেয়ের যৌতুক প্রথার জন্য কন্যা শিশুকে বোঝা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিয়ের সময় দর কষাকষির পর যৌতুক দিতে স্বীকৃত না হলে বিয়ে সংগঠিত হয় না। আর স্বীকৃত হবার পর দিতে ব্যর্থ হলে মেয়ের উপর নানা অত্যাচার শুরু হয়। বাংলাদেশের প্রতিবছর যৌতুক সম্পর্কিত সহিংসতায় অনেক নারী মৃত্যুবরণ করছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশের মোট ৪৬৫ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে যৌতুকের শিকার হয়েছে ২২জন নারী। যৌতুকের কারনে হত্যা করা হয়েছে ১৬ জনকে। ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ) আইনটি জাতীয় সংসদে নারী সমাজের ঐক্যবদ্ধ সুপারিশ ও সংশোধনী গ্রহনপূর্বক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ প্রনয়ন করা হয়। এ আইনে নারী ও শিশু যৌতুক নির্যাতনের কতিপয় ঘৃন্য অপরাধের পাশাপাশি যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন রোধকল্পে শাস্তির বিধান করা হয়। যৌতুক প্রথা বাল্য বিবাহের অন্যতম প্রধান কারন। অল্পবয়স্ক মেয়ে হলে যৌতুকের পরিমান কম হয়। তাই দরিদ্র বাবা-মা অধিক পরিমান যৌতুকের ভয়ে কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়। যদিও বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স (২০) বাড়ছে তবুও প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে ১৮ বছর বয়সের আগে। অথচ আইনগতভাবে বিয়ের জন্য মেয়েদের ন্যূনতম বয়স ১৮ হতে হবে। ১৮ বছরের নীচে কোনো মেয়েকে বিয়ে দেয়া হলে তা বাল্যবিবাহ বলে গণ্যহবে এব বাল্যবিবাহ পরিচালনা ও সম্পাদন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বেইজিং ঘোষণায় বলা হয়েছে, শিক্ষা একটি মানবিক অধিকার এবং সমতা, উন্নয়ন ও প্রগতির লক্ষ্য অর্জনে এক অপরিহার্য হাতিয়ার। অধিকাংশ নারীকে যদি পরিবর্তনের বাহক হতে হয় তাহলে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সকল পর্যায়ে লিঙ্গীয় অসমতা রয়েছে। বাংলাদেশের নারী স্বাক্ষরতার হার হচ্ছে মাত্র ৩৮.১% যা পুরুষের ৫৫.৬% এর তুলনায় অনেক কম। প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৬.৫৮% এবং

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৩.৩৮% ছাত্রী পড়াশোনা করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী ৩০ বছরে নারী শিক্ষার অগ্রগতি মাত্র ২৭.৬ শতাংশ। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর অংশগ্রহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে নারী। এ পিছিয়ে থাকার পিছনে সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামি, নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর শিক্ষা ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। অধিকারভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতির অভাবে মেয়ে শিশুকে মূল্যধারা শিক্ষায় কম দেখা যায়। ইউনিসেফের তথ্য অনুসারে, প্রাথমিক স্কুলে পড়ার উপযোগী ১২ লাখ শিশু স্কুলে যায় না। এর মধ্যে ৫৩ শতাংশ মেয়ে শিশু। সুবিধাবঞ্চিত পরিবারে এক তৃতীয়াংশে শিশুর ৮৫ শতাংশ মায়েরা কখনও স্কুলে যায়নি। ইদানিং অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং দাতাসংস্থার ছাত্রী উপবৃত্তিসহ নারী শিক্ষা প্রসারে বেশ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ নেয়ার ফলে আগের চেয়ে স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার বেড়েছে। কিন্তু স্কুলের পাঠ শেষ করার আগেই ঝরে পড়েছে অনেকে। স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রোফাইল অন এডুকেশ ইন বাংলাদেশ (ব্যানবেইস) এর পরিসংখ্যান অনুসারে ষষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ১৭.২ শতাংশ। আর ৯ম ও ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ৫৪.৮ শতাংশ।

নারীদের স্বাস্থ্যের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশে প্রবিছর প্রায় ২০,০০০ হাজার নারী প্রসবকালীন জটিলতার মারা যায়। ইউসিফের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবছর প্রায় ৬,০০,০০০ জটিল ডেলিভারী কেসের মধ্যে ৯০% পরিচালিত হয় অপ্রশিক্ষিত ধাত্রীর হাতে। প্রতিবছর প্রায় 8 মিলিয়ন নারী সন্তান জন্ম দেন। এদের মাঝে ৬০% রক্তশূন্যতা এবং অপুষ্টিতে ভোগেন। ৫ বছরের নীচে ছেলে শিশু তুলনায় মেয়ে শিশুর ক্যালরি গ্রহনের হার শতকরা ১৬ ভাগ কম। ৫-১৪ বছরের বয়সের ছেলেদের তুলনায় মেয়ে ১১ ভাগ কম এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী শতকরা ২৯ ভাগ কম। পুরুষের আয়ুস্কাল হচ্ছে ৫৯.১ বছর। অন্যদিকে নারীদের ৫৮.৬ বছর। শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬৭। ১-৪ বছরের মধ্যে প্রতি হাজারে ছেলে শিশুর মৃত্যুর হার ১১.৪, অন্যদিকে মেয়ে শিশুর মৃত্যুর হার ১১.৮।

১৯৯৫-৯৬ এ শ্রমশক্তির জরিপে দেখা যায়, শ্রমজীবী নারীর শতকরা ৭৮.৮ ভাগ কৃষিকাজ ও মাছ ধায়, শতকরা ৪০ জন বিনা পারিশ্রমিকে

পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিত, শতকরা ১৮ জন দিনমজুর, শতকরা ২৫.৩ ভাগ কর্মী এবং ২২.৩ ভাগ স্বকর্মে নিয়োজিত। চাকুরি ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীরা বেশির ভাগ নিয়োজিত শিক্ষা, চিকিৎসা ও নার্সিং পেশায়। ২.০০০ পোশাক প্রস্তুতকারী কারখানায় ৩ লাখেরও বেশি নারী শ্রমিক কাজ করেছেন, যার শতকরা হার মোট শ্রমিকের ৯০ ভাগ। প্রতিমাপাল মজুমদার তার গবেষণায় লক্ষ্য করেছেন, কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকরা নানাভাবে শোষনের শিকার হন, যা শ্রমবাজারে প্রবেশের পূর্বে তাদের কাছে ছিল প্রায় অপরিচিত। যে আর্থিক নিরাপত্তার আশায় তার মজুরি কর্ম গ্রহন করেছিলেন সেই আর্থিক নিরাপত্তাই তারা বহুক্ষেত্রে পান না। দেখা গছে তারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন পান না, বেতন যদিও যা পান তা ঠিক সময়ে পান না। নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দেখা যায় মজুরিতে, পদোন্নতি প্রাপ্তিতে বেতনসহ ছুটি, বোনাস ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে। এমনকি শ্রম ঘন্টাতেও। তাই মজুরি শ্রমের বদৌলতে মহিলার তাদের ভোগমান পূর্বের তূনায় কিছুটা উন্নত করতে পারলেও জীবন যাপনের অন্যান্য মানদন্ডের বিচারে তাদের জীবনে উন্নতি না হয়ে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছেন অন্য আর এক ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে (চৌধুরী, ২০০২:২৭৫-২৭৬)।

বাংলাদেশে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সচিবালয়ে মাত্র ২ জন নারী সচিব রয়েছেন, যেখানে পুরুষ সচিবের সংখ্যা ৪৮ জন। জাতীয় সংসদে মহিলাদের ৩০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। সংরক্ষিত ৩০টি আসনে মহিলারা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী দলের সদস্যদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকায় রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি নির্বাচনে মহিলাদের মনোনয়ন দানে অনীহা প্রকাশ করে। প্রথম জাতীয় সংসদ (১৯৭৩) থেকে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১) পর্যন্ত গত ৩০ বছরে মহিলাদের অংশগ্রন মাত্র ৪.৫%বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী সংগঠনগুলো দীর্ঘদিনের দাবী জাতীয় সংসদে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচন, এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। আশির দশকের শেষ দিকে বিভিন্ন নারী সংগঠন গবেষক, এনজিও এবং সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি জানানো হতে থাকে। অনেক প্রচেষ্টার পর ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনয়ন পরিষদ) এ্যাক্টে ইউনিয়ন পরিষদকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয় এবং প্রতি ৩ ওয়ার্ড থেকে ১জন করে ৩জন মহিলা সদস্য সংশ্লিষ্ট ৩টি

ওয়ার্ডে নারী পুরুষদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) এ্যাক্টের বাস্তবায়নের মাধ্যমে একই বছরের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ২০ জন মহিলা চেয়ারম্যান পদে, ১১০ জন সাধারণ সদস্য পদে এবং ১২,৮২৮ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। ২০০৩ সালের নির্বাচনে ১২ হাজার মহিলা সদস্য প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন। শিক্ষা ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, রাজনীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীদের অংশগ্রহন আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও পাশাপাশি আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা হচ্ছে নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এনজিও যারা নারী অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার সেখানেও এনজিও কর্তাব্যক্তিরা নারীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কলেজের ছাত্রী, এমনকি নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরাও যৌন হয়রানি ও ধর্ষনের শিকার হচ্ছেন।

বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়িত করছে অনুন্নত জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কিত করে। বিশ্বব্যাংকের মতে, অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষাও অজ্ঞতা, উচ্চ শিশু মৃত্যু ও ব্যাপক অপুষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তহীনতা যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তারাই দরিদ্র। এই হিসাবে বাংলাদেশের এক ব্যাপক জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের কবলে নিমজ্জিত। আর এ জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই হচ্ছেন এ দেশের পিছিয়ে পড়া নারী সমাজ যার সব সূচকের সবক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বহুগুনে পিছিয়ে আছেন। দারিদ্র্যের কারনে নারীরা যৌন শোষনেরও শিকার হচ্ছেন। তাছাড়া পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হবার অন্যতম প্রধান কারন দারিদ্র্য। বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী একজন নারী তার বাবার সম্পত্তির যে অংশ যেয়ে থাকেন তা তার ভাইয়ের প্রাপ্ত অংশের অর্ধেক। বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী তার উত্তরাধিকার আইনে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তাছাড়া দেনমোহরের অর্থ থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়। নারীর উপার্জিত অর্থের উপরও অনেক ক্ষেত্রে তার কোনো নিয়ন্ত্রন থাকে না। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, নিজের উপার্জনের উপর শতকরা মাত্র ৩৫ ভাগ মহিলা পোশাক শ্রমিকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রন রয়েছে। আর শতকরা ৪৩ জন উল্লেখ করেছেন তারা তাদের উপার্জিত অর্থ অন্যের সঙ্গে যৌথ সিদ্ধান্তে খরচ করেন। শতকরা প্রায় ২২ জন উল্লেখ করেছেন যে নিজস্ব উপার্জনের উপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রন নেই। এক সকল উপাদান

Dhaka University Institutional Repository

নারীর অধস্তনতা উত্তরনের বা দারিদ্র্য বিমোচনে নেতিবাচক ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে।

নারী সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি রয়েছে, জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ রয়েছে, তবুও সামাজিক পশ্চাৎপদতা এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাবে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ নারী নির্যাতন বন্ধ করা যাচ্ছে না। তাই নারীর অধস্তন অবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্তি এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে প্রকৃত রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

২.১৪ নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে বাংলাদেশের সরকারের উদ্যোগ

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভাবের পর থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন। এভাবে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারীর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কতিপয় ব্যবস্থা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহে গ্রহন করা হয়েছে। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যান মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু টার্গেট গ্রুপ হিসেবে নারীর উন্নয়নের জন্য সেক্টরাল প্রোগ্রামে আলাদাভাবে কোনো কর্মসূচি গ্রহণ বা অর্থ প্রদান করা হয়নি। দুর্ভাগ্য যে গৃহীত সাতটি কর্মসূচির মধ্যে মাত্র দুটি বাস্তবায়ন করা হয় এবং এ দুটি কর্মসূচিতে ২.৯৮ মিলিয়ন টাকার ১% এর ও কম টাকা ব্যবহৃত হয়েছিল। এই সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠন এবং মহিলা বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টি যা ১৯৭৬ সালে গঠিত হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত নারী দশকের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনায় কৃষি, পুষ্টি, শিক্ষা, গ্রামীণ ঋণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী সংশ্লিষ্ট যে সকল কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছিল তা আপামর পশ্চাৎপদ নারীর প্রকৃত উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট ছিল না এবং কর্মসূচিগুলো ও ছিল সমষ্টিগত অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। ১০% এর কম মহিলা এই পরিকল্পনার আওতায় সুবিধা লাভ করে। সকল নারীর উন্নয়ন সাধনের কোনো নির্দিষ্ট পন্থা বা পদ্ধতি না থাকায় নারীর সামাজিকও অর্থনৈতিক অবস্থান অপরিবর্তিত রয়ে যায়। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী

পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) প্রথম নারীকে সমগ্র উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয় এবং গ্রামীণ নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। তাছাড়া শিক্ষা সেক্টরে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থাও থাকে। এই পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয় মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়, অন্যান্য মন্ত্রনালয় ও এনজিও এর উপর। কিন্তু প্রতিশ্রুত অর্থের মাত্র .০২% কর্মসূচি মহিলা মন্ত্রনালয়ের অধীনে ছিল, ফলে সরকারের অভিপ্রায় নিয়ে প্রশ্ন উঠে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় দাতাগোষ্ঠীর মাধ্যমে সরকার যে অর্থ পেয়েছিল তার মাত্র ১৯% অর্থ (৪.৪ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে) এবং ১৩% অর্থ (৮৫০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে) বিভিন্ন দেশীয় এনজিওর (গ্রামীন ব্যাংক) মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহন করা হয়।

চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫) তৈরির পূর্বে ১৯৮৯-৯০ সালের এইড গ্রুপের কাছে প্রদত্ত মেমোরানডামে বাংলাদেশের সরকার অঙ্গীকার করেছিল যে নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সামাজিক কল্যাণমূলক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত না করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে অর্থাৎ বিভিন্ন সেক্টরে (কৃষি, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, কলকারখানা ও ব্যবসা, সিভিল সার্ভিস ও সামাজিক) আলাদাভাবে নারীকে চিহ্নিত করা হবে। কিন্তু সে অঙ্গীকার উপেক্ষা করে শুধু অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, দারিদ্র্যদূরীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করা হয় এবং সরকার উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় যে বিভিন্ন সেক্টরে মহিলা অনুপস্থিতি উন্নয়ন ধারাকে ব্যাহত করে।

পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৯৭-২০০২) প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সমষ্টিগত অর্থনৈতিক কাঠামোয় নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা ও উন্নয়ন পদক্ষেপের মাধ্যমে সকল সেক্টরে নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস করা। উপরন্তু বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন (PFA) বাস্তবায়ন ও জাতিসংঘ গৃহীত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই সকল প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের নারী উন্নয়নে (WID) ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। মহিলাও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের যথেষ্ট ক্ষমতা ও অর্থ না থাকায় এই মন্ত্রনালয় শুধু সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। ফলে নারী উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হচ্ছে (আহমেদ, ২০০২:২০১-২০২)।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য পর্যালোচনা

৩.১ বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটারের একটি ছোট দেশ। দারিদ্র্যতা বাংলাদেশের একটি বিশেষ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। এ সমস্যা নিজে যেমন একটি সমস্যা অন্যদিকে অনেক সমস্যার উৎপত্তির কারণ ও ঘটে। যেমন- পুষ্টিহীনতা, শিক্ষার নিম্ন হার, বস্তি এলাকার বৃদ্ধি, ভিক্ষা বৃত্তি, পতিতা বৃত্তি ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলো ব্যাক্তি জীবনকে যেমন পঙ্গু করে দেয় অনুরূপ জাতীয় জীবনের উন্নতিতেও বাধার সৃস্টি করে। দারিদ্র্য হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি তার দলের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারে না। ফলে ব্যক্তি সুষ্টভাবে কাজ করার জন্য মানসিক ও দৈহিক কর্মদক্ষতা অর্জন করতে পারে না। অর্থাৎ যাদের জীবন যাত্রার মান সমাজ নির্ধারিত মানের চেয়ে নীচে তাদেরকে দারিদ্র্য বলে। দারিদ্র্যতা এমন একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে বুঝায় যেখানে তাদের জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ। সামাজিকভাবে পরনির্ভরশীল ও মর্যাদার দিক থেকে নিম্ন মর্যাদার অধিকারীকে দারিদ্র্যবলে। দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক ও জটিল বিষয়। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকার জন্য এর নানা উৎস ও বহুমুখী প্রকাশভঙ্গিই দায়ী। কেননা দারিদ্র্য কখনো আয় বঞ্চনা কিংবা ভোগ ঘাটতিকে বোঝায়। আবার কখনোও তা অপুষ্টি, অশিক্ষা কিংবা সম্পদহীনতাকে নির্দেশ করে। আবার ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা এবং দুঃস্থতা ও ব্যক্তিকে দারিদ্র্য করে তুলে। উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণের মতে অর্থ-সম্পদের অভাব না থাকলেও শিক্ষাহীন কিংবা স্বাস্থ্যবিহীন ব্যক্তিও দরিদ্র্য। নিরাপত্তাহীনতাও যে কোন স্বচ্ছল ও সফল মানুষকে মুহূর্তে পরিণত করে দুর্বল দরিদ্রজনে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিশ্বখ্যাত। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের জন্য এই দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুরি, ম্যালথাসের দেশ, পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রামীন বস্তি উন্নয়নের টেষ্টকেস, ইত্যাদি নামে। বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষের মধ্যে সাড়ে ৬ কোটি মানুষ দরিদ্র। ১৯৭৩ সালে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মধ্যে ৫ কোটি ৩২ লাখ মানুষ ছিল

Dhaka University Institutional Repository

দরিদ্র। ২০০৫ সালে ১৩ কোটি ৩৫ লাখ মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৩৪ লাখ। আর জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল ইউএনএফপিএ এর হিসাবে এই দারিদ্র্যেদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ কোটি ৮৬ লাখ। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্যঅষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ২০০৫ সালে দেশের মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪ কোটি ৬০ লাখ। এ হিসাব দেশে মোট দারিদ্র্য এবং অতি দরিদ্র্যের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬ কোটি ৮৬ লাখ এবং ৪ কোটি ৫৩ লাখ।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ক্রমাম্বয়ে এক জটিল রূপ ধারণ করছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে জনসংখ্যার শতকরা হারে দারিদ্র্যের সংখ্যা কমলেও, দারিদ্র্য নিরসনের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হতে অনেক কম হওয়ায় দেশের মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেনি। উপরন্তু সম্পদ বৈষম্য, আয় বৈষম্য ও সুযোগ বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সকল নীতি পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনকে পয়লা নম্বর এজেন্ডা বিবেচনার বিগত প্রায় সব সরকারই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং সে লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, তবুও বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১ এ প্রকাশিত পরিসংখ্যানগুলো দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি বুঝা যায়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) প্রকাশিত Household Expenditure Survey, 1995/96 অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহণ পরিমাণে ১৯৯৫/৯৬ র্অবছরে পল্লী দরিদ্র জনগোষ্টীর ৪৭.১ শতাংশ দরিদ্র্যসীমার নিচে এবং দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালরি গহন পরিমাপে ২৪.৬ শতাংশ ছিল চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে। ১৯৮৩/৮৪ অর্থবছরে গ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল ৬১.৯ শতাংশ এবং ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে তা নেমে আসে ৪৭.১ শাতাংশে। ১৯৮৩/৮৪ এবং ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে গ্রাম অঞ্চলে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল যথাক্রমে ৩৬.৭ শতাংশ এবং ২৮.৩ শতাংশ। অপর দিকে ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে শহর অঞ্চলে ৪৯.৭ শতাংশ দরিদ্র এবং ২৭.৩ শতাংশ চরম দরিদ্র ছিল। যেখানে ১৯৮৩/৮৪ এবং ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে শহর অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৭.৭ শতাংশ এবং ৪৬.৭ শতাংশ। দারিদ্র্যহার ধীরে ধীরে কমলেও সংখ্যার দিক থেকে দরিদ্র মানুষের উপস্থিতি এখনও ব্যাপক।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ একই জরিপ (HES 1995/96) এ দারিদ্র্য পরিমাপে ক্যালরি গ্রহন প্রক্রিয়া ছাড়াও প্রথম বারের মত মৌলিক চাহিদার খরচ (CBN) প্রক্রিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া অনুযায়ী ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে ৩৫.৬ শতাংশ জনগোষ্ঠী চরম দরিদ্র এবং ৫৩.১ শাতংশ দরিদ্র রয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর একটি প্রতিবেদনের নির্দেশ করে অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখানো হয় যে, পল্লী অঞ্চলে ৫০ শতাংশের বেশি জনগণ দরিদ্র (৫১.৭%, ১৯৯৪ সন) এর মধ্যে চরম দরিদ্র প্রায় ২২.৫ শতাংশ। প্রতিবেদনে অবশ্য পল্লী অঞ্চলে এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আর্থিক, শিক্ষা, বাসস্থান, পোশাক পরিচ্ছেদ ইত্যাদির উন্নয়ন। ১৯৯৫ সালে শহুরে দারিদ্র্যের উপর পরিচালিত ভিন্ন এক জরিপে ৬০.৮৬ শতাংশ পরিবার দরিদ্র এবং ৪০.২ শতাংশ পরিবার চরম দরিদ্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশ পরিবার নিরাপদ খাবার পানি এবং ৪১ শতাংশ স্যানিটারী ল্যাট্রিনের সুযোগ পাচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। পল্লী অঞ্চলে প্রাকৃতিক ব্যাধিও অন্যান্য কারণ জণিত দুর্যোগ মোকাবেলায় আয়ের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়, যা পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আয়ের ২২ শতাংশ (চরম দরিদ্রের ক্ষেত্রে ২৭%) ব্যয়িত হয় (রহমান ও রহমান, ১৪০৮:৫)।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর দরিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ প্রকল্পের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য গত চার বছরে ৪৭.৭ শতাংশ। ১৯৯৯ সাল শহর অঞ্চলে ৪৩.৩ শতাংশ জনসংখ্যা দারিদ্র্য সীমার নিচে ছিল এবং গ্রাম অঞ্চলে একই সময়ে এ দারিদ্রের হার ছিল ৪৪.৯ শতাংশ। তাছাড়া এ সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ে শহর ও গ্রাম অঞ্চলে দারিদ্র্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। চরম দারিদ্র্যের পরিমাপে বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায় যে, আশির দশকের তুলনায় নব্বই দশকে দারিদ্র্য পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি হয়েছে। দারিদ্র্য বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত বিষেষজ্ঞদের ধারণা দারিদ্র্যরেখার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা হ্রাসে চল্লিশ শতাংশের কাছাকাছি চলে এসেছে।

অন্য একটি গবেষণায় (Ravallion and Sen, 1996, Sen,1998) দেখা যায় ১৯৯১/৯২ অর্থবছরের তুলনায় ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছর এসে মাথা গণণা

Dhaka University Institutional Repository

অনুপাতে গ্রামীন দারিদ্র্য ৫৩ শতাংশ থেকে সামান্য কমে দাঁড়িয়েছে ৫১ শতাংশে। ঐ একই সময়ে শহুরে দারদ্র্য পরস্থিতি ২৬ শতাংশ এবং ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে ছিল ৩৪ শতাংশ। কিন্তু ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য তুলনামূলক ভাবে বেড়েছে। শহরের ক্ষেত্রে ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে Gini সূচক চিল ৩০ তেকে ৩২ যা ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৩৭-এ। আবার ঐ একই সময়ে গ্রামীন Gini সূচক ২৫-২৬ থেকে বেড়ে দাড়িয়েছে ২৯-এ (পূবোর্ক্ত:৬)।

সম্প্রতি ইউএনডিপি- বিআইডিএস প্রকাশিত Bangladesh Human Development Report 2000- এ গ্রাম ও শহরভেদে অনপেক্ষ দারিদ্র্যের অর্থাৎ চরম দারিদ্র্যর মধ্যে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর একটা হিসেব দেখানো হয়েছে। সেখানে দেখা যায় ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে শহরাঞ্চলে এর হার ছিল ৯.৬ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে তা ছিল প্রায় আড়াই গুণ বেশি অর্থাৎ ২৩.৮ শতাংশ।

World Development Report 2000-01 এ ১৯৯৫/৯৬ এর হিসেব অনুযায়ী জাতীয় পযায়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার দেখানো হয়েছে ৩৫.৬ শতাংশ। শহর ও গ্রামের ক্ষেত্রে তা যতাক্রমে ১৪.৩ ও ৩৯.৮ শতাংশ। যদিও দিনে ১ ডলারের কম মাথাপছু আয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখার নিচে বাংলাদেশে ২৯.৮ শতাংশ মানুষ বাস করে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। তাছাড়া বিশ্বব্যাংক এর আর একটি হিসেবে মৌল চাহিদা সামগ্রীর খরচ বিচেনায় (CBN) ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার চিল ৫৩.০৮ শতাংশ (রহমান ও রহমান,১৪০৮:৭)। নিম্নে কয়েকটি প্রধান মাত্রার ভিত্তিতে বর্তমান বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উপর আলোকপত করা হলো।

দারিদ্র্য বিমুখ প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের বিপরীতমুখী ধারা প্রমাণ কর যে, ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখে না। প্রবৃদ্ধি কাঠামোর অসম বন্টন ব্যবস্থার কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের নিকট আনুপতিক হারে পৌছায় না। উপরন্ত ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির অভাব ও দারিদ্র্য নিরসন হার উভয়ের গতিকেই শ্লথ করে দিয়েছে। উন্নয়নের বর্তমান ধারায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধির অভাব ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের নিকট দারিদ্র্য নিরসনের ভবিষ্যৎ জিম্মি হয়ে আছে।

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির চলমান কাঠামো ধীর ধীরে জাতীয় উৎপাদন কাঠামোকে শিল্প ও কৃষি তথা উৎপাদনশীল খাত-নির্ভর করার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের সেবা খাতকে অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান ১৯৭৯-৮০ অর্থবছরে যেখানে ছিল ৩২.৩ শতাংশ, গত ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে তা ক্রমে দাড়িয়েছে মাত্র ২১.২ শতাংশে। এ সময়ে জিডিপি-তে প্রকৃত অর্থনৈতিক খাতগুলোর মোট অবদান ৪৩.৭ শতাংশ তেকে ৩৮-১ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে (Finance Division, 2005).

বাংলাদেশে বর্তমানে নগরকে কেন্দ্র করে যে আধুনিক সেবা খাত গড়ে উঠেছে (যেমন ব্যাংক, বীমা, রেস্তোরা, হাসপাতাল ইত্যাদি) তা সাধারণত শ্রম-নিবিড় নয় এবং এখানে সাধারণত শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হয়, যা স্বাভাবিকভাবেই স্বল্প শিক্ষিত দরিদ্রের অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে। শহরাঞ্চলে যদিও বেশ কিছু রপ্তানিমুখী শিল্প গড়ে উঠেছে, তথাপি তা পল্লীর ক্রমবর্ধমান ব্যবধান ও বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থনের জন্য যথেষ্ট নয়। তদুপরি কৃষিও অকৃষি খাতের মজুরির ক্রমবর্ধমান ব্যবধান ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রবৃদ্ধির সুফল থেকে বঞ্চিত করছে। সাধারণত যে কোনো ক্রান্তিকালীন অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা হ্রাস পাবার সাথে সাথে শিল্পের ভূমিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে কৃষির অবদান হ্রাস পাবার সাথে সাথে সেবা খাতের অবদানই শুধু বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কর্মসংস্থান- জিডিপির স্থিতিস্থাপকতা খুবই কম, মাত্র ০.৩৪ এর অর্থ হলো, প্রতি এক শতাংশ প্রবৃদ্ধি গড়ে: মাত্র ০.৩৪ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, যা দারিদ্র্য নিরসন ত্বরান্বিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালনে সীমিত অবদান রাখছে (ভট্টাচার্য ও আহমেদ, ২০০৬:২০)।

মাথাপিছু আয়

২০০৫ সালে দেশের মাথাপিছু জিডিপি-র পরিমাণ ৪৪৫ ডলার (Finance Division, 2005) । কিন্তু একটি জাতীয় ভিত্তিক গড় হিসাব কখনোই জনগণের আয় দারিদ্র্যের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না। সবশেষ জাতীয় দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অনুযায়ী বিগত পাঁচ বছর (১৯৯৯-২০০৪) নগর ও গ্রাম উভয় স্থানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবার প্রতি আয় ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় উল্লিখিত সময়ে নগরে (৩.৬ শতাংশ ও গ্রামে (-)৭.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে (BBS, 2004) ।

Dhaka University Institutional Repository

চরম দারিদ্র্য

সর্বশেষ জাতীয় দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৪ খাদ্যশক্তি গ্রহণের মাত্রানুসারে দেশের মোট জনসংখ্যার ৪২.১ শতাংশ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ১৯৯৯ সালের প্রতিবেদনে এই হার ছিল ৪৪.৭ শতাংশ। অর্থাৎ উক্ত সময়কালে বছরে গড়ে প্রায় অর্ধশতাংশ হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। তবেএ সময়ে নগরাঞ্চলের দারিদ্র নিরসনের হার গড়ে এক শতাংশ হলেও, গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য নিরসনের এই হার ছিল গড়ে মাত্র ০.৩ শতাংশ (BBS, 2004)।

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে চরম দরিদ্রের হার ৮০ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ৪০ শতাংশে নামলেও, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশের প্রকৃত দরিদ্র মানুষের সংখ্যা একে বারেই কমেনি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে প্রায় ১.৩ শতাংশ (Finance Division, 2005), যা বর্তমান দারিদ্র্য নিরসন হার হতে অনেক বেশি (ভট্টাচার্য ও আহমেদ, ২০০৬:২১)।

তুলনামূলক দারিদ্র্যও আয় বৈষম্য

আশির দশকের তুলনায় নব্বইয়ের দশকে অর্থনীতি যখন দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আয় বৈষম্যের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। একদিকে যেমন গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার আশির দশকের ৩.৫ শতাংশ থেকে নব্বইয়ের দশকে এসে ৫ শতাংশের ওপর উন্নীত হয় (CPD,2006), একই সময়কালে অন্যদিকে আয় বৈষম্যের মারাত্মক অবণতি ঘটে যার ফলে গিনি সূচক ০.৩৪৮ থেকে ০.৪১৭ তে পৌছায়। সাম্প্রতিক তথ্যানুসারে, আয় বৈষম্যের আরো অবনতি হয়ে ২০০৪ সালর গিনি সূচক ০.৪৫ এ পরিণত হয়েছে (BBS, 2004)।

১৯৯৯ সালে সমাজের সবচেয়ে গরিব দশ শতাংশ জনগোষ্ঠীর মোট সম্পদের পরিমাণ মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ১.৭ শতাংশ ছিল, যা হ্রাস পেয়ে ২০০৮ সালে মাত্র ১.৫ শতাংশে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে মোট জাতীয় আয়ে সমাজের সবচেয়ে ধনী দশ শতাংশ জনগোষ্ঠীর অংশ ১৯৯৯ সালর ৩৩.৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সালে ৩৬.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (BBS, 2008)। অন্যভাবে বলা যায় সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র দশ শতাংশ জনগোষ্ঠীর সাথে সমাজের সবচেয়ে ধনী

জনগোষ্ঠীর আয়ের পার্থক্য ১৯৯৯ সাল ছিল ২০ গুণ, যা ২০০৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.৫ গুণ হয়েছে।

আঞ্চলিক দরিদ্র্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দারিদ্র্যতার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ও বৈষম্য বিরাজমান। অধিক জনসংখ্যা আর সীমিত ভূমির এই দেশে আঞ্চলিক দারিদ্র্যের পার্থক্য ও বৈষম্যের যে ব্যাপকতা রয়েছে, তা দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়। জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের যা গড় হার, তার সাথে কিছু অঞ্চলের দারিদ্র্য হারের বিরাট ব্যবধান রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, দারিদ্র্যের সবচেয়ে প্রকট উপস্থিতি রয়েছে রাজশাহী বিভাগে এবং এর পরই রয়েছে খুলনার অবস্থান। রাজশাহীর মোট জনসংখ্যার ৪৬.৭ শতাংশই দারিদ্র্যের নিম্ন সীমা (Lower poverty line) এর নিচে এবং প্রায় ৬১ শতাংশ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের উচ্চ সীমা (Upper Proverty Line) এর নিচে বাস করে। অথচ জাতীয় পর্যায়ে এই হার যথাক্রমে ৩৩.৭ শতাংশ ও ৪৯.৮ শতাংশ (ভট্টাচার্য এবং আহমেদ, ২০০৬:২১-২২)।

সারণি নং ৩.১: দারিদ্র্যের আঞ্চলিক পার্থক্য (২০০০) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু মাসিক আয় দরিদ্র সীমার নিচের জনসংখ্যা (%)

দরিদ্র সীমা	নিম্ন সীমা	উচ্চ সীমা	নিম্ন সীমা	উচ্চ সীমা
জাতীয়	৩৩.৭০	৪৯.৮০	৪৯৫.১৯	৫৭৩.৭২
বরিশাল	২৮.৮০	৩৯.৮০	৫৪৫.৩২	৫৮৩.০৭
চট্টগ্রাম	২৫.০০	৪৭.৭০	৫২২.৫৬	৬১৯.৩৯
ঢাকা	৩২.০০	৪৪.৮০	৪৭৫.৭৩	৫৪৯.৯৫
খুলনা	৩৫.৪০	৫১.৪০	৫৪৩.৪৬	৬৪১.০৭
রাজশাহী	৪৬.৭০	৬১.০০	৪৬৮.৮৯	৫২৬.৪৪

সূত্রঃ BBS, 2000

২০০০ সালের হিসাব অনুযায়ী রাজশাহী বিভাগের দারিদ্র্যের নিম্নসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মাসিক আয় মাত্র ৪৬৯ টাকা, যেখানে দেশের মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গড় মাথাপিছু আয় ৪৯৫ টাকার কিছু বেশি (BBS, 2000)। শুধু তাই নয়, Poverty gap যা দারিদ্র্যসীমার সাথের গড়

দূরত্ব পরিমাপ করে এবং Sqared poverty gap যা দারিদ্র্যের গভীরতাকে পরিমাপ করে। উভয়ই রাজশাহী বিভাগে সবচেয়ে বেশি এবং ঢাকা বিভাগের প্রায় দ্বিগুণ (BBS, 2004)। উত্তরাঞ্চলে প্রতিবছর মঙ্গা নামে যে সাময়িক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তার সাথেও এই আঞ্চলিক বৈষম্যের সংযোগ রয়েছে বলে ধারনা করা যায় (ভট্টাচার্য ও আহমেদ, ২০০৬:২২)।

সামগ্রিক বিচারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটলেও, এখনও বিরাট সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। দারিদ্র্যের সংখ্যা যত দ্রুত কমা উচিত ছিল, সেই ভাবে দারিদ্র্যতা কমেনি। দেশের প্রায় সাড়ে ৬ কোটি মানুষ আজ বেচে থাকর জন্য প্রতিনিয়ত, দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে চলছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এদের সংখ্যাও বাড়ছে। এই বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার প্রায় ৪ কোটি হতদরিদ্র যাদের চালচুলা কিছুই নেই। সীমিত অধিকার নিয়ে অন্যের দয়ার উপর ওপর এরা কোনক্রমে বেচে আছে। এদের দরিদ্র বিমোচনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে নানা ধরণের উদ্যোগ। বিশ্বব্যাংকে আইএমএফ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশ এদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সাহায্য দিচ্ছে বছরের পর বছর। গত ৩৫ বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা দারিদ্র্য নিরসনে ব্যয় হয়েছে। এই বিপুল পরিমান টাকা খরচ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যাপক কর্মসূচি সত্ত্বেও দেশে দারিদ্র্য কমেছে ১ শতাংশ হারে। দেশের সরকার ও বিপুল সংখ্যক এনজিওর সকল কর্মকান্ড এখন আবর্তিত হচ্ছে এই দরিদ্রদের ঘিরে। অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৩১ শতাংশই কোন কাজ পাচ্ছে না। গত তিন দশকেও শতাংশ হিসাবে দেশের দারিদ্র্য হ্রাস পেলেও সংখ্যা হিসাবে দারিদ্র্য পরিস্থিতির ব্যাপকতা উদ্বেজনক। আর দাতাদের চাপিয়ে নেয়া প্রবৃদ্ধিভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলে দেশে বাড়ছে ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য।

৩.২ বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের দারিদ্র্য শুধুমাত্র আয় ও পুষ্টির ঘাটতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং নানাবিধ আর্থ-সামজিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে অনেক বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন সম্পত্তি ও জমির অসম বন্টন, জমির ব্যবহারে অসমতা ফসল উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তি ও সেচের উপর নিয়ন্ত্রন ও ব্যবহারে অসম সুযোগ,

অপর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, স্বল্প উৎপাদনশীলতা ও মজুরি, নিম্ন প্রবৃদ্ধির হার ও প্রবৃদ্ধির ফলাফলের অসম বন্টন, সামাজিক সুবিধাসমূহে অসম প্রবেশাধিকার, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং খামার বহির্ভূত কর্মকান্ডের পরিব্যাপ্তির অপ্রতুল প্রসার ও অসম বণ্টন। এছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়মিত ভাবে নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হয় যা তাদের কল্যাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে পর্যদুস্ত করে এবং অর্জিত আয় স্তর ধরে রাখার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে। এজন্য দারিদ্র্যের বিভিন্ন সূচককে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং পরিবারের কর্মপদ্ধতির আলোকে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার কৌশল অনেকাংশে আনুষ্ঠানিক খাতে অংশগ্রহণ অপেক্ষা সার্বজনীন সম্পদের উৎস প্রাপ্তি ও প্রবেশাধিকার, সামাজিক নির্ভরতা ও ক্ষমতার সম্পর্ক প্রভৃতির পারস্পারিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে পারিবারিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে যে কয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে ভূমিহীনতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও শ্রমশক্তির বন্টন, বেকারত্ব ও মজুরির হার, শ্রমশক্তির প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি।

৩.২.১ ভূমিহীনতা

বাংলাদেশে কৃষিখাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং কৃষিকাজে ভূমির মৌলিক চাহিদার কারণে ভূমিহীনতা দারিদ্র্যের প্রবণতা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ভূমিহীনতা সম্পর্কিত তথ্য সীমিত (Hossain 1986, Abdullah ও Murshid, 1986)। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচেছ। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী দেশে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৩০.৭ লক্ষ থেকে ৪৩.৪ লক্ষে বৃদ্ধি পায় যার বাৎসরিক বৃদ্ধিরহার শতকরা ৩.৯ ভাগ। গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের সাথে সমন্বয় সাধন করলে এই হার দাড়ায় ৩.৭ শতাংশ যা একই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২.৫ শতাংশ) থেকে অনেক বেশী। সাম্প্রতিককালে ভূমিহীনদের (অর্থাৎ যাদের জমির পরিমাণ ০.৫ একরের কম) সংখ্যা প্রতি বছর শতকরা ৩.১ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অনুমান করা হয় (মুজেরী, ১৯৯৭:৮২)।

বেশ কিছু সমীক্ষা থেকে ভূমিহীনতার সাথে গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোর মেরুকরণ প্রক্রিয়ার সম্পর্ক দেখা যায় (Rahman, 1987)। বেশীর ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিহীন পরিবার জীবিকা অর্জনের জন্য কম আয় সম্পন্ন কর্মে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। ভূমিহীনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণের মধ্যে ক্রমাগত উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অন্যতম বলে ধরা হয়। দারিদ্র্য বিশ্লেষণে ভূমিহীনতার সাথে কৃষি প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক বিশেষভাবে আলোচিত। বাংলাদেশে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির মুল উৎস উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সারও কীটনাশক এবং যান্ত্রিক সেচ পদ্ধতির ব্যবহার। এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে যদিও সকল কৃষকই লাভবান হয় তবে বেশ কিছু তথ্য থেকে দেখা যায় যে বড় কৃষকদের লাভের পরিমাণ বেশী। এই লাভ আয় আর জমির মূল্যবৃদ্ধি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভূমিহীনতা বৃদ্ধির ফলে অপরিহার্যভাবে যে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে তা বলা যায় না। বাকি ভূমি বিক্রয় বিনিয়োগ সমন্বয় সাধন প্রকৃতির হয় এবং ক্ষুদ্র কৃষক যদি খামার বহির্ভূত খাতে লাভজনক কর্মসংস্থানের কারণে এধরনের সমন্বয় সাধন করে তবে তাদের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। এজন্য ভূমিহীনতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যের সম্পর্ক বিবেচনার ক্ষেত্রে অকৃষি খাতে কর্মসংস্থানের পরিধি বৃদ্ধি, প্রকৃত মজুরির হার এবং অন্যান্য পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ভূমিই অন্যতম প্রধান আয় সৃষ্টিকারী সম্পদ হবার কারণে ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে দারিদ্র্যের প্রকোপ সবচাইতে বেশি।

৩.২.২ শ্রমশক্তির খাতওয়ারি বণ্টন, বেকারত্ব এবং মজুরির হার

সাম্প্রতিক সময়ে খামার বহির্ভূত খাতে প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত হয়েছে এবং শ্রমশক্তির ক্রমবর্ধনশীল অংশ মজুরিও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে এসব কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে। অবশ্য এদের বেশির ভাগই স্বল্প আয় সম্পন্ন কর্মচারি বা দিনমজুর হিসেবে কর্মরত যা থেকে আয় অনেক সময় কৃষি মজুরির চেয়ে কম (Khan, Islam ও Haq, 1981)। এজন্য খামার বহির্ভূত কর্মসংস্থান যদি পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস হয়, তবে নিম্ন আয়ের কারণে তার দারিদ্র্য পরিস্থিতি তেমন কোন পরিবর্তন হয় না (মুজরী, ১৯৯৭:৮২-৮৩)।

৩.২.৩ বেকারত্ব এবং মজুরির হার

বাংলাদেশে বেকারত্বের সঠিক তথ্যের জন্য যে বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে ভূমিহীনতা ও শ্রমশক্তির বৃদ্ধি, শষ্য খাতে শ্রম নিবিড়তা এবং প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধি (Rahman ও et.al. 1988)। শ্রমশক্তির তথ্য দেখা যায় ১৯৬১ ও ১৯৮৩/৮৪ সাল মধ্যে প্রতি বছর

বেকারত্বের হার শতকরা ২.২ ভাগ বেড়েছে। ১৯৮১ এবং ১৯৮৯ সালের মধ্যে শ্রমশক্তিকে মহিলাদের অংশগ্রহণ শতকরা ৫.১ ভাগ থেকে ১০.৬ ভাগে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণে মহিলাদের কর্মশক্তিতে অংশগ্রহণের সংজ্ঞার আংশিক পরিবর্তন এবং গৃহস্থালী কর্মকান্ডের বাইরে মহিলাদের অধিক গৃহস্থলী কর্মকান্ডের বাইরে মহিলাদের অধিক অংশগ্রহণ। অর্থনীতির ধীর প্রবৃদ্ধি এবং শ্রমশক্তির দ্রুত বৃদ্ধি বাংলাদেশে বেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বৃদ্ধি করেছে। এইহার শতকরা ৩১ থেকে ৪০ ভাগের মত হতে পারে (Islam, 1986)। কৃষিতে কর্মসংস্থান না বাড়লেও কৃষি বহির্ভূত খাতে কর্মসংস্থান ধীরগতিতে বাড়ছে। কৃষি এবং কৃষি বহির্ভূত খাতে শ্রম নিয়োগের অনুপাত ১৯৭৪ সালে ৭৯ঃ২১ থেকে ১৯৮৩/৮৪ সালে ৫৯ ঃ ৪১ এ পরিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য কৃষি বহির্ভূত খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির অনেকাংশে আংশিক বেকারত্বের পরিমানকে প্রচ্ছন্ন রাখে এবং স্বল্প আয় সম্পন্ন হওয়ায় দারিদ্র্য দূরীকরনে খুব একটা ভূমিকা রাখে না।

৩.২.৪ গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ঠ্য

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক চলকের ভিত্তিতে গ্রামীন দরিদ্র ও অদরিদ্র শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা যায়। সাধরণত দরিদ্র শ্রেণীর পারিবারিক সদস্য সংখ্যা বেশি (বিশেষ করে দশ বছরের কম বয়সী সদস্য সংখ্যা)। দরিদ্র পরিবারের উপার্জন ক্ষমতা সীমিত কিন্তু পারিবারিক দায়িত্ব বেশী। এছাড়া পেশাগতভাবে অধিকাংশ দরিদ্র পরিবার কৃষি শ্রমিক (মুজেরী, ১৯৯৭:৮৪-৮৫)।

দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত পরিবারের খাদ্য দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ বেশী। এক সমীক্ষায় থেকে দেখা যায় দরিদ্ররা গড়ে জনপ্রতি খাদ্য বহির্ভূত দ্রব্যের জন্য ব্যয় করে যথাক্রম ৮৬.৭ শতাংশ এবং অপর দিকে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারের ব্যায়ের একই অনুপাত ৭৩.৩ শতাংশ ও ২৬.৭ শতাংশ। এছাড়া দরিদ্র পরিবারসমূহ নিয়মিতভাবে যে নানা সঙ্কটের সম্মুখীন হয় যেমন: প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিরাপত্তাহীনতা, উপার্জনকারী সদস্যের আকস্মিক মৃত্যু ইত্যাদি। এসব মোকাবেলা করার স্বল্প ক্ষমতা তাদের নিঃস্বকরণ প্রাক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে তোলে।

৩.২.৫ শহরাঞ্চলের দরিদ্র শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য

শহরাঞ্চলের বেশীর ভাগ দরিদ্র পরিবার বস্তিতে বসবাস করে। বস্তিতে বসবাস করলেও বস্তিবাসী পরিবারসমূহ সমজাতীয় নয়। এক্ষেত্রেও দরিদ্রদের দুই শ্রেণীতে শ্রেণীকরণ সম্ভব- অতি দরিদ্র এবং দরিদ্র।

সাধারনভাবে দেখা যায় অদরিদ্র্যের তুলনায় অতি দরিদ্র্য এবং দরিদ্র্য পরিবারে শ্রমশক্তিতে পুরুষের অংশগ্রহণের হার কম। মহিলা প্রধান পরিবারের সংখ্যা দরিদ্রদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশী যা দারিদ্র্যের লিঙ্গভিত্তিক মাত্রার উপস্থিতি নির্দেশ করে। এছাড়া দরিদ্র শ্রেণীর শহরাঞ্চলে অবস্থানের মেয়াদ এবং আয়ের উর্ধ্বমুখী চলনের মধ্যে একটা সম্পর্ক দেখা যায়। সময়ের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রকৃতি, আয়ের তর এবংজীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন সাধিত হয় (Sen ও Islam, 1993)। তবে ত্রেক্ষেত্রে অতি দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে লাভবান হওয়ার আনুপাতিক হার বেশ কম। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরণের পরিবার তাদের গ্রামীন উৎপত্তি স্থলের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে। এ থেকে বোঝা যায় গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন প্রক্রিয়া কোন এককালীন বিষয় নয় বরং তা একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া। এছাড়া এই প্রক্রিয়ায় আত্নীয়তা এবং সামাজিক পরিচিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় (Hossain ও Afsar, 1992)।

গ্রামাঞ্চল থেকে অভিবাসন শহরাঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। এজন্য শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য অনেকাংশে গ্রামীন উন্নয়ন প্রচেষ্টার ব্যর্থতার প্রতিফলন (Hossain ও Afsar, 1992)। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা যায় বাংলাদেশে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনে 'আকর্ষণ' ও 'বিকর্ষণ উভয় প্রক্রিয়ার উপাদানই বিদ্যমান ((Hossain ও Afsar, 1992, Sen ও Islam, 1993)। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীনদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে অকৃষি ও অনানুষ্ঠানিক খাতের উপর নির্ভরশীলদের সংখ্যা অতিদ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যারা শহরে ধাবিত হচ্ছে (মুজেরী, ১৯৯৭:৮৮)।

৩.২.৬ দারিদ্র্যের লিঙ্গভিত্তিক মাত্রা

বাংলাদেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে আয় ও সম্পদের মলিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে দরিদ্র ও অদরিদ্র পরিবারের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সাধারণভাবে

Dhaka University Institutional Repository

অতিদরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ শ্রেনীসমূহের মহিলা প্রধান পরিবারের আনুপাতিক হার বেশী (BIDS, 1992)। এই ধরণের পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস শ্রমবিক্রয় এবং একথা সর্বজনবিদিত যে মহিলা শ্রমিকের মজুরি তুলনামূলকভাবে কম। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা, খাদ্য ও পুষ্টি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে মহিলাবা লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার। পারিবারিক আয় অর্জন, ব্যয় সাশ্রয় ও সামগ্রিক কর্মকান্ডে মহিলা সদস্যদের ভূমিকা পুরুষদের তুলনায় কোন অংশে কম নয়,তবুও স্বীকৃত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং সম্পদের মালিকানায় সীমিত অধিকারের কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহন ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত (মুজেরী, ১৯৯৭:৯০)।

পুরুষ ও মহিলাদের পেশাগত বৈশিষ্ট্য ও দারিদ্র্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে মহিলা ও পুরুষ শ্রমশক্তির ব্যাপক অংশ কৃষির সাথে জড়িত। এছাড়া গ্রামীন ও শহরাঞ্চলের নারী শ্রমিকের বেশীর ভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতে বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত। এই খাতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও অন্যান্য পেশাগত সুযোগ সুবিধার অনুপস্থিতি যাতে আনুপাতিক ভাগে মহিলারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানে মহিলাদের সীমিত অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব একটি প্রধান বাধা।

দরিদ্র মহিলাদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাচ্ছলতা অর্জনে উপার্জনক্ষম সম্পদে সীমিত অধিকার একটি প্রধান সমস্যা। জামানতের অভাব ও অন্যান্য কারণে প্রাতিষ্ঠানিক ঋন সুবিধায় তাদের অংশগ্রহণ নিতান্তই অল্প। এক্ষেত্রে বিগত দশকগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি (এন.জিও) প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। অনানুষ্ঠানিক দল গঠন, প্রশিক্ষণ ও জামানতবিহীন ঋন প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র প্রকল্প ও আত্মকর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের অর্থনৈতিক অগ্রসরতা আনয়নে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে (মুজেরী, ১৯৯৭:৯১)।

সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্যের নিম্নমুখী প্রবণতা কিছুটা দৃশ্যমান কিন্তু অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের মোট সংখ্যা অনেক বেশী। গত কয়েক দশকের ব্যবধানে সার্বিক বিবেচনায় বাংলদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলেছে প্রতীয়মান হচ্ছে। গ্রামীন জীবনে পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

অতীতের মতো জীবনসংহারি মন্বন্তরের কথা একালে আর শোনা যায় না। এতসত্ত্বেও দেশে এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, দারিদ্র্যের চরম সীমার নিচে যাদের বাস। বাংলাদেশে এখনো ২০ শতাংশ মানুষ খুবই গরিব। এদের কারো কারো পক্ষে একবেলা খাবার জোটানোও কঠিন। এখনো বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ১৯ শতাংশ পরিবার প্রতিদিন খাবারের সংস্থান হয় না। ১০ শতাংশ পরিবার দুবেলা আহার জোগাড় করতে পারে না। চরম দরিদ্র জগোষ্ঠির মধ্যে অন্তত শতকরা ১৭ ভাগ পরিবার আছে, যারা দারিদ্র্য চক্রের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। বৃত্তভেদ করে বের হওয়ার কৌশল তাদের জানা নেই।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত দারিদ্র্যই সবচেয়ে বড় সমস্যা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর ১০.৭৮ শতাংশ হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। এ থেকে আরো জানা যায়, ২০০০ সালে আমাদের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫২.৩ শতাংশ। ২০০৫ সালে তা কমে দাড়ায় ৪৩.৮। অন্যদিকে নগরাঞ্চলে ২০০৫ সালের হিসাব অনুসারে দারিদ্র্যের হার ২৮.৪ শতাংশ। পাঁচ বছর আগে এর হার ছিল ৩৫.২ শতাংশ। সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা ৯ কোটি ৩৮ লাখ। আনুপাতিক হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেলেও এখন বিরাট সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যের কষাখাতে জর্জরিত। দারিদ্র্যের সংখ্যা যত দ্রুত কমাউচিত ছিল, তত দ্রুত তা কমেনি। প্রবৃদ্ধির হার মোটামুটি ভাল হওয়ার সত্ত্বেও দারিদ্র্যের হার দ্রুত কমেনি। তাই বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনের জন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ ও নানামুখী কর্মসূচি।

429830

৩.৩ বাংলাদেশে গৃহীত দারিদ্র্যবিমোচনে কর্ম-কৌশলসমূহ

বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছিল বিশ্বের একটি হতদরিত্র দেশ হিসেবে। দারিদ্র্যতার জন্য এদেশের টিকে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দিহান ছিল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। এ দেশের দারিদ্র্যকে নিয়ে একটি বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেছিল দাতাগোষ্ঠীর মুরব্বিরা। তখনকার অর্থাৎ সত্তরের দশকের শুরুর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আফ্রিকার আপারভোল্টা নমক দেশটিই শুধু বাংলাদেশের চেয়ে অধিক দরিদ্র ছিল। দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে দারিদ্র্যতার ভাবে জর্জরিত হয়ে বাংলাদেশ টিকে আছে। এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আজও নির্মম দারিদ্র্যতা নিয়ে বেচে আছে। দারিদ্রতার জন্যই আমাদের যত সমস্যা ও বিড়ম্বনা। দারিদ্র্যের সমস্যার সঙ্গে অন্য

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

কোন সমস্যার তুলনা হয় না। কেননা দারিদ্র্য এমনি অসহনীয় যে দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ আর মানুষ হিসেবে বাঁচতে পারে না। তার তার সব সুপ্ত সম্ভাবনাই ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে। সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে সবকিছুই হারিয়ে যায়। বাংলাদেশে এখনো ২০ শতাংশ মানুষ খুবই গরিব্ এদের কারো কারো পক্ষে একবেলা খাবার জোটানো কঠিন। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ১৯ শতাংশ পরিবারে প্রতিদিন খাবারের সংস্থান হয় না। ১০ শতাংশ পরিবার দুবেলা আহারই জোগাড় করতে পারে না। চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তত শতকরা ১৭ ভাগ পরিবার আছে, যারা দারিদ্র্য চক্রের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার পথে এখন পর্যন্ত দারিদ্র্যই প্রধান অন্ত রায় হিসেবে বিবেচিত। দারিদ্র্যতা গরিব মানুষকে দিশাহারা করে ফেলে। এদেশের মানুষের যুগযুগের স্বপ্ন- দারিদ্র্যমুক্তি, স্বপ্ন উন্নত জীবনের। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র্য ঘোচাতে হবে। দরিদ্ররা যাতে মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে, দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে, মূল্যস্ফীতি যাতে সাধারণ দরিদ্র সীমিত আয়ের মানুসের জীবনকে আরও দুর্বিসহ করে তুলতে না পারে, সেজন্য কার্যকর কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহন জরুরী। আমাদের দেশের সড়ে ছয় কোটি মনুষ আজও বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে চলছে। এদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি। বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতাসংস্থা এ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সাহায্য দিচ্ছে বছরের পর বছর। গত ৩৫ বছরে হাজার হাজার কোটি দারিদ্র্য নিরসনে ব্যয় হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক কর্মসূচি সত্ত্বেও দেশে দারিদ্র্য কমেছে ১ শতাংশ হারে। দেশের সরকার ও বিপুল সংখ্যক এনজিওর সকল কর্মকান্ড এখন আবর্তিত হচ্ছে এই দরিদ্রদের ঘিরে। অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৩১ শতাংশই কোন কাজ পাচ্ছে না। অপরদিকে দেশে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে ১.৪৮ শতাংশ হারে। দারিদ্র্য হ্রাস ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবধানের কারণে দেশে বাড়ছে দরিদ্রর সংখ্যা। গত তিন দশকে শতাংশ হিসাবে দেশের দারিদ্র্য হ্রাস পেলেও সংখ্যা হিসাবে দারিদ্র্য পরিস্থিতির ব্যাপকতা উদ্বেগজনক। আর দাতাদের চাপিয়ে দেয়া প্রবৃদ্ধিভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলে দেশে বাড়ছে ধনী গরিবের মধ্যে বৈষম্য। আমাদের দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের একাধিক প্রচেষ্টার পরও দারিদ্র্য একটি নগ্ন বাস্তবতা, বার উপসর্গ প্রকাশ পায় ক্ষুধা, অশিক্ষা,

ব্যাধি, বেকারত্ব এবং আশ্রয়হীনতা ইত্যাদি দুর্বিপাকের কাছে আমাদের অসহায়ত্বের ভেতর দিয়ে। উপরন্তু এই অবস্থার অবণতি ঘটায় এ দেশে প্রকট আর্থসামজিক বৈষম্য। অন্যায় বণ্টনব্যবস্থা, দুর্নীতি, দুঃশাসন এবং গোষ্ঠী ও কায়েমি স্বার্থবাদীদের মধ্যে সামাজিক বিভক্তি। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্থসামজিকসংকেতগুলোর উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা গেলেও জনসংখ্যার স্ফীতির কারণে নিরঙ্কুশ হিসেবে দারিদ্র্যের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধি ও প্রশাসনে উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও একই সঙ্গে পরিবেশগত অবণতির কারণে এই উন্নতির প্রভাব থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

তবে আশার কথা গত দেড়-দুই দশকের ব্যবধানে সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। গ্রামীন জীবনে পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে। অতীতের মতো জীবনসংহারি মন্বন্তরের কথা একালে আর শোনা যায় না। জীবন মনের পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে ধীরগতিতে হলেও। উন্নতি হয়েছে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। পল্লী এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে অনেকে ছনের জীর্ণ কুটিরের জায়গায় টিনের ঘর উঠেছে। অশিক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিত যুবক ও যুব মহিলাদের অনেকেই আত্মকর্মসংস্থানের পথ করে নিয়েছে। এ ধরণের পরিস্থিতি উন্নয়নের পেছনে এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অবদান সর্বাধিক হিসেবে বিবেচিত। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে ছাগল পালন, গাভী পালন, হাস-মুরগির ছোট খামার, নার্সারি, ছোট মৎস্য খামার, সুই-সুতার কাজ এধরণের নানা কিছু কাজ করে দরিদ্র পরিবারে নারী ও পুরুষ সদস্যরা কমবেশি আয় রোজগার করেছেন। উপরন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হওয়ার সুবাদে কৃষিপন্য শাকসবজি, ফলমূল সবকিছুই বাজারজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে, গ্রামের প্রান্তিক চাষীরা যত সামান্য উৎপাদনই করুক না কেন এরা ভালো দাম পাচ্ছেন। এই পরিবেশে লোকদের মধ্যে উৎপাদনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে চলছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির আলোকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী বলা যায়, এখানে প্রতি বছর ১০.৭৮ শতাংশ হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। এ থেকে আরো জানা যায় ২০০০ সালে আমাদের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র্য ৫২.৩ শতাংশ। ২০০৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৪৩.৮ শতাংশ। অন্যদিকে নগরাঞ্চলে ২০০৫ সালের হিসাব অনুসারে দারিদ্র্যের হার ২৮.৪ শতাংশ। পাঁচ বছর আগে এহার ছিল

Dhaka University Institutional Repository

৩৫.২ শতাংশ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা ৯ কোটি ৩৮ লাখ। ২০০০ সালে এ সংখ্যা ছিল ৯ কোটি ১০ লাখ। লক্ষ্য করা যায় আনুপাতিক হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেলেও গরিব লোকের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে।

দারিদ্র্য দেশের উন্নয়নের জন্য কখনও জন্ম নিয়ন্ত্রণ, কখনও শিক্ষার প্রসার, কখনও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, কখনও পল্লী উন্নয়ন আবার কখনও শিল্পায়নের ব্যর্থ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ঘুচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কোন কোন দেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য আসলেও অধিকাংশ দেশেই ইপ্সিত উন্নয়ন ঘটেনি। সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ না করার কারণে সাফল্য আসেনি। ফলশ্রুতিতে ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সহস্রাব্দ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা, পরিবেশ দূর্ষণ এবং নারীর প্রতি বৈষম্য মোকাবেলায় নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং পরিমাপযোগ্য কয়েকটি লক্ষ্য অর্জনে একমত হয়েছেন। বিশ্ব এ্যাজেন্ডার শীর্ষে অবস্থার নেয়া লক্ষ্যগুলোকেই বলা হয় উন্নয়ন লক্ষ্য সমূহ বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বা মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোলস সংক্ষেপে এমডিজি। এই সম্মেলনে সহস্রাব্দ ঘোষনায় মানবাধিকার, সুশাসন এবং গণতন্ত্র প্রসার বিভিন্নমুখী প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। এমডিজির আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। বিশ্বের ৬০০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১২০ কোটি মানুষ দিনে ১ ডলার বা ৬০ টাকার কম ব্যয় করে জীবনধারণ করছে। ২০১৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৬০ কোটিতে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন দেশ নিজস্ব ও যৌথ কৌশলপত্র নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সরকার ২০০৩ সালের মার্চ মাসে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে তিন বছর মেয়াদি কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে, যা পিআরএসপি হিসেবে সমধিক পরিচিত। কাগজপত্রে যে কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে তার যথাযথ বাস্তবায়ন হলে দারিদ্র্য সমস্যা কাঙ্খিত পর্যায়ে লাঘব করা অসম্ভব নয়। এ জন্য রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা এবং সর্বস্তরের সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মানব সম্পদের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্জনীয়। এর মাধ্যমে সর্বস্তরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। ২০১৫ সালের মধ্যে সারা বিশ্বের দারিদ্র্য অর্ধেক কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করলে, একটা আশার দিক। নোবেল বিজয়ী গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনুস

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা কেন ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারব না? সেই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার প্রতি জোর দেন। দরিদ্রদের সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি তিনি জোর দেন। সমাজে কাঠামোগত পরিবর্তন আনার পাশাপাশি যথাযথ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও দরিদ্র মানুষের কাছে আনার কথা তিনি বলেন।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন এই মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রবৃদ্ধির যে হার লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮ থেকে ১০ শতাংশ উন্নীত করা সম্ভব। আর তা সম্ভব হলে দারিদ্র্যর হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। বর্তমানে প্রায় ৮শ এনজিও দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রয়াস-প্রচেষ্টা যে চলিয়া আসিতেছে তা সমগ্র বিশ্বের নজর কেড়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন এবং ক্ষুদ্র ঋন এখন প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে। গরিবির দেয়াল ভাঙতে ক্ষুদ্র ঋনই হতে পারে মোক্ষম অস্ত্র। গ্রামীন ব্যাংকের কল্যাণে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋন কার্যক্রমের প্রসারতার মধ্যে দিয়ে উপরউক্ত উক্তির সমর্থন মেলে। সরকারি পর্যায়ে ও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্রঋন দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও বানিজ্যিক ব্যাংকসমূহ শস্য আবাদ, মৎস্য চাষ, ছাগল পালন প্রভৃতি খাতে কিছু কিছু ঋন বিতরন কারে থাকে। সমাজ সেবা অধিদপ্তর হতেও পল্লীর অতিশয় দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে সীমিতসংখ্যককে সনাক্ত করে কিছু পরিমাণ ঋন প্রদান করা হয়ে থাকে। স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনেও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্রের ভাগ্যোন্নয়ন কর্মসূচি রয়েছে।

দরিদ্র্য বিমোচনের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি ও ত্বরান্বিত করাসহ সার্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবশ্যক। দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর যাতে দারিদ্র্য লাঘব এবং টেকসই উন্নয়ন হয় সেজন্য তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাথে মাথাপিছু আয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পেতে হবে। যার ফলে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক খাত (শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়। কৃষিখাতে অসম ভূমি ব্যবস্থাপনা লাঘব সাপেক্ষে পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন অকৃষি খাতসহ শহর অঞ্চলে কর্মসংস্থান

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং এর জন্য শিল্প, ব্যবসা ও অন্যান্য সেবা খাতসহ অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর সাথে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রন, বিশেষ করে খাদ্য বহির্ভূত দ্রব্যাদি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সহায়ক হবে। দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভন্ন কর্মসূচি রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা যথা- কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রনালয়, যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপতর, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদির কর্মসূচি রয়েছে। এছাড়া কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি কর্মসূচি, গ্রামীন সড়ক/ অবকাঠামো নির্মান/ রক্ষনাবেক্ষণ কর্ম সৃষ্টি করেছে। অপরদিকে শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচি যথা- শিক্ষার জন্য খাদ্য, ছাত্রীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সরাসরি শিক্ষার ব্যয়ভার লাঘব করছে। বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন এনজিও দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য কর্জ করে যাচ্ছে। এখন বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

৩.৪ বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের পটভূমি

তৎকালীন উপমহাদেশের বাংলা অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে ও পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয় কিছু মহৎ মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এদের মধ্যে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরু সদয় দত্ত, নুরুন্নবী, এস.এম ইসহাক প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮০ সালে প্রথম শিলাইদহ ও পতিসর গ্রামে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯২০ সালে শ্রীনিকেতনে "পল্লী পূর্নগঠন ইনিস্টিটিউট" স্থাপনের মাধ্যমে সুসংগঠিতভাবে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি গ্রামীন জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং 'পল্লী মঙ্গল সমিতি' গঠনের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করেণ। পরবর্তীতে গুরু সদয় দত্ত, নুরুন্নবী চৌধুরী এস, এস ইসহাক প্রমুখ উন্নত চাষাবাদ বীজ- সার- সেচের ব্যবস্থা, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, খালকাটা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, লাঠিখেলা, হা-ডু-ডু, জারী-সারী কবি গানের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন প্রভৃতি কমূসূচির মাধ্যমে পল্লীবাসীর আর্থ-সামাজিক

সাংস্কৃতিক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেণ। এসব কর্মসূচি বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া ব্রিটিশ শাসনামলে কৃষি সমবায় এবং পল্লী পুনর্গঠন বিভাগ গঠন করে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থাৎ ইউনিয়ন বোর্ড এবং জেলা বোর্ড গঠনের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিকে আরও ত্বরান্বিত করা হয় (চৌধুরী ও রহমান, ১৯৯৯:২০৭)।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নবতর পর্যায়ের যাত্রা শুরু হয়। ইতোপূর্বে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা ছিল পরোক্ষ। এখন সরকার বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মধ্যদিয়ে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসে। ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার গ্রামীন কৃষি ও শিল্প উন্নয় (Village Agricultural and Industrial Development-V-AID) কর্মসূচি চালু করে। এটি ভিলেজ এইড কর্মসূচি নামে সুপরিচিত। আর্থিক সংকট এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক জটিলতার কারণে ১৯৬১ সালে এই সম্ভাবনাময় পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তীতে ভিলেজ এইড কর্মসূচির বিলুপ্তির পর ১৯৬০ সাল থেকে ড. আখতার হানিফ খান এর নেতৃত্বে কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়। এই পদ্ধতির নম 'কুমিল্লা পদ্ধতি। এই কুমিল্লা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে আমাদের দেশের সকল পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে সৃষ্টির পর তৎকালীন সরকার কুমিল্লা পদ্ধতি অনুসরণ করে 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (Integrated Rural Development Programme) চালু করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (Bangladesh Rural Development Board) গঠন করে সরকার এই কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে এই কর্মসূচি কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অবকাঠামা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে এবং গ্রামীন দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে (চৌধুরী ও রহমান, ১৯৯৯:২০৭)।

সাম্প্রতিকালে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, আরডিআরএস,সিডা, গ্রামীন ব্যাংকসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশি বিদেশি এনজিও জাতীয় ও স্থানীয়

পর্যায়ে বাংলাদেশে গ্রামীন দারিদ্র্যমোচন প্রচেষ্টায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩.৫ বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত সরকারি উদ্যোগ

বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নিম্নোক্ত সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে।

৩.৫.১ গ্রামীন কৃষিও শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচি

১৯৫৩ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীন কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (Village Agricultural and Industrial Development-V-AID) কর্মসূচি চালু করে। এটি ভিলেজ এইড কর্মসূচি নামে সুপরিচিত। অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির অভিজ্ঞতার আলোকে ভিজেল এইড কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু আন্ত র্জাতিক সাহায্যদাতা সংস্থার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

ভিলেজ এইড ছিল মূলত একটি জাতীয় সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি। এর প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপঃ

ক) আধুনিক জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করা।

খ) গ্রামীন জীবনে সামাজিক সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদ্যালয়, হাসপাতাল স্থাপন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।

গ) আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য জনগণের মধ্যে স্বেচ্ছা উদ্যোগ ও নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করা (চৌধুরী ও রহমান, ১৯৯৯:২০৮)।

ঘ) গ্রামীন জনগোষ্ঠীর জীবনকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

ঙ) সরকারি প্রশাসনে জনকল্যাণমূলক মনোভাব সৃষ্টি করা।

মূলত ভিলেজ এইড কর্মসূচির সুদুর প্রসারী লক্ষ্য ছিল কৃষি উন্নয়ন প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন, সমবায়, কুটির শিল্প, সেচ ও ভূমি পুনরুদ্ধার। রস্তাঘাট উন্নয়ন, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গ্রামীন আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। ভিলেজ এইড কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য ১৯৫৯ সালে কুমিল্লা ভিলেজ এইড একাডেমী স্থাপন করা হয়। এছাড়া গ্রাম পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দনের জন্য পাঁচটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন কর হয়েছিল ভিলেজ এইড কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ বিষয়টি প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত ছিলঃ ১. জনগণের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা অর্জন এবং ২. কৃষি, মৎস্য চাষ, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও .দক্ষতা অর্জন। ফলে জনসাধারণের মূল ভূমিকা ছিল গ্রামীন জনসাধারণকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা। একটি থানা বা ১৫০ টি গ্রাম নিয়ে ভিলেজ এইড উন্নয়ন এলাকা নির্ধারণ করা হত। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত দেশের প্রায় অর্ধেক এলাকা এই কর্মসূচির আওতাভূক্ত হয়েছিল।

মূলত রাজনৈতিক কারণে ১৯৬১ সালে এই কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়। তৎকালীন সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁন রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন এবং গ্রামীন পূর্ত কর্মসূচির নামে একটি নতুন কার্যক্রম চালু করেন। এই নতুন কর্মসূচি মৌলিক গণতন্ত্রী তথা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ভিলেজ-এইড কর্মসূচির সমুদয় অর্থ গ্রামীন পূর্ত কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ করা হয়। ফলে অর্থাভাবে ভিলেজ এইড কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া অন্য সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিলেজ- এইড কর্মকর্তা কর্মচারীদের দ্বন্দ্ব ও অসহযোগিতা, অর্থের অপচয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর অভাব প্রভৃতি এই কর্মসূচী বন্ধের উল্লেখযোগ্য করেন।

৩.৫.২ বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি

কৃষিক্ষেত্রে স্থবিরতাই ছিল ষাটের দশকের সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা। কুমিল্লা মডেলের উদ্ভাবক ও প্রাণপুরুষ ড. আখতার হামিদখান মনে করাতেন যে, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নত কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেই কেবল এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তার নেতত্বে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বোর্ড) পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যা পরবর্তীকালে কুমিল্লা মডেল বলে পরিচিত লাভ করে। কুমিল্লা মডেলের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে ঃ

ক) থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (TTDC-Thana Training and Development Centre) ঃ টিটিডিসি কৃষকদেরকে সকল ধরণের সেবামূলক সরঞ্জামাদি

Dhaka University Institutional Repository

সরবরাহ, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও নতুন প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করতো। এ কেন্দ্রে উন্নয়ন কার্যক্রমে জড়িত সরকারি এজেন্সীগুলোকে থানা পর্যায়ে সমন্বিত করার দায়িত্ব পালন করা হতো।

খ) গ্রামীন পূর্ত কর্মসূচি (RWP- Rural Works Programme) ঃ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং কর্মহীন ঋতুগুলোতে গ্রামীন লোকদেরকে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

গ) থানা সেচ কর্মসূচি (TIP-Thana Iirigation Programme) ঃ কৃষকরা যাতে চাষাবাদ সরঞ্জাম যথযথভাবে ব্যবহার করতে পারে সেজন্য কৃষকদেরকে চাষাবদ গ্রুপের অধীনে সংগঠিত করা হতো। ষাটের দশকের দেশের দিকে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে এগ্রুপগুলোকে কে.এসএস হিসেবে টিসিসিএ এর অধীনে রেজিস্টীভূক্ত করা হতো।

ঘ) দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা (TCCA, KSS)ঃ কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীন কৃষকদেরকে গ্রামভিত্তিক কৃষক সমবয় সমিতির অধীনের সংগঠিত করা হতো। কে.এস.এস গুলোর মাধ্যমে গভীর নলকূপ ও হালকা হস্তচালিত কলের যৌথ ব্যবহার পরিচালনা করা হতো। কৃষকদের থেকে সামান্য সঞ্চয় করা হতো। কৃষকদের থেকে সামান্য সঞ্চয় সংগ্রহ করে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান ও কৃষি উপকরণসমূহ সরবরাহ করা হতো। থানা পর্যায়ে কে.এস.এম গুলাকে সমন্বয় সাধন করতে টি.সি.সি.এ বা থানা সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ এসোসিয়েশেন। এটি ছিলো কে.এম.এম গুলোর সমন্বয় সাধনকারী ও সহযোগিতামূলক সংগঠন।

১৯৫৯ সালে কুমিল্লা জেলার সদর থানায় পরীক্ষামূলকভাবে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সূচনা হয়। কুমিল্লা মডেলের দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে সারা দেশে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য ১৯৭২ সালে জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (Bangladesh Rural Development Board-BRDB) নামে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তরিত করা হয়।

লক্ষ্য উদ্দেশ্য

গ্রামীন দারিদ্র্য বিমোচ কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদান করে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বা বিআরডিবির মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেসব উদ্দেশ্যে বিআরডিবির কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা নিম্নরূপঃ

ক) গ্রামভিত্তিক প্রাথমিক সমবায় সমিতি (কৃষক, মহিলা ও বিত্তহীন সমবায় সমিতি) ও থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গ্রামীন দারিদ্র্য হ্রাস করা।

খ) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠনিক দল গঠনের মাধ্যমে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে সমবায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দৃঢ় করা।

গ) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঘ) প্রাতিষ্ঠাকি সহায়তা ও সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

ঙ) উৎপাদনশীল কাজের জন্য উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ, দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদনের উৎসসমূহের সঙ্গে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিচিত করানো।

চ) পল্লী অঞ্চলে অফিস, বাজার, গুদাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারখানা প্রভৃতির ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা।

ছ) বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিশেষত দরিদ্র মহিলাদের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা (চৌধুরী ও রহমান, ১৯৯৯:২০৯)।

পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় যে সকল কার্যক্রমে পরিচালনা করতো নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

ক. সরেজমিন বিভাগের কর্যক্রমঃ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমগুলো হলঃ

১. সমবায় সংগঠন ও পুজি গঠনঃ সমবায় সমিতি গঠন করে সদস্য সদস্যদের ক্রয়কৃত শেয়ার এবং জমাকৃত সঞ্চয়ের অর্থে মূলধন বা পুজি গঠন করা সরেজমিনে বিভাগের প্রাথমিক কাজ।

২. ঋণ কার্যক্রমঃ গ্রামভিত্তিক কৃষক ও মহিলা ও বিত্তহীন সমবায় সমিতির সদস্য-সদস্যদের কৃষি ও অকৃষি উপার্জনমূলক প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ এই কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য।

৩. বাজারজাতকরণ ঃ এই কার্যক্রমের আওতায় পল্লী উন্নয়ন বোর্ড থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও প্রাথমিক সমিতিগুলোর মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদিত কৃষিপণ্য এবং কৃষি উৎপাদনের উপকরণ যেমন- সার, বীজ, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকে।

৪. সেচ ব্যবস্থাপনাঃ সেচাধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, সেচ খরচ কমানো এবং গ্রামীন বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য।

খ) দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প

এই প্রকল্পের আওতায় চারটি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প যথা-পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৫, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৯, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১২ এবং পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গ্রামীন ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের ঋন প্রদানের মাধমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও সার্বিক জীবযাত্রার মানোন্নয়ন করা। এসব কর্মসূচিতে দরিদ্র মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এছাড়া এসব প্রকল্পের আওতায় শাক- সবজির চাষ, পয়ঃনিষ্কাশন, রাস্তঘাট উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যক্রম রয়েছে।

গ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ

সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীও সমবায়ী নেতৃবৃন্দের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এই কর্মসূচির প্রধান কাজ। দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসহ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন আঞ্চলিক ও থানা পর্যায়ে প্রশিক্ষন কেন্দ্র ছাড়াও কুমিল্লা একাডেমী, লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরিকল্পনা একাডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

ঘ) মহিলা বিষয়ক প্রকল্প ঃ

আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের মধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের আওতায় সমবায়ী মহিলাদেরকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। এছাড়া মহিলাদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো হয় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি,শিশু পরিচর্যা ইত্যাদি সামাজিক সেবা গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা মহিলা প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম (চৌধুরী ও রহমান, ১৯৯৯:২১০)।

ঙ. কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো হচ্ছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে সেচ যন্ত্র ও পাওয়ার টিলার সরবরাহ করা। বাজারজাতকরনণের ব্যবস্থা, দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিয়মিত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কৃষি যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু মেরামতের ববস্থা করা।

উল্লেখিত প্রধান প্রধান গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের ৮৫ ভাগ গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তবে গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের সম- উন্নয়ন এখন ও নিশ্চিত করা এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD) অনুসরনে পরবর্তীতে বগুড়া জেলায় বগুড়া শহরের অদূরে আর একটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (Rural Development Academy (RDA) প্রতিষ্ঠিত হয়।এই প্রতিষ্ঠানেরও মূল লক্ষ্য গ্রামের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য কাজ করা। তাই এই প্রতিষ্ঠান পল্লী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কুমিল্লা মডেলে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের উন্নয়নের প্রচেষ্টা ইতোমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষামূলক কর্মসূচি প্রয়োগের মাধ্যমে কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। বার্ড (BARD) এর ন্যায়, আরডিএতেও গ্রাম উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। একাডেমীর কর্মকান্ড ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে এর প্রভাব পরলক্ষিত হচ্ছে। সাম্পতিকালে BARD- এর CVDP (Compreensive Village Development Programme) কর্মসূচি বেশ সফল হয়েছে।

৩.৫.৩ স্ব-নির্ভর আন্দোলন

বাংলাদেশে স্বনির্ভর আন্দোলন যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৫ সালে দেশের অব্যবহৃত ও অবহেলিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনের উদ্যোগে। ১৯৭৫ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর জাতীয় পর্যায়ে স্বনির্ভর আন্দোলন কার্যক্রম বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরে ১৯৮৩-৮৪ সালে প্রশাসনিক পুর্নগঠন ও বিকেন্দ্রীকরণের কারণে স্বনির্ভর কর্মসূচি বাস্তাবায়ন প্রক্রিয়ার রূপান্তর

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে এবং এই স্বনির্ভর আন্দোলনের কার্যক্রম বাংলাদেশের ৭০টি থানায় সম্প্রসারিত হয়।

আভিধানিক অর্থে স্বনির্ভর মানে নিজের উপর নির্ভর করা। অর্থাৎ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজর জীবনকে পরিচালিত করা। তবে জাতীয় উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে স্বনির্ভরতা বলতে একটি দেশের নিজস্ব সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন কে বোঝায়। মাহবুব আলম চাষীর মতে- স্বনির্ভরতা হল ব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত মানবিক ও বস্তুগত উভয়ধরণের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে পারিবারিক পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। গ্রাম বাংলার মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনা এবং অজস্র সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার করে জাতীয় অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই স্বনির্ভর আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্য সমূহ হচ্ছে ঃ

১. নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।
২. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রতি ইঞ্চি জমিও প্রতিটি মানুষকে উৎপাদনের কাজে লাগানো।
৩. গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলা এবং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো।
৪. 'যা আছে তাই নিয়ে' কাজে ঝাপিয়ে পড়া।
৫. ভিখারীর হাত কে কর্মীর হাতে পরিণত করা।
৬. গণশিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করা।
৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা এক ভাগে নামিয়ে আনা।
৮. জনগণের নিজস্ব প্রচেষ্টায় গ্রামীন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন করা।
৯. স্থানীয় পর্যায়ে স্বনির্ভর হওয়ার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

স্বনির্ভর আন্দোলনের কার্যক্রম

স্বনির্ভর আন্দোলন তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। স্বনির্ভর আন্দোলনের কার্যক্রমগুলো হলঃ

১. প্রতিটি বেকার যুবক, শ্রমিক, মহিলা ও দিনমজুরকে স্বনির্ভর কমিটির সহায়তায় সামাজিক কর্মীদলে পরিণত কর।

২. আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দরিদ্র নারী, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের সহজশর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।

৩. গ্রামীন পূর্ত কর্মসূচির মাধ্যমে রাস্তাঘাট, পুকুর সংস্কার পতিত জমি চাষাবাদ প্রভৃতি কর্মসূচি জোরদার করা।

৪. কৃষি উন্নয়ন, মৎস্য চাষ, পশুপালন, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি কমূসূচি বাস্ত বায়নে সরকারি কর্মচারীদের সহায়তা প্রদান করা।

৫. সমবায়ের ভিত্তিতে জল সেচের জন্য স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন করা (চৌধুরী ও রহমান, ১৯৯৯:২১২)।

৬. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জ্বালানি কাঠের অভাব দূর করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ করা।

৭. স্বনির্ভর ঋণগ্রহীতাদের বাধ্যতামূলক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ নিশ্চিত করা।

৮. নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নিরক্ষরতা দূর করা।

৯. খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।

যদিও সীমিত পর্যায়ে আয়-বৃদ্ধি, শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর স্বনির্ভরতা অর্জন এই আন্দোলনের মাধ্যমে সম্ভব হয় নি। উপরন্তু এই আন্দোলন ছিল উপর থেকে চাপিয়ে নেওয়া, ফলে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এতে ঘটেনি। এছাড়া প্রভাবশালী ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর দৌরাত্মের ফলে দরিদ্র জনগণ এই আন্দেলন থেকে কোন সুফল লাভ করতে পারে নি। বর্তমানে 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' নামে একটি বেসরকারি সংস্থা স্বনির্ভর আন্দোলনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

৩.৫.৪ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি

গ্রামীন অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মৌসুমী বেকারত্ব দূর করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করা হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি,

Dhaka University Institutional Repository

ইউএসএইডি, কেয়ার, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, জার্মানি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও দেশের খাদ্যশস্য সাহায্য হিসেবে নিয়ে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

প্রধান প্রধান কার্যক্রম

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলঃ

১. প্রতি বছর গ্রাম এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য রাস্তাঘাট নির্মান ও মেরামত, পুল নির্মান, বণ্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মান, নদী- খাল পুনঃ খনন ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীন অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন।

২. স্বল্প আয়ের প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন ও অদক্ষ বেকার শ্রমিক ও মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যবস্থার করা।

৩. চরম খাদ্য সংকটের সময় এবং শুষ্ক মৌসুমে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের খাদ্যের ব্যবস্থা করা।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক ড. কামাল সিদ্দিকীর মত হল- গ্রামীন পূর্ত কর্মসূচির কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিই এখন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে খাদ্যের ব্যবহার বেড়েছে দ্রুত। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত খাদ্যশষ্য ত্রান হিসেবে বিতরণ না করে কাজের বিনিময়ে বিতরণ করে এই কর্মসূচি পল্লী উন্নযনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে (চৌধুরী ও রহমান, ১৯৯৯:২১৩)।

৩.৫.৫ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ধীন এ অধিদপ্তর বিভিন্ন অবকাঠামোমূলক উন্নয়ন প্রকল্প, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে গ্রামীন সড়ক, গ্রোথ সেন্টার, বাঁধ নির্মান প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এতে পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৯০/৯১ হতে ১৯৯৫/৯৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ২২.৫ কোটি শ্রম দিবসের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্য সহায়তায় কানাডা থেকে খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে আর.এম.পি ১৯৮৩ সালে শুরু হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কেয়ার এর সহযোগীতায় এ কর্মসূচির ১ম ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হয়। ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে আর.এম.পির ৩য় পযায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) নিকট স্থানান্তরিত হয়। এ কর্মসূচির প্রধান

লক্ষ্য হলো পল্লী বিত্তহীন মহিলাদেরকে (০.৫০ একর জমির মালিকানা পর্যন্ত) ইউনিয়নের রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষন কাজে নিয়োজিত করে কর্মসংস্থান করা এবং একই সাথে তাদেরকে সংগঠিত করে তাদের সঞ্চয় হতে অন্যান্য আয়বর্ধক কমূসূচি গ্রহণে সহায়তা করা। আর.এম.পি দেশের ৬১ জেলায় ৪১৫ থানায় ৩৬০০ ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন আছে (মাহমুদ, ১৯৯৭:১৫৯)।

৩.৫.৬ পল্লী কর্মসহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

১৯৯০ সালে স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি অনুদানে সহযোগী সংস্থা (এনজিও) এর মাধ্যমে লক্ষ্য ভিত্তিক দরিদ্রের (০.৫০) একর জমির মালিকানা পর্যন্ত এবং বিত্তহীন জনগোষ্ঠী) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে আসছে। পিকেএসএফ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যার প্রধান ম্যান্ডেট ছিল তৃনমূল পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে (এনজিও) নমনীয় হারে তহবিল প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রচেষ্টাকে টেকসই করা এবং অনুরূপ সংস্থাগুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খল কাঠামোর মধ্যে আনয়ন। এটি একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যার নীতিনির্ধারণী দায়দায়িত্ব পালন করেছেন নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিচালনা বোর্ড। ১৯৮৯-৯০ হতে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ সরকার ফাউণ্ডেশনকে মোট ১১০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে (মাহমুদ, ১৯৯৭:১৫১)।

১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে অনুদানের পরিবর্তে ২১.৫০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া পি.এল ৪৮০, টাইটেল-৩ এর মাধ্যমে সরকার ১৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে। পিকেএসএফ ১৯৯৬ সালে ৫৩ টি জেলায় ১৩৫ টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ৫.৪৭ লাখ ঋণ গ্রহীতাকে (মহিলা ৯১%) প্রায় ১৩২.৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৯%। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশন ২০০৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ২১৬ টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৪৮ লাখ ৯১ হাজার ২৩২ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে ১ হাজার ৬৯৮ কোটি ৩৩ লাখ টাকা বিতরণ করেছে। ফাউণ্ডেশনের অর্থ সহায়তায় সহযোগী সংস্থাগুলো পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে ঋণ কমূসূচি পরিচালনা করে থাকে। ফাউণ্ডেশণ এ ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনা

দক্ষতা ও নৈপুন্য বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে। কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা ব্যবস্থাপনা কর্তাপক্ষের দুরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব, সরকারের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় পিকেএসএফ দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

৩.৬ দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারি উদ্যোগ

বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ক্ষুদ্রঋণসহ মানব সম্পদ উন্নয়ন মানবসম্পদের অভাবজনিত দারিদ্র্য হ্রাস, পরিবেশ উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কায্যক্রম ইত্যাদি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের পাশাপাশি দারিদ্র্য নামের দৈত্যটাকে বাগে আনতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এনজিওদের কার্যক্রম স্বাধীনতার আগে থেকেই কিছু কিছু শুরু হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন শরণার্থীদের সেবাও চিকিৎসার জন্য এনজিওরা কাজ শুরু করে। তারপর যুদ্ধের পর যারা দেশে ফিরে এলেন শুরু হয় তাদের পূর্ণবাসনের কাজ। এর কিছু দিনের মধ্যে বন্যা এবং ৭৪ এর দুর্ভিক্ষে মানুসের জন্য ত্রান ও পুনর্বাসনের কাজটিও করেছিলেন এনজিওরা।

কিন্তু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো ক্রমান্বয়ে বুঝতে পারে যে, ত্রান এবং পুনর্বাসন কাজগুলো শুধু আপৎকালীন সময়ের জন্য দেয়া উচিত। না হলে এর উপর জনগনের নির্ভরশীলতা ক্রমশ বেড়ে যাবে। তারা উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারবে না। এই চিন্তা থেকেই এনজিওরা স্থায়িত্বশীল দারিদ্র্য বিমোচনের পথ খুজতে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে ব্র্যাক (BRAC) নামের একটি এনজিও প্রথম তাৎপর্য পূর্ণভাবে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এরপর গত তিন দশকে ধীর ধীরে এটি একটি আন্দোলনে রূপ নেয়। গড়ে ওঠে হাজার হাজার জাতীয় ও আঞ্চলিক বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বাংলাদেশে ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে দেশি বিদেশি এনজিও সমূহের কর্মতৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। আশির দশকের শুরু থেকে পার্টিসেপটরী ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচ নিয়ে টার্গেটগ্রুপ হিসেবে বিশেষ করে গ্রামীন দরিদ্র ও বিভিন্ন অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার মাধ্যমে অকৃষিখাতে কর্মসংস্থান এবং কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি কর্মসূচিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং কার্যক্রমে এনজিও

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম একটি আকর্ষণীয় পেশায় রূপান্তরিত হয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত যুবকের কর্মসংস্থান দিয়েছে। বাংলাদেশে গ্রামীন দারিদ্র্যমোচনে কর্মরত এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলত ভূমিহীন, কৃষি শ্রমিক, নারী ও প্রান্তিক কৃষকদের কেন্দ্র করে। এছাড়া ধর্মীয়ভাবে নিম্নবর্নের মানুষ এবং অবহেলিত আদিবাসীদের মধ্যে এনজিও কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

গ্রামীন দারিদ্র্য মোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন এনজিওর সাধারন কার্যক্রম হচ্ছে সচেতনতা সৃষ্টি, গ্রাম সংগঠন, উৎপাদনের নতুন কৌশলের সঙ্গে খাপখাওয়ানো, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান, গ্রাম-সদস্যদের উচ্চতর মজুরির জন্য দরকষাকষি, অধিকতর সুবিধাজনক বর্গা ব্যবস্থালাভ খাস পুকুর, জমির ওপর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋন সুবিধা লাভ এবং গ্রামীন দারিদ্রদের জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা এবং পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা। এনজিওদের ঋন সহায়তায় এবং ব্যবস্থাপনায় যে সকল কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধন মূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা হলো, ভূমিহীনদের সেচ প্রকল্প, খাস পুকুরে মৎস্য চাষ, উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্য আহরন,তাঁত শিল্প, ভূমিহীন বর্গাচাষীদের জন্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ, দরিদ্র মহিলাদের জন্য হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল পালন, রেশমচাষ প্রকল্প, মৌমাছি পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ধানভানা চিড়ামুড়ি তৈরি, কুটির হস্তশিল্প, যেমন, বাঁশ-বেত মাটি ও কাঠের কাজ ইত্যাদি। এনজিওসমূহের এইসব কর্মসূচি গ্রামীন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমান বাংলাদেশে এনজিওর ঋণ সহায়তায় ৪০০ সেচ প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে, ১৬ লক্ষ পরিত্যক্ত পুকুর উৎপাদনশীল হয়ে উঠেছে। তাঁত শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক যারা দৈনিক ১২ টাকা আয় করত তাদের আয় ৪০ থেকে ৫০ টাকার উন্নীত হয়েছে। গবাদি পশু পাখির টিকাদানকারী একজন কর্মী দৈনিক ৪০ টাকা আয় করছে, গরু পালন অর্থনৈতিক প্রকল্প হিসেবে লাভজনক এবং শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে সফল হচ্ছে। এছাড়া কুটির ও হস্তশিল্প বিক্রয় করে উল্লেখযোগ্য অর্থ আসছে। একমাত্র পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী করে কয়েক বছর যাবৎ বার্ষিক ১০ লক্ষ ডলার আয় হচ্ছে (সামাদ, ২০০৩ : ৫২, ৫৪)।

এনজিওদের সকল প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য দরিদ্র মানুষের নিজেদের চেষ্টার মাধ্যমেই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো। অর্থাৎ সমাজে তাদের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা; বিশেষ করে নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্রঋণ ছাড়াও সামাজিক আন্দোলন, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়ন ও নাগরিক অধিকর সংরক্ষণের আন্দোলনে এ সকল বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা উল্লেখ করার মত। এছাড়াও আরো অনেক গুলো এনজিও উদ্ভাবনীমূলক কাজে নিয়োজিত থেকে দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে সম্পূরক কর্মসূচি গ্রহণেও এসব স্বেচ্ছাসেবী বেসরকরি সংগঠন দারিদ্র্যবিমোচনে নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছে। এনজিওর বাইরেও অনেকগুলো মানবাধিকার ও নারী অধিকার সংরক্ষণ সামাজিক সংগঠন সামাজিক দারিদ্র্য বিমোচনে বেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। এখন প্রধান প্রধান কয়েকটি এনিজিও কার্যক্রম আলোচনা করা হলো-

৩.৬.১ ব্র্যাক

বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (Bangladesh Rural Advancement Committee- BRAC) সংক্ষেপে ব্র্যাক নামে পরিচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিঃস্ব মানুষের জন্য জরুরি ও তাৎক্ষনিক সাহায্য এবং পুনর্বাসনের লক্ষে ১৯৭২ সালে ফজলে হাসান আবেদের উদ্যোগে এই বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার জন্ম হয়। ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরু হয় সিলেটের, শাল্লার নামক এক নিভৃত গ্রামকে কেন্দ্র করে। শাল্লার ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় ব্র্যাক গভীরভাবে উপলব্ধি করে যে, ত্রান বা সাহায্য একটি তাৎক্ষণিক ও সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। ফলে গ্রামীন দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্র্যাক দারিদ্র্যবিমোচন কমূসূচি গ্রহণ করে। মূলত ভূমিহীন নারী পুরুষ, প্রান্তিক চাষী, মৎস্যজীবী, তাঁতী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ ব্র্যাকের টার্গেট গ্রুপ বা লক্ষ্য দল। তবে যারা জীবিকার জন্য বছরে কমপক্ষে ১০০ দিন শ্রম বিক্রি করে সেসব দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ব্র্যাক সেবা প্রদানের প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

ব্র্যাকের উদ্দেশ্য

গ্রামের দরিদ্র ও শোষিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো ব্র্যাকের মূল উদ্দেশ্য। এই মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ব্র্যাক কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে থাকে। এই উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

Dhaka University Institutional Repository

১. দরিদ্র্যদের জন্য কার্যকর সংগঠন গড়ে তোলা এবং তাদের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

২. সহজলভ্য ঋন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্রদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্যোগী করে তোলা।

ব্র্যাকের কার্যক্রম

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ব্র্যাক বহুমুখী কর্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ব্র্যাকের প্রধান কার্যক্রম হল গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্রদের মধ্যে বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দান করা। সাধারণত ক্ষুদ্র ব্যবসা, গরু-ছাগল পালন, শূকর পালন, হাঁস মুরগির চাষ, বাঁশ-বেত, মাটির কাজ, কুটির শিল্প প্রভৃতি উপার্জনমূলক প্রকল্পের জন্য ব্র্যাক ঋন সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া নক্সি কাঁথা ও হস্তশিল্প প্রকল্পের জন্য ব্র্যাক ঋণ দেয়। ঢাকায় তিনটি এবং চট্টগ্রামে ও সিলেটে একটি করে মোট পাঁচটি 'আড়ং' দোকানে ব্র্যাকের দরিদ্র মহিলাদের তৈরি হস্ত শিল্প সামগ্রী বিক্রি করা হয়। এতে গ্রামের দরিদ্র মহিলা ও গ্রামীন কারুশিল্পীরা তাদের ন্যায্য মজুরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। ব্র্যাক গত দুই দশকে বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৪৫০ কোটি টাকার বেশি ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে- যার সুদে আসলে পরিশোধের হার ৯৮ শতাংশ। ব্র্যাক ২০০৩ সাল নাগাদ ১০ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে।

ব্র্যাক পরিচালিত দরিদ্র শিশুদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। যারা কোন দিন বিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়াতে পারত না ব্র্যাক সেসব দরিদ্র শিশুদের জন্য বিনা বেতনে এবং বিনা মূল্যে বই-খাতা-শ্লেট-পেন্সিল সরবরাহ করে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে প্রায় ৩০ হাজার স্কুলে প্রায় ৯ লক্ষ দরিদ্র শিশু ব্র্যাকের সহায়তায় লেখা পড়া করছে। এছাড়া খাবার স্যালাইন তৈরি, শিশুদের টিকাদান ও ভিটামিন- এ বিতরণ, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি ও পয়ঃনিস্কাশন প্রভতি কর্মসূচি গ্রহণ করে ব্র্যাক গ্রামীন মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে (চৌধুরী ও রহমান, ১৯৯৯:২১৫)।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬.২ গ্রামীন ব্যাংক

ড. মুহাম্মদ ইউনুস ও তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীন ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে বাংলাদেশের দারিদ্র্য মুক্তিতে অসামান্য ভূমিকা পালনের জন্য ২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরষ্কার অর্জন করেছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বে বিরল সম্মান ও গৌরবে অভিসিক্ত হয়। ২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরষ্কারের ঘোষণা দিয়ে নোবেল কমিটি তাদের বিবৃতিতে বলেছে, মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ড: মুহাম্মদ ইউনুস এবং গ্রামীন ব্যাংকের অবদানের স্বীকৃতির কারণেই তারা উভয়কে এ পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। নোবেল কমিটির সিদ্ধান্তে বলা হয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে তুলে এনে সমৃদ্ধি দিতে না পারলে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন পরিবার ও দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যেসব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তাদের মধ্যে গ্রামীন ব্যাংক অন্যতম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন অর্থনীতির অধ্যাপক ড. মুহাম্দ ইউনুস গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী জোবরা গ্রামের ভূমিহীন মহিলাদের কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে জামানত ছাড়া ঋন সহায়তা দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রামীন ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। জোবরা গ্রামের অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে টাঙ্গাইলে ১৯৭৯ সালে গ্রামীন ব্যাংকের আরেকটি শাখা কাজ শুরু করে। ক্ষুদ্র দুইটি প্রকল্পের ভিত্তিতে পরবর্তীতে এই ব্যাংক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যক্রম চালু করে। ঋণের প্রকল্প থেকেই ১৯৮৩ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে জন্মলাভ করে গ্রামীন ব্যাংক। ১৯৮৩ সালে এ ব্যাংক স্থাপিত হলেও ৯০ দশকে অবিশ্বাস্য রকমের অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত গ্রামীন ব্যাংক ১ হাজার ১৯৫ টি শাখার মাধ্যমে ৬১ জেলার ৩৯৩ উপজেলার ৩১ লাখ ২৪ হাজার সদস্যের মধ্যে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১৭ হাজার ৫৪২ কোটি ৩০ লাখ টাকা। ৭৮৬ কোটি টাকারও বেশী তারা ২০০৩ সার গৃহ নির্মান বাবদ ঋণ প্রদান করেছে। মাত্র ৫ শতাংশ সুদে গ্রামীন ব্যাংক ২ হাজার ৫৯ জন ছাত্রকে শিক্ষা ঋন দিয়েছে। ২০০৬ সালে গ্রামীন ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ২ হাজারের বেশি এবং বিতরণ করা ঋণের পরিমান প্রায় ৩০ হাজার

Dhaka University Institutional Repository

কোটি টাকা। এখন পর্যন্ত (২০০৬) ঋনের উপকারভোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৬ (৬৩ লক্ষ নারী) লাখের কাছাকাছি। জোবরা গ্রামের ইউনুসের স্বপ্নবিলাসী যে প্রকল্প তা আজ আর কেবল বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানায় আবদ্ধ নেই, সীমানা পেরিয়ে বহির্বিশ্বের শতাধিক দেশে এটা মডেল হিসেবে চালু হয়েছে। ড. ইউনুস পৃথিবীবাসীকে দেখিয়েছেন, দারিদ্র্য নির্মূলে প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিবেশে মুক্তঋণ বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। তার প্রণীত ঋণ মডেলে বলা হয়েছে- দরিদ্রদের ঋণ দেওয়া জন্য জামিন লাগে না, জামিন ছাড়াই তাদের ঋন দেয়া যেতে পারে এবং ঋনের শতভাগ আদায় করা যায়। গ্রামীন ব্যাংকের ঋণের অধিকাংশ সদস্যই মহিলা এবং ঋন পরিশোধের হার প্রায় ৯৯ ভাগ। একটি গবেষণা মূল্যায়নে দেখা গেছে আড়াই বছরে সদস্যদের আয় বেড়েছে প্রায় ৭০ ভাগ। গ্রামীন চাহিদার উন্নয়ন ঘটেছে। আবার জাতীয় ক্ষেত্রে ১৯৯৪, ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ এ জিডিপিতে শুধু গ্রামীন বাংকের অবদান যথাক্রমে শতকরা ১.৫, ১.৩৩ ও ১.১ ভাগ বলে একটি মূল্যায়ন সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে (আলমগীর, ১৯৯৮)। এ মডেলের আওতায় শুরু হয়েছে ব্যাপক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। গড়ে উঠেছে হাজারের ও বেশি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান।

গ্রামীন ব্যাংকের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের ভূমিহীনদের মালিকানায় এবং তাদের কল্যানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হচেছ গ্রামীন ব্যাংক। গ্রাম্য টাউট, মহাজন এবং সুদখোরদের হাত থেকে রক্ষা করে দরিদ্র জনগেষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা গ্রামীন ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। এর কয়েকটি উদ্দেশ্য হলো নিম্নরূপঃ

১. অবহেলিত গ্রামীন জনগোষ্ঠীকে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা।

২. দরিদ্র পুরষ-মহিলাদের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা;

৩. গ্রামের সুদখোর মহাজনদের শোষণের বিলোপ সাধন;

৪. অব্যবহৃত ও অল্প ব্যবহৃত মানব সম্পদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

৫. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রকে উৎপাদনশীল সম্প্রসারণশীল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা;

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীন ব্যাংকের কার্যক্রম

গ্রামীন ব্যাংকের মূল কার্যক্রম হচ্ছে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পশুপালন, গ্রামীন যানবাহন, গ্রামীন ক্ষুদ্র শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্য চাষ প্রভৃতি উপার্জনমূলক প্রকল্পে ঋণ প্রদান করে। এছাড়া গ্রামীন ব্যাংক মাত্র আট হাজার টাকা ব্যয়ে সিমেন্টের পিলারের উপর টিনের ঘর তৈরীর জন্য একটি ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে। গ্রামীন ব্যাংক, খাস জমিতে ধান উৎপাদন, ক্ষুদ্র সবজী বাগান, ফল-মূল ও মসল্লা উৎপাদন, দুগ্ধবতী গাভী পালন, বাছুর মোটা তাজাকরণ, ছাগল পালন,হাঁস মুরগি পালন ও মৌমাছি পালন, তাঁতের কাপড় তৈরি ও ছাপমারা, সেলাই ও পোশক তৈরি, মাছের জাল তৈরি, ধান-ডাল ভাঙ্গানো ও চিড়ামুড়ি তৈরি, কৃষিজ ক্ষুদ্র ব্যবসা ও মুদি দোকান প্রভৃতি কার্যক্রমে ঋণ প্রদান করে থাকে। সাধারণত যাদের চাষের জমির পরিমাণ আধা একরের অধিক নয় এবং যেসব পরিবারে মোট সম্পদের মূল্য এক একর জমির বাজার মূল্যের বেশি নয় তারাই গ্রামীন ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। ঋণ নিতে আগ্রহী এমন সমমনা পাঁচজন নারী অথবা পুরুষ মিলে একটি দল গঠন করতে হয়। ঋণ গ্রহণের জন্য ব্যাংকে কোন জামানতের প্রয়োজন হয় না (চৌধুরী ও রহমান, ১৯৯৯:২১৫)।

৩.৬.৩ আশা

গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় জনগণকে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে আশার প্রতিষ্ঠা। এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট (Association Forsocial Advncement-ASA) এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে আশা। প্রথম দিকে আশার প্রধান প্রধান কার্যক্রম ছিল দরিদ্রদের নিয়ে দল গঠন করা, শিক্ষাদান ও আলোচনার মাধ্যমে দলের সদস্য/সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং মানবধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এই কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের জন্য সমাজে দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অক্ষর জ্ঞান দান, উন্নয়ন শিক্ষাদান, সেশনে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ বিবেক বুদ্ধি জাগ্রতকরন প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন করা হয়। এই কার্যক্রমে দরিদ্রদের অংশগ্রহন আশা ব্যাপক হয় নি (চৌধুরী ও রহমান, ১৯৯৯:২১৫)।

পরবর্তীতে বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আশা উপলব্ধি করে যে, আর্থিক ক্ষমতায়নই হচ্ছে জনগনের উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি। এমন

কি সামাজিক উন্নয়নের প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ফলে ১৯৯১ সালে আশার উন্নয়ন কার্যক্রম ও কৌশলের ক্ষেত্র পরিবর্তন আনা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে আশার মূল কার্যক্রম হয় শিক্ষা, প্রশিক্ষন, সচেতনতা সৃষ্টি, ঋণ সহায়তা দানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা।

আশার উদ্দেশ্য

আশার প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ-

১. তৃনমূল পর্যায়ে দরিদ্রদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলে অভ্যন্তরীন ও বহি:সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২. দরিদ্রদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩. উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

৪. অব্যবহৃত এবং ঋণ-ব্যবহৃত মানব সম্পদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা

৫. স্থানীয় মহাজনদের উপর জনগনের নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য বিকল্প ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা।

আশার কার্যক্রম

বর্তমানে আশা প্রধানত চারটি কার্যক্রমের মাধ্যমে এর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।

১. তৃনমূল পর্যায়ে দরিদ্রদের সংগঠন গড়ে তোলাঃ এই কার্যক্রমের আওতায় আশা গ্রামীন দরিদ্রদের নিয়ে দল গঠন করে তাদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহন করে। যাদের মাসিক আয় ১২০০ টাকার অধিক নয় তারাই আশার সেবা গ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত হন। তবে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তৃনমূল পর্যায়ে সাধারণত ২০ সদস্য সমন্বয়ে একটি করে দল গঠন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২. সচেতনতা সৃষ্টিঃ আশা ঋণ প্রদানের পূর্বশর্ত হিসেবে উন্নয়ন শিক্ষায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে এই সচেনতা সৃষ্টি করে। এসব শিক্ষার মধ্যে দলীয় শৃঙ্খলা, দলীয় সংহতি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান দান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩. সঞ্চয় গড়ে তোলাঃ আশা সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে এই টার্গেট গ্রুপকে আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্ধুদ্ধ ও সহায়তা করে থাকে। সঞ্চয়ের মাধ্যমে দলীয় সদস্য প্রথমত তাদব মূলধন গঠন করে এবং পরবর্তীতে আশা থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পায়। সদস্য/সদস্যাবা সপ্তাহে পাঁচ টাকা হারে সঞ্চয় করে থাকে।

৪. আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পে ঋণ প্রদানঃ দিরদ্রদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে উপার্জনমূলক কাজের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা এই ঋণদান কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। এ পর্যন্ত আশা ২,৫০,০০০ দলীয় সদস্য/সদস্যাকে ঋণ প্রদান করেছে। এই ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৯ ভাগ (চৌধুরী ও রহমান, ১৯৯৯:২১৬)।

৬.৬.৪ প্রশিকা: মানবিক উন্নয়ন সংস্থা

১৯৭৬ সাল থেকে প্রশিকা প্রশিক্ষণ (প্র), শিক্ষা (শি) ও কাজ (কা)- এই তিন মূল দর্শনের উপর ভিত্তি করে গ্রামীন দরিদ্রদের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রশিকা বাংলাদেশের অন্যমত বৃহৎ এনজিও হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামের খেটে খাওয়া শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র কৃষক ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি প্রশিকার টার্গেট গ্রুপ। এছাড়া শহরের কম মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিক, দরিদ্র মহিলা, যুবক-যুবতীরাও প্রশিকার সেবার আওতাভুক্ত। বর্তমানে ৪০ লক্ষ দরিদ্র মানুষ ৩৮ হাজার দলের মাধ্যমে প্রশিকার সেবা গ্রহন করছে।

প্রশিকার উদ্দেশ্য

দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ব্যাপক ও নিবিড় অংশগ্রহনমূলক টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা প্রশিকার মূল লক্ষ্য। এছাড়া প্রশিকার উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে।

১. সমাজ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করা।

Dhaka University Institutional Repository

২. পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বৃক্ষরোপন কার্যক্রম পচািলনা।

৩. মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধিকরা।

৪. সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

৫. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণের মধ্যে গনতন্ত্রের চর্চা ও অনুশীলন বাড়ানো।

প্রশিকার কার্যক্রম

১. দল গঠন ও উন্নয়ন শিক্ষাঃ ১৫-২০ জন গ্রামীন পুরুষ বা মহিলা সমন্বয়ে একেকটি দল গঠনের মাধ্যম প্রশিকা কার্যক্রম শুরু করে। এরপর সদস্য/সদস্যাদের উন্নয়ন শিক্ষা প্রদান করা হয়। উন্নয়ন শিক্ষার মধ্যে রয়েছে মানব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং গনসংস্কৃতি বা জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা। এসবের মাম্যমে উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয।

২. কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিঃ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির মধ্যে কৃষি, সেচ, পশুপালন, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ, রেশম কর্মসূচি, হাঁস মুরগি পালন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, স্যামাজিক বনায়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই কার্যক্রমে প্রশিকা এ পর্যন্ত ৮৯৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৩,৫০,০০০ এর অধিক লোকের কর্মসংস্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সর্বক্ষেত্রেই মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয।

৩. শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচিঃ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশিকা চার ধরণের কার্যক্রম করেছে। এর মধ্যে রয়েছে (১) বয়স্ক শিক্ষা (২) ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য বাবা মাকে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি (৩) আট বছরের বেশি বয়সী মেয়েদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি এবং (৪) নিরক্ষরদের জন্য গ্রাম পাঠচক্র কর্মসূচি। আর স্বাস্থ্য-পুষ্টি শিক্ষা, টিউবয়েলের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থাকরন, কম খরচে স্যানিটারী ল্যাটিন স্থাপন, সামাজিক বনায়ন, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষাকারী কৃষি কর্মসূচি প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া শহরে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, গ্রামীন

Dhaka University Institutional Repository

> গৃহায়ন কর্মসূচি এবং দুযোর্গ প্রস্তুতি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্ত বায়নের মাধ্যমে প্রশিকা দরিদ্রদের কল্যাণে কাজ করছে (চৌধুরী ও রহমান, ১৯৯৯:২১৭)।

প্রধান প্রধান এনজিও ছাড়াও দেশের প্রায় ১৫ শ এনজিও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। এই ঋণের পরিমাণ ২৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রধান দুটি এনজিও ব্র্যাক ১১ হাজার কোটি টাকা এবং আশা ৯ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। বড় তালিকাভুক্ত অপর ৭টি এনজিও প্রশিকা, কারিতাস, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসএস, শক্তি ফাউন্ডেশন, বিইউআরও এবং আর ডিআরএসের অংশ ৪ হাজার কোটি টাকা। অবশিষ্ট ৩ হাজার কোটি টাকা মাঝারি ও ছোট আকারের এনজিওদের বিনিয়োজিত ক্ষুদ্রঋণ। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণের আওতায় উপকৃত জনসংখ্যা দেড় কোটি। এ দেড় কোটির মধ্যে ১ কোটি ৩০ লাখ মহিলা এবং মাত্র ২০ লাখ পুরুষ।

১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের পর দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্যে এনজিও কার্যক্রম চালু করা হয়। প্রথমদিকে পরিবারে প্রধান পুরুষকেই ক্ষুদ্র ঋন দেয়া হত। তবে আদায়ের হার ছিল দুঃখজনক। এনজিও কার্যক্রম নিয়ে মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে পর্দার আড়াল থেকে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণে আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এতে সুফল পাওয়া যায়। ৮০ দশকের শুরুতে মহিলাদের পরিবার প্রধান বিবেচনা করে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণের বিস্তার ঘটতে থাকে। ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে এখন তা সারাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। জানা যায় ক্ষুদ্র ঋণের সঠিক ব্যবহার এবং ঋনের কিস্তি ফেরত দানের ক্ষেত্রে শতকরা ৯৫ ভাগ সাফল্য মহিলারা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে আদায়ের হাত শতকরা ৭০ ভাগ। দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও গত তিন দশকে ক্ষুদ্র ঋন লেনদেন গোটা দেশ জুড়ে এক নীরব বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। বদলে গেছে গ্রাম বাংলার দৃশ্যপট। আগে যেখানে মাটির ঘরও ছনবাঁশের বেড়ায় ঘরে দারিদ্র্য প্রকট ছিল, এখন সেখানে টিনের বেড়া ও টিনের ছাউনি ঘর অতীতের বিমলিন দৃশ্য পাল্টে দিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী জাগরণ বলতে যা বুঝায়, মাইক্রো ক্রেডিট সমিতিভুক্ত যে কোন একটি গ্রামে গেলেই তা পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোতে এনজিওদের পাশাপাশি জিওবির (সরকারি প্রতিষ্ঠান) ভূমিকাও লক্ষণীয়ভাবে বিস্তার ঘটেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং অনু বিভাগ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিএমইটি, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য অধিদপ্তর ও পশু সম্পদ অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিসিক ও সিরোটসি ট্রাষ্ট, কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের তাঁত বোর্ড মোট ১৭ টি জিওবির মাধ্যমে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৮৩ ভাগ।

সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক এ ৬ টি ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯৫ শতাংশ এবং সুবিধা প্রাপ্তদের সংখ্যা ১০ লাখ। এছাড়া বেসরকারী খাতের বেসিক ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, সোশ্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক, ইসলামি ব্যাংক এবং আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯৮শতাংশ। ১৯৯৮ সালে সরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত কর্মসংস্থান ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে ১২০ কোটি টাকা এবং আদায়ের হার ৭৬ শতাংশ।

সরকারি ও বেসরকারিভাবে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক রূপচিত্র পাল্টাতে থাকলেও ৪ কোটি মানষ নিরক্ষর এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে ৬ কোটি মানুষ। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়ন কৌশলপত্র পিআরএসপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.৭ নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নে এনজিওর কর্মসূচি

বাংলাদেশের সংবিধান নারী ও পুরুষ সমান মর্যাদার কথা ঘোষণা করলেও এদেশের পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে অধস্তন, পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত করে রেখেছে। সমাজে নারী বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। নারীর প্রতি বৈষম্য বিবেচনায় না এনে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয় বলে উন্নয়নবিদদের ধারণা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উন্নয়নের বিভিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নারীর প্রতি অংশগ্রহণে, সম্পদে, পছন্দে এবং সুযোগে বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট এবং এ অবস্থা পরিবারের ভিতরে ও বাইরে সমানভাবে দৃশ্যমান। রাষ্ট্র এবং তার সকল প্রতিষ্ঠান নানাভাবে লিঙ্গীয় বৈষম্য লালন করে চলেছে এবং পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার উদ্দেশ্যে নারী অধস্তনতাকে টিকিয়ে রাখছে। ফলে সমাজের অগ্রসরতা ও জাতির উন্নতির জন্য নারীর উন্নয়নকে নারী পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টিকে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। উন্নয়ন কর্মকান্ড বিস্তৃতির সাথে সাথে প্রসারিত হচ্ছে নারী উন্নয়ন ও নারী পুরুষের সুসম সম্পর্কের ভাবনাটি। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি এনজিও সমূহের নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে (আহমেদ, ২০০২:২১১)।

এনজিওসমূহে তাদের কর্মসূচির অংশ হিসেবে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং নিজের অবস্থানের উন্নয়নের জন্য নারীর নিজস্ব কর্ম প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ব্র্যাক, প্রশিকা, গণসাহায্য সংস্থা, গ্রামীন ব্যাংক, আরডিআরএস, কারিতাস, বিএনপিএস, আইভিএস, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং আরো কিছু বেসরকারি সংস্থা নারীদের উন্নযনের ধারায় সম্পৃক্তকরণের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিভিন্ন সময় উন্নয়ন কর্মসূচি Women in Development (WID) কখনো Women and Development (WAD) এবং সম্প্রতি Gender and Development (GAD) নীতি অনুসরণ করে থাকে। নারী পুরুষের সমতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য কাঠমোগত সংস্কারের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। এ লক্ষ্যে নারীদের প্রশিক্ষণ সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি স্থান পায়। বিভিন্ন কর্মসূচি অনুসরণ করে জেন্ডার বিষয়ে বাংলাদেশে প্রায় তিন শতাধিক এনজিও কাজ করছে। এ সকল এনজিওর ক্ষেত্রে উন্নয়নের মূল টার্গেট হচ্ছে নারী।

বাংলাদেশে কার্যরত এনজিওসমূহ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের জন্য পাঁচটি পথ গ্রহণ করেছেন যার মাধ্যমে নারীকে দারিদ্র্যমুক্ত করা যাবে। এগুলো হলো ঃ Welfare Approach, Equity Approach, Anti-poverty Approach, Efficiency Approach এবং Empowerment Approacr এনজিওসমুহে এসব এপ্রোচের আলোকে নারীর জন্য কল্যাণকর পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণদানের মাধ্যমে আয়

সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এনজিওসমূহ নারীর দারিদ্র্যতা দূরীকরণ ও নারীর উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত কমূসূচিগুলো গ্রহণ করে থাকে (আহমেদ, ২০০২:২১২)।

- সংগঠন নির্মান কর্মসূচি
- আয় ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি
- স্বাস্থ্য সেবা
- বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি
- পরিবার পরিকল্পনা
- এডভোকেসী কর্মকান্ড
- আইনগত সহায়তা
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনঃসৃজন কর্মসূচি
- গণ সংস্কৃতি কর্মসূচি
- কিশোর- কিশোরী শিক্ষা কার্যক্রম

সংগঠন নির্মান কর্মসূচি

এনজিও তাদের মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে এই ধারণাটিই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করে যে একজন মানুষ আসলে কোনে মানুষ নয়, সংগঠিত অনেক মানুষের মধ্য দিয়েই আসলে এই বিচ্ছিন্ন মানুষের সত্তা, আশা আকাঙ্খা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সংগঠনের বা গ্রুপের (দল) বিকল্প নেই। এনজিওসমূহ তাদের টার্গেট গ্রুপ(অধিকাংশ দরিদ্র্য নারী) সংগঠিত করার মাধ্যমে নারীর উদ্যোগ বৃদ্ধির জন্য ঋণ প্রদান ও দক্ষতা বিনির্মানে সচেষ্ট হয়। প্রাথমিক গ্রুপগুলোকে সমিতি নামে অভিহিত করা হয়। প্রশিকার প্রাথমিক গ্রুপের সংখ্যা ৮৭,৬৬০ টি, যার মধ্যে ৫১,৭১৩টি মহিলা গ্রুপ। ব্র্যাকের মোট সদস্য গ্রুপ ৯০,২৫০ টি, যার ৩.৩ মিলিয়ন সদস্যদের ৯৭.২ মহিলা। বিএনপিএস এবং কারিতাশের প্রাথমিক ও ক্ষুদ্র গ্রপ রয়েছে যেমন সচেতনতা বিনর্মান গ্রুপ, সঞ্চয় ও ঋণ গ্রুপ এবং সাধারণ গ্রুপ। এসব গ্রুপের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের সচেতনকরণ কর্মসূচির পাশাপর্শি পোলট্রি, গরু পালন, শাক-সবজিচাষ, মৌমাছি চাষ, মাছ চাষ, কৃষি, গাছ

Dhaka University Institutional Repository

লাগান, ক্ষুদ্র ব্যবসা স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তার উদ্যোগ নেওয়া হয় (আহমেদ, ২০০২:২২২-২২৩)।

৩.৭.২ আয় ও কর্মসংস্থান মূলক কর্মসূচি

এনজিও পরিচালিত আয় ও কর্মসংস্থান মূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ হচেছ। এর ফলে আংশিক হলেও সমাজে মহিলাদের অবস্থান শক্ত হয়েছে। কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়ার ফলে দরিদ্র নারীরা পারিবারিক গন্ডি থেকে বের হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। বেঁচে থাকা এবং টিকে থাকার সংগ্রামে অংশ নিতে পারছে। আয় বৃদ্ধিজনিত কর্মকান্ডের তালিকায় ক্ষুদে ব্যবসা, মুরগী পালন, গরু পালন, মাছ চাষ, কাঁথা সেলাই,জাল বোনা, গুটি পোকা চাষ ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। একটি গবেষণায় দেখা যায়, যেসব নারী একাধিক অর্থনৈতিক কর্মসূচির সাথে জড়িত তারা এক্ষেত্রে পরিবারের স্বামী অথবা অন্য পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে গৃহস্থালি কাজে সহযোগিতা নিচ্ছে। এসব মহিলাদের আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশই ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয় হচেছ, অবশিষ্টাংশ আপদকালীন সময়ে মেয়ের বিয়ে এবং টিউবওয়েল ও পায়খানা স্থাপনে ব্যয় হয়। কিন্তু এই ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনেক মহিলা তাদের উপার্জিত আয় স্বামীর হাতেই তুলে দিচেছন। তাদের ধারণা টাকা পয়সার লেনদেনের ব্যাপারে পুরুষের অভিজ্ঞতা মহিলাদের তুলনায় অনেক ভাল।

৩.৭.৩ ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগ

বেশির ভাগ এনজিও ঋণদানকে গ্রামীন মহিলাদের দরিদ্রচক্র থেকে বের হয়ে আসার উপায় ধরে নিয়ে টার্গেট গ্রুপের মধ্যে ঋণ প্রদান করে। গ্রামীন ব্যাংক ব্র্যাক, প্রশিকা, কারিতাস এবং বিএনপিএস তাদের কর্মসূচিতে ঋণের উপর জোর দেয়। ৮০ দশকের শুরুতে মহিলাদের পরিবার প্রধন বিবেচনা করে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণের বিস্তার ঘটতে থাকে। ক্রমাগত প্রছেষ্টার ফরে এখন তা সারাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় ক্ষুদ্র ঋণের সঠিক ব্যবহার এবং ঋনের কিস্তি ফেরত দানের ক্ষেত্রে শতকরা ৯৫ ভাগ সাফল্যে মহিলারা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রামীন মহিলাদের গরু কেনার ঋণ দেয়া হলে তারা পুরুষকে উক্ত ঋণের টাকা দিয়ে দেয় পুরুষ কর্তৃক বিনিয়োগের জন্য (আহমেদ,২০০২:২২৪)। ফলে নারী ঋণ গ্রহীতা কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হচেছ। এনজিওর কিস্তি জিম্মাদার হিসেবে নারী পুনরায় অসহায় হয়ে যাচ্ছে।

৩.৬.৪ স্বাস্থ্য সেবাও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে এনজিওদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে ব্র্যাক এবং প্রশিকা অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করছে। কারণ এরা মনে করে সুস্বাস্থ্য হচ্ছে দরিদ্র মহিলাদের অন্যতম সম্পদ যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। দরিদ্রতাই নারীকে স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত করে, এ লক্ষ্যে প্রশিকা এবং ব্র্যাক চালু করেছে 'স্বাস্থ্য শিক্ষা' এবং স্বাস্থ্য অবকাঠামো বিনির্মান প্রকল্প। স্বাস্থ্য শিক্ষার অন্যতম কৌশল হচ্ছে নারী স্বাস্থ্যের উন্নয়ন যা দরিদ্রদের রোগাক্রান্ত প্রবণতাকে সীমিত করবে। এজন্য স্বাস্থ্য প্রশিক্ষন কোর্স সমন্বিত পুষ্টি বাস্তবায়নের প্রকল্প নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য অবকাঠামো প্রকল্পে নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, আরসেনিক সচেতনতা অন্যতম। একই সাথে ব্র্যাক নারী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি Women Health and Development Program (WHDP) নামে নিরাপদ মাতৃত্ব, গর্ভবতী এবং দুগ্ধ প্রধানরত মহিলাদের পুষ্টি সচেতনতার সাথে সাথে যক্ষা এবং শ্বাসকষ্ট রোগের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ৩১ বিলিয়ন লোকের মধ্যে ৫.৫ মিলিয়ন সক্ষম মহিলাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এনজিওদের কর্মসূচি নিম্নরূপঃ

- মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা
- প্রসূতি পরিচর্যাও মাতৃসেবা কেন্দ্র,
- ধাত্রী প্রশিক্ষণ
- জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লিনিক্যাল সুবিধা প্রদান এবং
- কৈশোর জীবনে শিক্ষা কার্যকম বাস্তবায়ন

এনজিওসমূহের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির অধীন জনসংখ্যা ২, ১, ১১, ২০, ৯৪৩ এবং দম্পত্তির সংখ্যা ৩৮, ৯৫, ১৬৪। সারাদেশে ১২, ৮১১ জন কর্মী এনজিওদের কর্মসূচিতে নিয়োজিত আছে (আহমেদ, ২০০২: ২৫)।

৩.৭.৫ বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি

বেশির ভাগ এনজিওর বয়স্ক স্বাক্ষরতা কর্মসূচি রয়েছে। ব্র্যাক, প্রশিকা, কারিতাস এ কর্মসূচিতে সুনাম অর্জন করেছে। প্রকৃত পক্ষে ব্র্যাক, প্রশিক

Dhaka University Institutional Repository

এবং জিএসএস এর নিজেদের প্রকাশিত বিশেষ বই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বয়স্কদের অক্ষর ও ভাষা শিক্ষাদানের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের সামাজিক সচেতনতার সৃষ্টির চেষ্টা করে। এই সৃজনশী উদ্যোগ নিরক্ষরতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে ব্র্যাক সরকারের সহায়তায় ৬,৭২০ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫ থেকে ৩০ বছরের ২,০১,৬০০ জনের মধ্যে (৭৫% মহিলা) এবং প্রশিকা ২৫,৪৩০ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫,৩৪,২১৩ (যার ৬৩% মহিলা) জনকে স্বাক্ষরতা ও সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

৩.৭.৬ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

নারীর অবস্থান পরিবর্তনে এনজিও পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলতার দাবি রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালিত হয় দলীয় সংগঠনের কাঠামোর আওতায়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট দলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে দলবদ্ধ থাকার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি এনজিওগুলোর মধ্যে প্রায় একই রকম মতাদর্শগত ধারণা থাকে যা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রচারিত হয় তাহলে সফল গ্রুপ কার্যক্রমের সম্ভাবনা থাকে। যেমন খুলনায় নারীরা চিংড়ি চাষীদের বিরুদ্ধে, নোয়াখালীতে ভূ-স্বামীদের বিরুদ্ধে ভূমিহীনদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা এবং পাবনার সাথিয়ায় ঘুঘুদহ বিলের দললের নেওয়া বিদ্যামান ক্ষমতা কাঠামোকে সফলভাবে মোকাবেলা করেছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি, অবহিতকরণ, ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এনজিও কর্মী এবং টার্গেট গ্রুপের নারীদের জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্বর্তনে উপযোগী একটি পদক্ষেপ। নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার পথে এ জাতয়ি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও মতবিনিময় খুবই গুরুত্বপূর্ন।

৩.৭.৭ এডভোকেসী এবং লবিং

বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত এডভোকেসী এবং লবিং নারী উন্নয়ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এনজিও সমূহের বিশ্বাস এই যে শুধুমাত্র তৃনমূল পর্যায়ের হস্তক্ষেপই নারী উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছায় না। তৃনমূল পর্যায়ে নারীর ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য বিদ্যমান নীতির পরিবর্তন অবশ্যক। এ কারনেই এনজিওসমূহ এডভোকেসী এবং লবিংকে তাদের কর্মসূচিতে অন্তভূক্ত করেছে যা সরকারের নীতি নির্ধারকের নারী বিষয়ক উপলব্ধিতে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে

ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা, সেমিনার সিম্পোজিয়াম, মিটিং, র‍্যালী, প্রদর্শন, বিতর্ক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়াও নারী বিষয়ক পোষ্টার, লিফলেট, বুকলেট, নিউজ লেটার এবং অডিও-ভিডিও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। বর্তমানে ব্র্যাক, প্রশিকা এবং বিএনপিএস বিশ্বজনীন পরিবারিক আইন, সিডও(CEDAW) , বেইজিং প্লাটফরম এগকশন, নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বৃদ্ধি, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ৯৯ এর ব্যবহার,বিশ্বব্যাংকের নীতিতে জেন্ডার ইস্যু এবং নারীর প্রতি সংবেদনশীল শিক্ষানীতির পক্ষে কাজ করছে (আহমেদ, ২০০২: ২২৭)।

৩.৭.৮ পরিবেশ সংরক্ষণ ও গণসংস্কৃকি কর্মসূচি

এনজিওরা পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রে নারীদের নিয়ে আসার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারিনে সরকারের সাথে যৌথভাবে তা বাস্তবায়ন কর্মকান্ড গ্রহণ করেছে। এনজিওর গনসাংস্কৃতিক কর্মকান্ড নারী সম্পর্কে প্রচলিত মূল্যবোধ পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে ব্র্যাক, প্রশিকা এবং বিএনপিএস গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরে সমাধানের উপায় তুরে ধরছে। বিনোদনের কাইরেও নারী নির্যাতন, যৌতুক ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনগনকে সচেতনকরণ কর্মসূচিতে এসব কার্যক্রম উল্লেযোগ্য অবদান রাখছে। এ পর্যন্ত ব্র্যাক ৮৩ টি গ্রুপের মাধ্যমে ১.৫৫৮৩ টি নাটক এবং প্রশিক্ষা ১২১টি গ্রুপের মাধ্যমে ৪৯৩টি নাটক মঞ্চস্থ করেছে।

কিন্তু এক সকল নাটকের মাধ্যমে সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ধীর গতিতে হতে থাকে। প্রদর্শিত নাটক থেকে বাস্তবতার অনেক তথ্য পেলেও নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করার মানসিকতার সৃষ্টিতে তা সামান্য অবদান রাখছে।

৩.৭.৯ শিক্ষা কর্মসূচি: কিশোর-কিশোরী শিক্ষা

দরিদ্র মেয়েদের শিক্ষার লক্ষ্যে এনজিওদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। প্রশিকা এবং ব্র্যাক তাদের সদস্য গোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বা ননফরমাল প্রাইমারী এডুকেশন(NFPE) এবং বয়স্ক শিশুদের মৌলিক শিক্ষা অর্থাৎ Basic Education for Older children(BEOC) বা কিশোর কিশোরীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করে। বিশেষ করে দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষাকে নিশ্চিত করাই এই দুই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (NFPE) কর্মসূচিতে ঝড়ে পড়া বা ড্রপআউট ছেলেমেয়ে যাদের বয়স ৮ থেকে ১১ এবং শিশুদের মৌলিক শিক্ষা (BEOC) কর্মসূচিতে ১১ থেকে ১৪ বছরের মেয়েদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ব্র্যাকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬৬% মেয়ে এবং শিক্ষকদের মধ্যে ৯৭% মহিলা অন্তর্ভূক্ত থাকে। সরকারি প্রাথমিক স্কুলের তুলনায় ব্র্যাকের স্কুলের গুনগত মান অধিক হওয়ার কারনে ব্র্যাকের স্কুলসমূহ গ্রামের মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ব্র্যাক অবকাঠামোগত উন্নয়নে মাত্র ৩০ শতাংশ অপরদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ অর্থ খরচ করে। কিন্তু দেখা যায় যে ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ উপকরণ ও কৌশল উন্নত হওয়া সত্ত্বেও ব্র্যাক থেকে সরকারি স্কুলে যাওয়ার পূর্বেই অনেকে ঝরে পড়ে (আহমেদ,২০০২: ২২৮)।

৩.৭.১০ নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও প্রতিষ্ঠান নির্মান

নারীর দারিদ্রতা দূরীকরণ ও নারী উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা হলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া নারী মুক্তি সম্ভব নয়। এজন্য এনজিওসমূহ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৯০ ও ১৯৯৬ এর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এবং ১৯৯৭ ও ২০০৩ সারে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহন করে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এনজিওর অনুপ্রেরণায় বিশেষ করে ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক, বিএনপিএস নারীদের প্রার্থী হতে অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে। এতদসত্ত্বেও লক্ষ্য করা যায় যে, প্রার্থী বাছাই ও ভোটদানের ক্ষেত্রে এনজিও এং স্থানীয় প্রভাবশালীরা নির্বাচনকালে স্ব-স্ব স্বার্থে নিজেদের মাঝে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এছাড়া স্থানীয় নির্বাচনে নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রচলিত বংশতন্ত্র, স্থানীয় ক্ষমতা বিন্যাস, দাতা গ্রহীতা সম্পর্ক ভোট প্রদানে প্রভাব বিস্তার করে (আহমেদ, ২০০২:২২৯-২৩০)।

৩.৬.১১ মানবাধিকার ও আইন সহায়তা

এক্ষেত্রে এনজিওসমূহ যেসব কার্যক্রম গ্রহন করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- মানুষকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা
- বিভিন্ন আইন সম্পর্কে সচেতন করা.

Dhaka University Institutional Repository

• ঘুষ, দুর্নীতি ও যৌতুকের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা

• ফতোয়াবাজ ও মৌলবাদিদের বিরুদ্ধে সচেতনতা জাগ্রত করা।

• নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা এবং ভোটার শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা, এবং

• দুঃস্থ মহিলা ও তালাক প্রাপ্তদের আইনী সহায়তা প্রদান।

এছাড়াও মানসিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন, গনমাধ্যমে প্রচারমূলক কার্যক্রম, যুব উন্নয়ন ও ধর্মীয় বিষয়ে অবগতকরন কর্মসূচি রয়েছে। এনজিওদের সকল প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য দরিদ্র মানুষের নিজেদের চেষ্টার মাধ্যমেই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো। অর্থাৎ সমাজে তাদের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা, বিশেষ করে নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। এনজিওরা নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি রয়েছে। এসেই সাথে দরিদ্র নারীদের উৎপাদিত পন্যের ন্যায্য মূল্য ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার পাশাপাশি শ্রমের জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করাটাই ছিল অন্যতম কর্মসূচি। আর একটি বিষয়ে এনজিওরা জোর দেয় তা হলো মহাজনী ঋনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ব্যাংক বা প্রাতিষ্ঠানিক ঋন প্রদানে তাদের জন্য সহায়ক পরিবেশ গঠন করা। এভাবে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হবে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মধ্যে দরিদ্রদের সংগঠিত করার বিষয়টাও জরুরি। তাদের সংগঠিত করতে এনজিওর তৃনমূল সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ইতোমধ্যে ৫০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। দরিদ্র পরিবারের প্রায় ১ কোটির মতো মানুষ এই সংগঠনের আওতায় এসেছে। এদেরকে কার্যকর সাক্ষরতায় আনতে চালু করা হয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি, যার মাধ্যমে বয়স্করা লিখতে, পড়তে এবং হিসেব করতে পারবে। এছাড়া দরিদ্র শিশুদের মধ্যে যারা লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছে তাদের জন্য 'অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে প্রতি ৩০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক নিয়োজিত আছেন। ঝড়ে পড়াদের অনেকেই এখন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মাধ্যমিক স্কুলে পড়তে যাচ্ছে। ব্যাপকতার দিক দিয়ে এটি সরকারি স্কুলগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ড্রপ আউটের হার যেখানে ৪০ ভাগ সেখানে অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র ২ ভাগ। এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়টি অতিক্রম করলেই সে ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনে চলার মতো লিখতে, পড়তে এবং অংক কষতে পারে।

সামাজিক ক্ষমতায়নের মধ্যে আরও আছে দরিদ্রের স্বাস্থ্য সুবিধা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা। এছাড়া শিশুদের ৬টি মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে টিকাদানে এনজিওদের গৃহীত কার্যক্রম অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে। ৮১ এর দিকে শিশুদের টিকাদানের হার ছিল মাত্র তিন ভাগ। সেখান থেকে বর্তমানে প্রায় ৮০ ভাগের মতো টিকাদানের সাফল্য এসেছে। তাছাড়া পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে সরকারের প্রচেষ্টার সঙ্গে এনজিওরা ও একটা বড় অবদান রেখেছে। স্বাধীনতার পর আমাদের জন্মহার ছিল ৩.২ ভাগ। সেখানে থেকে নেমে জন্ম হার দাঁড়িয়েছে ১.৭ ভাগ। এগুলোকে বলা যায় ব্যাপক সামাজিক ক্ষমতায়ন।

নারীদের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নারীরা ঘরে বাইরে উৎপাদনশীল কাজে অংশ নিতে পারছে। এর ফলে নারীদের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারে ফিরে আসছে শান্তি ও নিরাপত্তা। এর একটি বড় দিক হচ্ছে তালাকের পরিমান হ্রাস। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কিছুটা হলেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রায় ১০ হাজারের মতো নারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল তার মধ্যে ৪ হাজার নারী জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

আজ সারা বিশ্ব উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীরা অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। পৃথিবীর অর্ধেক শ্রমশক্তি নারী সমাজকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রাখলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। নারীরা কাজ করতে পারে, কাজ করার ক্ষমতা আছে। নারীরা সঠিক নির্দেশনা পেলে তাদের যোগ্যতা প্রমান করতে পারে তার উদাহরন বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারীর সুপ্ত পদচারনা। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে শুরু করে প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়সহ দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা তাদের দক্ষতা প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে বৈদশিক মুদ্রা অর্জন, শিক্ষার ক্ষেত্রে, দেশের অর্থনীতিতে নারীর অবদান অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে বেশি। মোট নারী শ্রমশক্তির দুই তৃতীয়াংশ কৃষিও কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতে, এক চতুর্থাংশ অন্যান্য কাজে এবং এক-দশমাংশ নিয়োজিত আছেন শিল্প খাতে। বর্তমানে নারীদের ভুমিকা সমাজে স্থবির নয় গতিশীল, কর্মক্ষেত্রে

নারীদের অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। তবে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে, সেটা অদৃশ্য। উৎপাদন মূলক কাজে নারীর অবদান ব্যাপক। তবে, জাতীয় আয়ে নারীর এই অবদানকে বিবেচনায় আনা হয় না। এর কারণ প্রক্রিয়াগত ত্রুটি।এ ত্রুটির অপসারণ অতি জরুরি। কেননা নারীর উন্নয়নে তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীর শ্রমশক্তির প্রকৃত মূল্যায়ন শ্রমশক্তিতে তার আরও দৃঢ় অংশগ্রহণ অপরিহার্য (সুলতানা, ১৪০৮:২০৩)।

৩.৮ বাংলাদেশের পরিকল্পনা সমূহে গৃহীত দারিদ্র্য নিরসন কৌশল

৩.৮.১ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (ক)দীর্ঘকালের দারিদ্র্য কমিয়ে আনা সমাজতন্ত্রের ক্রমোন্নয়ন, বৈদেশিক সাহায্যের, ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা (খ) ৫.৫% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিও সরবরাহ করা , মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা এর (গ) স্বনির্ভরতা অর্জন এর মাধ্যমে আর্থ সামাজিকব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। মুলত দারিদ্রহ্রাসের উদ্দেশ্য পরিকল্পনা প্রনেতারা উল্লিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু সঠিক পরিসংখ্যানের অভাব ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের তাদের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীলতা, জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈদোশিক বানিজ্যে পুঁজিবাদী দেশসমূহের চক্রান্ত, বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি। জ্বালানী তেলের মুল্য বৃদ্ধি, বৈদেশিক সাহায্যের অপ্রতুলতা। অভ্যন্তরীন সম্পদ সংগ্রহে ব্যর্থতা এবং ব্যবস্থা জনিত ত্রুটির কারণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। ফলে দারিদ্র্য নিরসন কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৩.৮.২ দ্বি- বার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৭৮ সালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বদলে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। আয় বন্টনে সমতা আনা,৫.৬% হাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন; খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন; জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনার মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পর্নতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও আগের মতই ছিল এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫.৬% এর স্থলে মাত্রে ৩.৫% অর্জিত হয়। ২৯ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি বিদ্যমান ছিল (সিদ্দিক, ১৯৯৩:২০৬)।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮.৩ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৮০-৮৫ সালের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, মৌলিক চাহিদা পূরন, অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নিরক্ষরতা দূর করা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস, স্বনির্ভরতা অর্জন, খাদ্য ঘাটতি কমানো এবং ৭-২% অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্যহ্রাস করার কৌশল গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৩.৮% অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়, খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ২০ লক্ষ টন, বেকারত্ব তেমন কমেনি। টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছিল, দ্রব্যমূল্যও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পক্ষান্তরে মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল অনেক কম। শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সামান্য কমানো সম্ভব হয়েছিল। অতএব, পরিকল্পনায় গৃহীত দারিদ্র্য নিরসনের কৌশল বাস্তবে ফলপ্রসু হতে পারেনি। মূলত মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা ঘটানো সম্ভব হয়নি।

৩.৮.৪ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৮৫-১৯৯০অর্থ বছরের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য দুরীকরণ, জনসংখ্যা বৃদ্বির হার কমানো, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন এবং অধিকহারে স্বনির্ভর হওয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশল গ্রহন করা হয়েছিল। গ্রামীন উন্নয়ন এবং সামাজিক খাতে বিনিয়োগ করার উপরেও এই পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায় অভ্যন্ত রীন সম্পদ সংগ্রহে চরম ব্যর্থতা, শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যা, প্রায় সর্বস্তরে দুর্নীর্তির প্রসার, অতিমাত্রায় প্রকল্প গ্রহন ইত্যাদি কারনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ৫.৪% হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আশা করা হলেও প্রকৃত পক্ষে তা হয় ৩.৮%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার১.৮% কমিয়ে আনারলক্ষ্য থাকলে ও প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য মাত্রা কিছুই অর্জিতহয়নি।

৩.৮.৫ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৯০ সালের ১লা জুলাই থেকে বাংলাদেশে সুচিত হয়েছে দেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)।এ পরিকল্পনা দলিলে দাবী করা হয়েছে যে, একটি বিশ বছরে মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিল্পনার (১৯৯০-২০১০) অংশ হিসেবে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাই যদি হয়তবে প্রথমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটি প্রণীত হওয়া প্রয়োজন ছিল এবং তার সুত্র ধরে প্রনীত হওয়া উচিত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। কিন্তু কোন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা(১৯৯০-২০১০)এখন ও জনসমক্ষে উপস্থিত হয়নি। উল্লেখ্য তৃতীয়, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ওপর চিন্তা-ভাবনা বলে একটি পুস্তিকা পরিকল্পনা প্রনয়ন কালেও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কমিশন তৈরি করেছিল। কিন্তু পরর্তীকালে তাব কোন খবর পাওয়া যায়নি।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ক) অর্থনেতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, ৫% হারে GDP এর প্রবৃদ্ধির হার আশা করা হয়েছে। খ) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন করা এবং গ) স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

৩.৮.৫১ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল সমূহ

দারিদ্র্য দূরীকরনে প্রাধান্য দিয়ে এই পরিকল্পনায় অন্যান্য অর্থনেতিক সমস্যা দূর করারএবং গতিশীলতা সঞ্চারিত করার লক্ষে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেশ কিছু কৌশল বেছে নেয়া হয়েছে। এই কৌশল সমূহ দুই ভাগে বিভক্তঃ সাধারণ কৌশল ও সুনির্দিষ্ট কৌশল (সিদ্দিক, ১৯৯৩:২০৭)।

৩.৮.৫২ সাধারন কৌশল

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সকল সাধারন কৌশল অবলম্বন করারকথা বলা হয়েছে, তার বিস্তারিত আলোচনা করাহলো ঃ

ক) খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় সাথে আর্থসামাজিক শ্রেণীভিত্তিক পরিকল্পনার সমম্বয় প্রচলিত খাতভিত্তিক পরিকল্পনা দেশের জনগন বিচ্ছিনভাবে ছড়িয়ে থাকে। সেখানে তাদেরকে গোষ্ঠীগত ভাবে চিহ্নিত করা যায় না। গোষ্ঠীভিত্তিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য জনসাধারনকে সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ও তাদেরকে পরিকল্পনায় পরিধি থেকে পরিকল্পনার কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়। এই জন্য খাতভিত্তিক পরিকল্পনার সাথে গোষ্ঠীভিত্তিক পরিকল্পনা সম্পৃক্ত করলে দারিদ্র্য বিমোচন ও একই সঙ্গে দ্রুত অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা বেশি থাকে । এই দেশের সকল নাগরিককে দশটি আর্থ সামাজিক গোষ্ঠীতে ভাগকরা হয়েছে।

১) ভূমি কৃষি শ্রমিক

২) ক্ষুদ্র কৃষক (০.০-১.৫ একর জমি)

৩) মধ্যম কৃষকঃ মালিক প্রজা (১.৫-৫.০ একর জমি)

৪) মধ্যম কৃষক মালিক কৃষক (১.৫-৫.০ একর জমি)

৫) বৃহৎ কৃষক (৫.০-১০.০ একর জমি)

৬) অত্যন্ত বৃহৎ কৃষক (১০ একরের বেশী জমি)

৭) গ্রামীন অসংগঠিত দল (অকৃষি কাজে নিয়োজিত গ্রামীন দরিদ্র জনগন)

৮) গ্রামীন সংগঠিত দল (অকৃষি কাজে নিয়োজিত গ্রামীন ধনী জনগন)

৯) শহরে অসংগঠিত দল (অকৃষি কাজে নিয়োজিত শহুরে ধনী জনগন)

১০) শহরে সংগঠিত দল (অকৃষি কাজে নিয়োজিত শহুরে ধনী জনগন) (সিদ্দিকি, ১৯৯৩:২০৮)।

ভূমিহীন,ক্ষুদ্র কৃষক গ্রামীন ও শহুরে অসংগঠিত শ্রেনীর লোকেরা দারিদ্র্য-পীড়িত এবং বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহন করে এই ৫০% ভাগ লোকের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হবে। বিশেষ বিশেষ গ্রুপের জন্য Mirco plan তৈরী করে তা Marco plan এর সাথে সমন্বয় করা হবে। যেমন ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে গ্রামীন পরিকল্পনা তৈরি করা হবে যা থানা দেখাশোনা করবে এবং থানা পর্যায়ে পরিকল্পনার সাথে জাতীয় পরিকল্পনা ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করবে।

খ) আন্তখাত ভারসাম্য বিধান করাঃ বিভিন্ন খাতের মধ্যে পারস্পারিক নির্ভরশীলতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হবে। যেমন কৃষিও শিল্পের মধ্যে সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। যেমন বিদ্যুৎ, পরিবহন, যোগাযোগ, সেচনিষ্কাশন, ইত্যাদির প্রাধান্য দেয়া হবে।

গ) অর্থনীতিতে দক্ষতার সংকৃতি প্রবর্তনঃ Residual Factor যেমন কারিগরি উন্নয়ন মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা। আন্তঃখাতের সংযোগ বাইরের বাজার সম্প্রসারন এর মাধ্যমে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ব্যবস্থা করা।

ঘ) প্রকৃত খাতের উন্নয়নের সাথে কাঠামোগত সমন্বয় সাধন করাঃ দারিদ্রদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন এবং অর্থনীতির গতিময়তার সাথে সমন্বয় করে কাঠামোগত পরিবর্তন আবশ্যক হবে।

ঙ) মহিলাদেরকে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল চালিকা শক্তি হিসেবে নিয়ে আসাঃ শ্রেনীভিত্তিক পরিকল্পনায় মহিলারা গঠন মূলক ভূমিকা রাখতে পারে। নিয়োগ বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয় বিনিয়োগ, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে মহিলারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে। বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন বোর্ড। গ্রামীন ব্যাংক, স্বনির্ভর ঋণদান কর্মসূচি এনজিও অভিজ্ঞতায় মহিলাদের গুরুত্বপূর্ন অবদান দেখা গেছে (সিদ্দিকি, ১৯৯৩:২০৯)।

চ) রাজস্ব, আর্থিক ও বানিজ্যনীতির সংস্কার ঃ সঞ্চয়ও বিনিয়োগ বাড়ানোর উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। যে আর্থিক নীতিতে দারিদ্র্যদের হাতে সম্পদ স্থানান্তর করা যাবে এবং যাতে রাজস্ব আয়বৃদ্ধি পাবে তাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

ছ) প্রশাসনিক সংস্কারঃ বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সহায়ক নয়। তা অত্যাধিক নিয়মতান্ত্রিক । কাজেই ভবিষৎতে পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা হবে।

৩.৮.৫.৩ সুনির্দিষ্ট কৌশল

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চারটি সুনির্দিষ্ট কৌশলের মাধ্যমে দারিদ্র্যদূর করার কথা বলা হয়েছে। তার বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

ক) সরকারি খাতে বিনিয়োগ কর্মসূচির মাধ্যমে ঃ দারিদ্র্যও অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেনীর যাতে উপকৃত হয় এজন্য বার্ষিক উন্নয়ণ কর্মসুচিতে খাতভিত্তিক প্রক্রিয়ার সাথে শ্রেণীভিত্তিক প্রক্রিয়ার সমন্বয় করা হবে। দারিদ্র্য পুরুষ ও মহিলা উপকৃত হয় এ জাতীয় প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

খ) বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ঃ দারিদ্র্য লোকাদেরকে বেসরকারিখাতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋনের আওতায় আনা হবে।ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্য বিসিক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ,বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ।গ্রামীন ব্যাংক এর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে নতুন ঋণদান ব্যবস্থা চালু করা হবে।

গ) এনজিওদের মাধ্যমেঃ বেশ কিছু বছর ধরে বাংলাদেশে কিছু কিছু এনজিও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করছে। এনজিওরা দারিদ্যের আয়

Dhaka University Institutional Repository

একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌছে দেয়ার ক্ষমতা রাখে যা দারিদ্রদের স্বনির্ভর করবে। এ জন্য চলতি পরিকল্পনায় এনজিও দেরকে দারিদ্র্য শ্রেনীর উন্নয়নে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেয়া হবে।

ঘ) সম্পদ সংগ্রহ ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার মাধ্যমে গন অংশগ্রহন কৌশল ঃ অপরিকাল্পিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি কাম্য নয়। তাই চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পটরিকল্পনায় স্থানীয় পর্যাযে পরিকল্পনা প্রনয়ন করে স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে তাকে জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে (সিদ্দিকি, ১৯৯৩:২১০)।

৩.৮.৬ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৯৭-২০০২ অর্থ বছরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে দারিদ্র্য দূরীকরনকেই উন্নয়নের অন্যতম পন্থা ও লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। বাংলাদেশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পদ্ধতি বাতিল করে পিআরএসপি উদ্যোগ গ্রহন করেছে। পিআরএস উদ্যোগের সূচনা লগ্নে এই ধারাবাহিক পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অবসান ঘটে। পিআরএসপি দলিল বাংলাদেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসন প্রচেষ্টায় একটি নতুন অধ্যায়ের সুচনা করেছে যেখানে পূর্ববর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তে ২০০৬ থেকে২০০৯ অর্থ বছরের জন্য পিআরএসপি দলিলের আওতায় একটি ত্রি বার্ষিক চলমান বিনিয়োগ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সমুহ পরিচালিত হবে। নিম্নে পিআরএসপি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

৩.৯ দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) এর পটভূমি

পিআরএস একটি সাম্প্রতিক বিষয় হলেও পিআরএস উদ্যোগের শুরু হয় মূলত নব্বাই দশকের শেষ দিক থেকে। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বব্যাংকে এবং আইএমএফ দারিদ্র্য দেশগুলোর জন্য ঋন গ্রহনের একটি নতুন নির্দেশনা প্রনয়ন করে। উক্ত নির্দেশনায় সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতিটি দেশ, যারা বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ থেকে সহজ শর্তে ঋন এবং অতি ঋনগ্রস্ত দারিদ্র্য দেশ বা এইচআইপিসি উদ্যোগে (Heavily indebted poor countries- HIPC initiative) এর আওতায় ঋণ মওকুফের সুবিধা গ্রহন করতে চায়, তাদেরকে অংশগ্রহনমুলকভাবে প্রনীত এবং জাতীয়ভাবে গৃহীত একটি দারিদ্র্যনিরসন কৌশল বা পিআরএস প্রনয়ন করতে হবে। পরবর্তী বছরগুলোতে এ সকল দেশের যে কোনো প্রকার

ঋন সুবিধার প্রধান ভিত্তি হবে এই পিআরএস দলিলের প্রনয়ন ও তার বাস্তবায়ন। যা পিআরএসপি নামে সমধিক পরিচিত। আশা করা হয় যে, পিআরএসপি প্রনয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের সদস্য দেশসমূহ অংশীদারিত্ব মূলক প্রক্রিয়া অনুসরন করবে, যেখানে দেশের বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফসহ অন্য আন্তজার্তিক উন্নয়ন অংশীদারের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হবে। পিআরএসপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্বন্ধে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে এবং প্রতি তিন বছর পর পর পিআরএসপি হালনাগাদ করা হবে। পিআরএসপি দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত অবস্থা, সামাজিক নীতিমালা ও কর্মসুচি সমুহের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্য ও তার বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারন করবে। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং দারিদ্র্যনিরসনের লক্ষ্যে তিন বছরের ভিত্তিতে প্রনীত এ দলিল বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক প্রয়োজনের পরিমান ও কাঠামো এবং এজন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক আর্থিক সহায়তার সংস্থানের বিষয়টিও এতে নিরুপন করার কথা বলা হয় (ভট্টাচার্য ও আহমেদ, ২০০৬:২৭)।

৩.৯.১ নব্বই দশকের উন্নয়ন সাহায্য বিতর্ক

নব্বই দশকের শেষ দিকে বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগীদের বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয় তারই ফলে বর্তমান পিআরএসপি পদ্ধতির আবির্ভাব বলে অনেকে মনে করেন। ১৯৯৭ সালে এশিয়ায় যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় এবং ১৯৯৮ সালে যে বর্ধিত কাঠামোগত সংস্কার সুবিধা এর মুল্যায়ন হয়, তা আইএমএফ এর কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। এশিয়ায় অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয় ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে থাইল্যান্ডে এবং ক্রমান্বয়ে তা ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিন কোরিয়া, হংকং, মালয়েশিয়া, লাওস, ফিলিপিনসহ অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হয়। এ সংকট দেশগুলোর অভ্যন্তরীন বাজার, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ও শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধস নামে। অনেকেই এজন্য তৎকালীন সরকারসমূহ কর্তৃক আইএমএফ প্রস্তাবিত কঠোর মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির অনুসরনকে দায়ী করেন। এছাড়া সাব- সাহারার আফ্রিকার দেশগুলোর অর্থনৈতিক মন্দা এবং বহুল বিতর্কিত কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি (Structural Adjustment Programme-SAP)- এর ব্যর্থতার জন্য বিশ্বব্যাংক ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর গ্রহন যোগ্যতা নব্বই দশকের শেষভাগে উন্নয়ন বিতর্কের অন্যতম বিষয়ে পরিনত হয়। একই সময়ে দারিদ্র্য

দূরীকরনের বিষয়টিও উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে আলোচিত হতে থাকে। উল্লেখ্য যে বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০০-০১ এর মুল প্রতিপাদ্য বিষয়ও ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ।

অন্যদিকে প্রদত্ত বৈদাশিক সাহায্যের সুষ্ঠ ব্যবহারের বিষয়টিও দাতাদের নিকট প্রাধান্য পেতে থাকে। বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহারে সরকারি প্রতিষ্ঠান গুলোর দুর্ণীতিরোধে জাতীয় ভাবেই সুশীল সমাজ ও বেসরকারি মাধ্যমের অংশগ্রহনের একটি 'সমন্বিত উন্নয়ন পরিবীক্ষন কাঠামো' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। সব মিলিয়ে জাতীয় অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনো পরিকল্পনা যে সফল হতে পারে না, এই বিষয়টি তখন আবারো প্রমাণিত হয় (ভট্টাচার্য ও আহমেদ, ২০০৬:২৮)।

এরই প্রেক্ষাপটে উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয় ঋন গ্রহীতা দেশগুলোর জন্য একটি গ্রহনযোগ্য ও অংশীদারিত্বমুলক উন্নয়ন নীতি প্রবর্তনের বিষয়ে সম্মত হয়। একদিকে যেমন এর থেকে উদ্ভুত ফলাফলের জন্য বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ এককভাবে দায়ী হবেনা, অন্যদিকে তেমনি দাতাদের প্রদত্ত বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার পদ্ধতিকেও জাতীয়ভাবেই পরিবীক্ষণ আওতায় এনে দূর্নীতি হ্রাস করা সম্ভব হবে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাংক প্রধান উলফেনসন ১৯৯৯ সালের শুরুর দিকে সমন্বিত উন্নয়ন কাঠামো বা সিডিএফ (Comprehensive Development Frame work-CDFS) মডেলের প্রবর্তন করেন যা পিআরএসপি এর ভিত্তি রচনা করে।

৩.৯.২ সমন্বিত উন্নয়ন কাঠামো (সিডিএফ) থেকে পিআরএসপি'

'সমন্বিত উন্নয়ন কাঠামো' বা সিডিএফ হচ্ছে বিশ্বব্যাংক প্রনীত এক গুচ্ছ নীতিমালা যা এর সদস্য দেশগুলোর উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরন নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। সিডিএফ বিশ্বব্যাংকের একটি নতুন ধারনা হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা ব্যাংকের সাহায্য প্রদানকে কতগুলো মৌলিক নীতিতে আবদ্ধ করে। যেমন সিডিএফ এর আওতায় গৃহীত যেকোনো কর্মসূচিকে হতে হবে 'দেশীয় ভিত্তিতে প্রনীত' ফলপ্রদায়ী সমন্বিত 'অগ্রাধিকার নিরুপিত' 'অংশীদারিত্বমূলক' এবং 'দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিতে রচিত'। সিডিএফ কাঠামো দুভাবে পিআরএস উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করে। প্রথমত, এটি একটি নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন করে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু সিডিএফ কে বিশ্বব্যাংকের সদস্য দেশগুলোর ঋন গ্রহনের জন্য বাধ্যতামুলক করা হয়, সেহেতু সিডিএফ কাঠামোর ওপর নির্মিত পিআরএস মডেলকে সহজেই সদস্য

দেশগুলোরর মধ্যে গ্রহনযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়। উল্লেখ্য সিডিএফ কাঠামোর উল্লিখিত নীতিমালা গুলোই পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে প্রনীত পিআরএসপি সমুহের নির্দেশক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাবে সিআরএস মডেলের 'দারিদ্র্য দূরীকরন' লক্ষ্যটি মূলত এসেছে বিশ্বব্যাংকের 'দারিদ্র্য দূরীকরণও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা' বা পিআরআইএম কর্মসুচি থেকে যা ব্যাংকের প্রধান শ্লোগান দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব থেকে উদ্ভুত। উল্লেখ্য যে,সিডিএফ ছিল শুধু একটি ধারনাগত কাঠামো যার বাস্তবায়নের কোনো রুপরেখা তখনো ছিলনা। এ কারনে পিআরএসপিকে সিডিএফ কাঠামোর বাস্তবায়নের একটি রুপরেখা হিসেবে দেয়া হয় (ভট্টাচার্য ও আহমেদ, ২০০৬:২৯)।

৩.৯৩ আই পিআরএসপি এবং সিআর এসপি

১৯৯৯ সালেই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে 'এইচআইপিসি' উদ্যোগে এর আওতায় ঋন মওকুফ প্রত্যাশী এবং আইএমএফ থেকে সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তা প্রত্যাশী দেশসমুহকে পিআরএস মডেলের আওতায় একটি উন্নয়ন দলিল প্রনয়ন করতে হবে। দারিদ্র্য নিরসন কৌশলে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিএবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুলোর প্রতিফলন ঘটবে। জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর দারিদ্র্য নিরসন কৌশল প্রনয়নে তিনটি অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়। যথা- ১. দারিদ্র্যের স্বরূপ এবং কারন, ২. দারিদ্র্য নিরসনের সম্ভব্য সর্বোচ্চ অভিঘাত সৃষ্টিকারী পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করন এবং গ্রহন এবং ৩. পরিবীক্ষন এবং মুল্যায়নের জন্য উপযোগী সুচক নির্বাচন। বিশ্বব্যাংকের বিবেচনায় যেহেতু সকল সদস্য দেশ তাৎক্ষনিকভাবে পূর্নাঙ্গ পিআরএসপি প্রনয়নে সক্ষম নয়,তাই সদস্যদের সুবিধার্থে একটি সাময়িক দারিদ্র্য নিরসন কৌশল পত্র বা আইপিআরএসপি প্রনয়নে সুযোগ রাখা হয়। আইপিআরএসপি তে দারিদ্র্যের অবস্থা সম্পর্কে বিদ্যমান জ্ঞান এবং বিশ্লেষনের সারসংক্ষেপ থাকতে হবে এবং বিদ্যমান দারিদ্র্য নিরসন কৌশল বর্ণনা করতে হবে। অধিকন্তু আইপিআরএসপি-র দলিলে বর্নিত বিদ্যমান দারিদ্র্য নিরসন কৌশল থেকে পূর্নাঙ্গভাবে প্রনীত পিআর- -এসপি দলিল টি ব্যাপক অংশগ্রহনমূলক ভিত্তিতে প্রনয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত রূপরেখা থাকতে হবে। অর্থাৎ দেশের বিদ্যমান দারিদ্র্য নিরসন কৌশল বর্ণনার পাশাপাশি একটি সমন্বিত পিআর এসপি প্রনয়নে পূর্নাঙ্গ রোডম্যাপ থাকতে হবে।

৩.৯৪ উন্নয়ণ সাহায্যের শর্তরূপে পিআরএসপি

১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বিশ্বব্যাপী একটি পরামর্শ কর্মসুচী গ্রহন করে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যে ছিল চলমান এইচ আইপিসি উদ্যোগ-এর কার্যকারিতা বিষয়ে সদস্য দেশগুলোর সরকার ও সুশীল সমাজের মতামত গ্রহন করা। প্রাথমিকভাবে যদিও এইচআইপিসি মূল্যায়ন কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য ছিল ঋন মওকুফের স্বচ্ছতা ও প্রভাব নিরূপন, পরবর্তীকালে ঋণ মওকুফের সাথে দারিদ্র্য দূরীকরণের সম্পর্কে বিষয়টি আলোচনায় প্রাধান্য পেতে থাকে। এইচআইপিসি মূল্যায়র কর্মসুচি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফএ ঋনকে একটি একক শর্তের আওতায় নিয়ে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় একটি বর্ধিত ঋন মওকুপে কর্মসুচি (এইচআইপিসি-২) গ্রহন করা হয়, যেখানে সদস্য দেশগুলোর দারিদ্র্য দুরীকরনেব সাফল্যকে ঋন মওকুফের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে পিআরএসপি বাস্তবায়ন অধিকাংশ দরিদ্র দেশের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে দাড়ায়। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হলেও অতিঋন গ্রস্ত দরিদ্র দেশের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এই সফলতার জন্য বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর ঋন মওকুফ কর্মসুচিরও অন্ত র্ভুক্ত নয় (ভট্টাচার্য ও আহমেদ, ২০০৬:৩০)।

ক্রমান্বয়ে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর অধিকাংশ সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পিআরএসপি একটি একক পরিমাপে পরিনত হয়। আইএমএফ-এর দারিদ্র্য নিরসন ও প্রবৃদ্ধি সুবিধা বা পিআরজিএফ-এর অনুমোদন, পর্যালোচনা অথবা বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিকভাবে উন্নয়ন সংস্থা আইডিএ-এর আওতায় সহজ শর্তে ঋন প্রাপ্তি, সবকিছুই নির্ভর করে। আইপিআরএসপি, পিআরএসপি অথবা বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের সাফল্যের ওপর। তাছাড়া দেশ সমূহের জন্য প্রদত্ত সহায়তা কৌশল বা সিএএস প্রনয়ন এবং হালনাগাদ করার সময় এমনভাবে ঠিক করা হয় যেন তা পিআরএসপি / আইপিআরএসপি এবং সিআরএসপি-র ওপর প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের নিজস্ব যৌথ মূল্যায়ণ সহ পেশ করা সম্ভব হয়। ২০০২ সালের জুলাই থেকে পিআরএসপি-এর ভিত্তিতেই সকল আইডিএ ভুক্ত দেশে সিএএস প্রণীত হচ্ছে।

৩.৯৫ পিআরএসপি দেশে দেশে

২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বের মোট ৬০টি দেশ পিআরএসপি অথবা আইপিআরএসপি প্রনয়ন করেছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সহ ৫০টি

দেশ ইতোমধ্যে তাদের প্রথম পিআরএসপি প্রনয়ন করেছে এবং বাকি ১০টি দেশ আইপিআরএসপি প্রনয়ন করেছে।

পিআরএসপি প্রনয়নকারী দেশগুলোর মধ্যে ৯টি দেশ প্রথমেই সরাসরি পিআরএসপি জমা দিয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে উগান্ডা, ভুটান, নাইজেরিয়া, সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্র, মৌরিতানিয়া, বুরকিসা, ফাসো, পুর্বতিমুর, নেপাল এবং শ্রীলংকা। বাকি দেশগুলো প্রথমে আইসিআরএসপি জমা দেয় এবং পরে পূর্নাঙ্গ পিআরএসপি জমা দেয়। এদের মধ্যে মলদোভা প্রথমে দুইটি আইসিআরএসপি জমা দেয় এবং পরে পূর্নাঙ্গ পিআরএসপি প্রনয়ন করে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ি ২০০৬ সালের ৩১ জানুয়ারি মধ্যে ৩১টি দেশ পিআরএসপি বাস্তবায়নের প্রথম 'অগ্রগতি প্রতিবেদন' জমা দিয়েছে। তন্মধ্যে ১৫টি দেশ এ পর্যন্ত ২টি অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং ৬ টি দেশ ৩ টি অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিয়েছি। বুরকিনা ফাসো, নিকারগুয়া ও উগান্ডা এরই মধ্যে তাদের দ্বিতীয় মেয়াদের পিআরএসপি প্রনয়ন করেছে। বুরকিনা ফাসো ইতোমধ্যেই তাদের দ্বিতীয় পিআরএসপির- প্রথম অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

তবে পিআরএসপি প্রনয়নের দ্রুততা কোন দেশের সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়। অনেক দেশের ক্ষেত্রেই অতিদ্রুত পিআরএসপি প্রনয়ন তাদের প্রনীত দলিলের মান রক্ষা করতে পারেনি। কিছু দেশ বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ থেকে দ্রুত ঋন ছাড়করনের জন্য দ্রুত পিআরএসপি প্রনয়ন করেছে (ভট্টাচার্য ও আহমেদ, ২০০৬:৩১)। অন্যদিকে বেশ কিছু দেশ একটি দীর্ঘমেয়াদি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করার কারনে দেরীতে পিআরএসপি প্রনয়ন করেছে। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জটিলতা প্রায় সকল দেশের পিআরএসপি প্রণয়নকেই প্রভাবিত করেছে।

উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ প্রচলিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পদ্বতিকে বাতিল করে পিআরএসপি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অনেক দেশ তার পরিবর্তে তাদের প্রচলিত মেয়াদি পরিকল্পনা কর্মসুচিকেই পিআরএসপি কাঠামোতে একীভূত করেছে। উদাহরনস্বরূপ, নেপাল তাদের প্রচলিত মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় প্রনীত দশম পরিকল্পনাকেই পিআরএসপি হিসেবে জমা দিয়েছে। অন্যদিকে ভারত কোন নতুন পিআরএসপি প্রনয়নে অস্বীকৃতি জানায় এবং এই যুক্তি উথাপন করে যে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের চলমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেই দারিদ্র্য নিরসনের ইস্যুটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে।

৩.১০ বাংলাদেশ পিআরএসপি প্রনয়ন

দারিদ্র্যতা বাংলাদেশে প্রধান সামাজিক সমস্যা। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি সব সময়ই অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে। দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ হতদরিদ্র থাকা অবস্থায় সবল ও গতিশীর জাতীয় অর্থনীতির কথা ভাবা যায় না। দেশের দরিদ্র জনসংখ্যা দশ বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশ হ্রাস পাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ ২০১৫ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধেক আর গরিব থাকবে না। এই রূপ লক্ষ্যে নিয়া প্রনয়ন করা হয়েছে তিনসাল দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র।

বাংলাদেশ ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে তার প্রথম পিআরএসপি প্রনয়র করেছে। ২০০০ সালে ১৬ নভেম্বর তারিখে তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর সভাপত্বিতে একটি আইপিআরএসপি প্রনয়ন বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনার জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ এ বিশ্বব্যাংক ও আইএম এফ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সমন্বিত উন্নয়ন কাঠামো বা সিডিএফ-এর ওপর ভিত্তি করে প্রনীত দারিদ্র্য নিরসন কৌশল হবে সদস্য দেশগুলোর সকল প্রকার নমনীয় ঋন সহায়তা এবং ঋন মওকুফের ভিত্তি। এরই আলোকে বাংলাদেশের জন্য একটি আইপিআরএসপি প্রনয়ন পদ্ধতি বের করার লক্ষ্যে উক্ত সভায় সিডিএফ এবং খাতভিত্তিক কর্মসুচী এর ওপর একটি নিবন্ধ উপস্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে ২০০০ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে আইপিআরএসপি প্রনয়ন কার্যক্রম তদারকি করার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ইআরডি-এর সচিবকে সভাপতি করে সরকার একটি ১১ সদস্যবিশিষ্ট টাস্কফোর্স গঠনকরে (ভট্টাচার্য ও আহমেদ, ২০০৬:৩৩)।

এর প্রায় আড়াই বছর পর ২০০২ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশে সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা ইআরডি প্রথম একটি খসড়া আইপিআরএসপি প্রনয়ন করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তা বিতরন করে। মুলত "বাংলাদেশ" অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় কৌশল শিরোনামের এই খসড়া দলিলটি সম্পর্কে অন্যান্যদের মুল্যায়ন সংগ্রহই ছিল এর উদ্দেশ্য। ডিসেম্বর ২০০২ এ খসড়ার প্রাথমিক সংশোধন সম্পন্ন হয় এবং জানুযারি ২০০৩ এ একটি পরিবর্ধিত খসড়া সংস্করন প্রকাশ করা হয়। ৩১ মার্চ ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রথম আইপিআরএসপি চুড়ান্ত করা হয় এবং তা বিশ্বব্যাংকের পরিচালনা পর্যদে উথাপন করা হয়। ঐ বছর মে মাসে ঢাকাতে দাতাগোষ্ঠীর যে বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয় (বাংলাদেশে উন্নয়ন ফোরাম), সেখানে বাংলাদেশের আইপিআরএসপি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উল্লেখ্য যে মে ২০০৩ এরমধ্যেই বাংলাদেশের আইপিআরএসপি এ ওপর বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর যৌথ মূল্যায়ন শেষ হয়। এরপর ১৯ জুন ২০০৩ বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ এর বোর্ড আবডাইরেক্টরস এ দলিলটি উপস্থাপন করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের প্রথম আইপিআরএসপি প্রনীত ও গৃহীত হয়।

৩.১০.১ আইপিআয়এসপি থেকে পিআরএসপি

আইপিআরএসপি প্রনয়নে পরপরই বাংলাদেশের প্রথম পিআরএসপি প্রনয়নের উদ্যোগ গহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০০৩ বাংলাদেশ সরকারের সাধারন অর্থনীতি বিভাগ বা জিইডি কে জাতীয় দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট বা এনপিএফপি হিসেবে ঘোষণা করা হয় দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট এর মূল দায়িত্ব হয় আইপিআরএসপি-র বাস্ত বায়ন নিরীক্ষন করা এবং একটি পূর্নাঙ্গ পিআরএসপি তৈরি করা। পুরো প্রক্রিয়ার সমন্বয় ও নির্দেশনার জন্য সমসাময়িক কালেই গঠন করা হয় জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কাউন্সিল বা এনপিআরসি যা কিনা দেশের দারিদ্র্য নিরসন কৌশল প্রনয়নে সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারনী সভা।এই কাউন্সিলকে সহায়তা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবকে প্রধান করেও সাধারন অর্থনীতি বিভাগ বা জিইডি-র সদস্যকে সদস্য সচিব করে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি বা এনএসসি গঠন করা হয়। তৎকালীন আইপিআরএসপি-র বাস্তবায়ন এবং একটি পূর্নাঙ্গ পিআরএসপি-র তৈরির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় নীতিনির্ধারনী দিক নির্দেশনা দেবার জন্য এই কমিটিকে গঠন করা হয়। এ দুটি কাউন্সিল ও কমিটি যাবতীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদানের দায়িত্ব ও জাতীয় ফোকাল পয়েন্টকে দেওয়া হয় (ভট্রাচার্য ও আহমেদ, ২০০৬:৩৫)।

গঠনের প্রথম দুই মাসে স্টিয়ারিং কমিটি পিআরএসপি প্রণয়নের প্রাথমিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন কর্মকৌশল তৈরি ও অভ্যন্তরীন পরামর্শ সম্পন্ন করে। ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে জানুয়ারি ২০০৪ এর মধ্যে দারিদ্র্য নিরসন কৌশল সম্পর্কিত ১২টি বিষয়ের ওপর ১২টি বিষয় ভিত্তিক দল

Dhaka University Institutional Repository

গঠন করে এবং জাতীয় পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। ২০০৪ এর প্রথম নয় মাস জাতীয় ভাবে বিভিন্ন পরামর্শ সভা আয়োজন করা হয় একই সময়ে আইপিআরএসপি বাস্তবায়নে ওপর বিশ্বব্যাংকের ও আইএমএফ তাদের যৌথ মূল্যায়ন প্রদান করে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি প্রত্যক্ষভাবেও পিআরএসপি প্রনয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিতে থাকে। উল্লেখ্য, পিআরএসপি প্রনয়নের পূর্বেই সরকারকে উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি হতে একটি সিআরএসপি ম্যানুয়েল সরবরাহ করা হয়, যা অনেকাংশেই পিআরএসপি প্রনয়নের মুল নির্দেশিকা হিসেবে অনুসৃত হয়। অবশেষে সেপ্টেম্বর ২০০৪ পিআরএসপি-র প্রথম খসড়া প্রকাশ করা হয়। পিআরএসপি চুড়ান্ত খসড়া পরবর্তীকালে গত ১৬ অক্টোবর ২০০৫ প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি বা একনেক এর সভায় অনুমোদন লাভ করে।

৩.১১ বাংলাদেশের পিআরএসপি-র কাঠামো

বাংলাদেশে প্রথম দারিদ্র্য নিরসন কৌশল পত্র মূলত দেশের দারিদ্র্যের বিদ্যমান অবস্থা এবং তার কারন ও সমাধান অনুসন্ধানের একটি বিশ্লেষনধর্মী দলিল। এ দলিলে দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশের লক্ষ্য কৌশল ও সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠার এই দলিল আটটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনে দর্শন এবং প্রেক্ষাপটে ওপর আলোকপাত কর। এছাড়া পিআরএসপি প্রনয়নের প্রক্রিয়া, জাতিসংঘ, ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ও পিআরএসপি এ সামগ্রিক কাঠামো বিশ্লেষন এ অধ্যায়নের প্রধান আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের বতর্মান অবস্থা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দারিদ্র্যের গতি প্রকৃতি আয় বৈষম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে দারিদ্র্যের পরিমাপের প্রধান সুচক নিয়ে এ অধ্যায়ে বিস্ত ারিত আলোচনা করা হয়েছে (ভট্টাচার্য ও আহমেদ, ২০০৬:৩৯)। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্যনিরসন মধ্যে সম্পর্কেও চলমান বিতর্ক ও এ অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে।

বর্তমান পিআরএসপি প্রণয়নে যে অংশগ্রহন মূলক কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়, তার বিস্তারিত বনর্না দেওয়া হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। দারিদ্র্যে নিরসন কৌশলের মূল ভিত্তি ও ইস্যুগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। এ অধ্যায়ে আলোচনা করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে কিভাবে পুরনো অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষৎ লক্ষ্য নির্ধারন সম্ভব, কীভাবে বাস্তবায়নে ইস্যুগুলোকে দৃষ্টি গোচর করতে হয়, কর্মসংস্থান কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যনিরসনে ভিত্তি স্থাপন করে এবং কীভাবে নারী ও শিশুর অধিকার দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রাখে।

পিআরএসপি পঞ্চম অধ্যায়কে বলা যায় এ দলিলের সারমর্ম কারণ এ অধ্যায়নে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের একটি পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দারিদ্র্য বান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সামষ্টিক অর্থনেতিক পরিবেশ দরিদ্র্য বান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুপূর্ন খাতসমূহ, কার্যকর সামাজিকবলয়, মানব উন্নয়ন, সুশাসন পরিবেশ ও টেকশই উন্নয়ন ইত্যাদি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে একটি মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো দেওয়া হয়েছে। যা মধ্যমেয়াদী বা আগামী ২০০৮-০৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোর লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশ করে। সপ্তম অধ্যায়ে দরিদ্র নিরসনে প্রধান প্রধান কর্মসুচি বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রক্ষেপন করা হয়েছে, যদিও এখানে পিআরএসপি প্রকল্প সমূহের পরিবর্তে এমডিজি প্রনীত পুরণো তিনটি প্রকল্পের বাজেটই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পিআরএসপি-র সর্বশেষ অর্থাৎ অষ্টম অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে পিআরএসপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এছাড়াও সংযুক্তি হিসেবে একটি ছক দেওয়া হয়েছে। যেখানে পিআরএসপি বাস্তবায়নে প্রতিটি খাতের বর্তমান অবস্থান, অর্থবছর ২০০৫ থেকে অর্থবছর ২০০৭ পর্যন্ত সময়ের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা, অগ্রাধিকার এবং বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রনালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সন্নিবেশিত আছে।

৩.১২ বাংলাদেশের পিআরএসপির মূল বিষয় ও লক্ষ্যসমূহ

বর্তমান পিআরএসপি আটটি ক্ষেত্রকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনে জন্য তাৎপর্যপূর্ন হিসেবে অভিহিত করেছে। পিআরএসপি প্রনীত আটটি ক্ষেত্র হচ্ছে ১.কর্মসংস্থান ২. পুষ্টি ৩. মানসম্পন্ন শিক্ষা ৪. স্থানীয় সরকার ৫. মাতৃস্বাস্থ্য ৬ . পয়ঃনিস্কাশন ও বিশুদ্ধ পানি ৭. অপরাধের বিচার এবং ৮. (বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার) পরিবীক্ষণ (ভট্টাচার্য ও আহমেদ, ২০০৬:৪০)।

উল্লেখিত আটটি ক্ষেত্রকে ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে তা তাদের অগ্রাধিকার বা গুরুত্ব নির্দেশ করে না, বরং এই প্রতিটি ক্ষেত্রকেই

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমুহের নিজস্ব অপরিহার্যতা অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব এবং তাদের পারস্পারিক সম্পর্কের কারণে এই আটটি ক্ষেত্রকেই বাংলাদেশের সমন্বিত ও দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের চাবিকাঠি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত, একটি অনূকুল সামষ্টিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি যা একটি প্রবৃদ্ধি তাড়িত উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। এজন্য প্রয়োজন সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য, অধিকতর অভ্যন্তরীন বেসরকারি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ, ভারসাম্য পূর্ন বানিজ্য এবং দরিদ্র্য ও নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিতকারী একটি জাতীয় বাজেট।

দ্বিতীয়ত, প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় দরিদ্র-বান্ধব ফলাফলের সর্ব্বোচ্চ বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য কিছু কৌশলগত বিষয় নির্ধারন করা, যা কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ পল্লীর উন্নয়নে অবদান রাখবে।

তৃতীয় সমাজের দরিদ্র, বিশেষ করে নারীদের জন্য একটি নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টি করা যা তাদের আয় ও ভোগের যেকোন প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় হতে রক্ষা করবে।

চতুর্থত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি নিশ্চিত করার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

পঞ্চমত, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দরিদ্র, বিশেষত নারী এবং অন্যান্য বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহনের অধিকার ও তাদের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করা।

ষষ্ঠত, প্রকল্প বাস্তবায়নের সামর্থ্য বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রসার, দুর্নীতি দমন ইত্যাদির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

সপ্তমত, মৌলিক চাহিদার বিষয়গুলোতে সেবা প্রদানের বর্তমান ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

অষ্টমত, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য পিআরএসপিতে তিন বছর মেয়াদি (২০০৫-২০০৮) লক্ষ্য নির্ধারিন করে একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবকাঠামো বা এমটিএমফ ও একটি নীতি নকশা প্রনয়ন করা হয়েছে। সমগ্র প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন তদারকির জন্য একটি বাস্তবায়ন ও পরিবেক্ষন কাঠামোও এ দলিলে সন্নিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণাধীন গ্রাম

৪.১ গ্রামের অবস্থান

এমারগাও গ্রামটি ঢাকা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত। গ্রামটি ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত। কেরানীগঞ্জ উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে এমারগাও গ্রাম তারানগর ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত। গুলিস্থান থেকে বুড়িগঙ্গা ব্রিজের উপর দিয়ে কেরানীগঞ্জ উপজেলা হয়ে সড়কপথে এমাগাঁও গ্রামে যাওয়া যায়। ঢাকা শহর থেকে ওয়াশপুর যেয়ে বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে সড়ক পথে এমারগাও গ্রামে যাওয়া-আসা করা যায়। এমারগাও গ্রামের দক্ষিণে আটির বাজার। এটি কেরানীগঞ্জ উপজেলার নাম করা বাজার। সপ্তাহে দুদিন এখানে হাট বসে এবং কোরবানীর সময় এখনে বৃহৎ গরুর হাট বসে। এমারগাও গ্রামটি আটি বাজার সংলগ্ন। আটি বাজারের প্রধান সড়কের পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদী বয়ে গিয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদীর উপর ৫০ মিটার দীর্ঘ একটা ব্রিজের মাধ্যমে এমারগাও গ্রামের সাথে আটি বাজার সংযুক্ত। গ্রামটি আটি বাজার সংলগ্ন হওয়াতে এই গ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি আটি বাজারে অবস্থিত। এমারগাও গ্রামের অধিবাসীরা তাদের বাজার-হাট, শিক্ষা, অফিস, চিকিৎসাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ-কর্ম আটি বাজার এসে করে। এমারগাও গ্রামের উত্তরে লুটের চর গ্রাম, পূর্বে ঘাটার চর গ্রাম এবং পশ্চিমে কলমার চর গ্রাম। পূর্বে এমারগাও গ্রামের নাম ছিল হায়দার হাজীর গ্রাম। পরে গ্রামটির নামকরণ করা হয় এমারগাও গ্রাম। এই গ্রামটি পার্শ্ববর্তী লুটের চর ও জয়নগর গ্রাম থেকে উচু হওয়ায় বর্ষাকালে এখানে রাস্তা-ঘাট শুকনো থাকে এবং সড়কপথে যাতায়াত করা যায়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৬ সনের বন্যার সময় গ্রামের বাড়ি-ঘরে পানি উঠে। পূর্বে এই গ্রামের লোকজন সবাই কৃষিকাজ করত। বর্তমানে এই গ্রামের অনেক লোকজন ব্যবসা, চাকুরি ও প্রবাস থেকে প্রেরিত অর্থ দিয়ে জীবন-যাপন করে।

৪.২ স্থানিক বিবরণ

১২০ একর জমির উপর এমারগাও গ্রামটির অবস্থান। গ্রামের মৌজার নাম টোটল। গ্রামের চাষযোগ্য জমি ৮৮.০৬ একর, খাস জমি ৭.৪৯

একর, খাল আছে ১.২২ একর, বসতবাড়ি আছে ২২.০৬ একর এবং রাস্তা আছে ১.১৭ একর। গ্রাম সংলগ্ন আটি বাজারের প্রধান সড়কের পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গার নদীর একটি শাখা বয়ে গিয়েছে। বুড়িগঙ্গার এই শাখা নদীটি বাঁকা হয়ে এমারগাও গ্রামের ভিতর প্রবেশ করে গ্রামটিকে পূর্ব এমারগাও ও পশ্চিম এমারগাও এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। বুড়িগঙ্গার শাখা নদীটি বর্ষায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তখন এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে নৌকা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। শীত মৌসুমে এই শাখা নদীতে কোমর পরিমাণ পানি থাকে। তখন এই নদীটিকে একটি ছোট খালের মত মনে হয়। শীত মৌসুমে এই খালের মধ্যে দুই-চারটি ছোট ডিঙ্গি নৌকা থাকে লোকজনের পারাপারের জন্য। আটি বাজার ব্রিজ থেকে ১ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তা পূর্বএমারগাও গ্রামের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে। পূর্ব এমারগাও গ্রামের ১ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে ব্রিজ সংলগ্ন আধা কিলোমিটার ইট বিছানো এবং আধা কিলোমিটার কাচা রাস্তা। পশ্চিম এমারগাও গ্রাম এর ১ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি কাচা রাস্তা গ্রামের পাশ চলে গিয়েছে।

এলাকার অবস্থানের ভিত্তিতে গ্রামের বাড়ি ঘরগুলোকে পূর্ব পাড়া, উত্তরপাড়া, দক্ষিণ পাড়া ও পশ্চিম পাড়ায় ভাগ করা হয়েছে। এমারগাও গ্রামটি মুসলমান প্রধান। এই গ্রামে কোন হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান পরিবার বসবাস করে না। গ্রামের অধিবাসীরা বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুকে পড়লেও কৃষিকাজ এখনো গ্রামের প্রধান পেশা। এখানে প্রচুর পরিমাণে ইরি, বোরো, আমন ধানের চাষ হয়। কৃষি ফসলের মধ্যে সবজি চাষ এখানকার অন্যতম কৃষি পণ্য। সবজি চাষ করে এখানকার অধিবাসীরা জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে ঋতুভেদে বিভিন্ন প্রকার সবজি চাষ করা হয়।

কেরানীগঞ্জ উপজেলার সাথে এই গ্রামের বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। গ্রামে ৪টি মসজিদ আছে। পূর্ব এমারগাঁও গ্রামে দুইটা এবং পশ্চিম এমারগাঁও গ্রামে দুইটা। পূর্ব এমারগাও গ্রামের এবং উত্তরে অবস্থিত পাকা মসজিদটি এই গ্রামের সবচেয়ে বড় মসজিদ। শুক্রবার দিন এখানে গ্রামের সবাই জুমার নামাজ আদায় করে। অবশিষ্ট তিনটি মসজিদ টিন দিয়ে তৈরি। মসজিদের সামনে টিউবয়েল আছে এবং এই টিউবয়েলের পানি দিয়ে মুসল্লীরা ওজু করে। পূর্ব এমারগাও গ্রামে একটি মাজার আছে এবং এ মাজারটি রাতের বেলা অলৌকিকভাবে নির্মিত হয়েছে বলে এলাকাবাসীর বিশ্বাস। এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা পার্শ্ববর্তী জয়নগর

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের জয়নগর প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া করে। এছাড়া তাওয়াল উচ্চ বিদ্যালয় ও আটি বাজারে অবস্থিত পাঁচদানা উচ্চবিদ্যালয়ে এই গ্রামের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করে। এস.এস.সি পাশ করার পর এখানকার শিক্ষার্থীরা নয়াবাজার ডিগ্রী কলেজ ও ইস্পাহানি ডিগ্রী কলেজে লেখাপড়া করে। পূর্ব এমারগাও গ্রামে ব্র্যাক পরিচালিত একটি স্কুল আছে যেখানে দরিদ্র ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। কেরানীগঞ্জ উপজেলার সাথে এই গ্রামের বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। এই গ্রামের ৯৫% লোকজন টিউবয়েলের পানি ব্যবহার করে।

৪.৩ এমারগাও গ্রামের জনসংখ্যা

এমারগাও গ্রাম মুসলমান প্রধান। স্বাধীনতার পূর্বে এই গ্রামে যে সব হিন্দু বসবাস করত, স্বাধীনতা পরবর্তীতে তারা স্থানীয় লোকজনের কাছে জমি, বাড়ি বিক্রি করে ভারতে চলে যায়। বর্তমানে পুরুষ ও মহিলার ভিত্তিতে এমারগাও গ্রামের জনসংখ্যা সারণী নং ১: এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণী নং ১ঃ এমারগাও গ্রামের জনসংখ্যা বিন্যাস

জনসংখ্যার একক	সংখ্যা	শতকরা হার
পূর্ব এমারগাও		
পুরুষ	২৭৭	৩০.৩৪
মহিলা	২৬০	২৮.৪৮
পশ্চিম এমারগাও		
পুরুষ	১৭২	১৮.৮৪
মহিলা	২০৪	২২.৩৪
মোট	**৯১৩**	**১০০**

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারণীর তথ্যে দেখা যায় পূর্ব এমারগাও এর জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। পূর্ব এমারগাও এর শতকরা ৩০.৩৪ শতাংশ অর্থাৎ ২৭৭ জন পুরুষ এবং ২৬০ জন মহিলা বসবাস করে। পশ্চিম এমার গাও এর জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ১৮.৮৪ শতাংশ অর্থাৎ ১৭২ জন এবং মহিলা জনসংখ্যা ২২.৩৪ শতাংশ অর্থাৎ ২০৪ জন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ গ্রামের অর্থনীতি

পূর্বে এমারগাও গ্রামের অধিবাসীরা প্রধানত জমির উপর নির্ভরশীল ছিল। বিভিন্ন ধরণের শষ্য আবাদ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। কৃষি চাষযোগ্য জমি ছিল গ্রামবাসীর জীবিকার অন্যতম মাধ্যম। তবে কৃষি পণ্যের নিম্নমূল্য, উৎপাদন ভালো না হওয়া, কৃষি জমির স্বল্পতা, এবং ক্রমান্বয়ে ভূমিহীনতা গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে। এ গ্রামের অর্ধেক অধিবাসী তাদের চাষযোগ্য জমি বিক্রি করে ব্যবসায় খাটিয়েছে, ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছে, পাকা বাড়ি বানিয়েছে। এমারগাও গ্রাম আটি বাজার সংলগ্ন হওয়াতে এবং কেরানীগঞ্জ উপজেলা ও ঢাকার সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ থাকাতে চাষযোগ্য জমির দাম অনেক বেড়ে যায়। গ্রামের অধিবাসীরা জমি বিক্রি করে বাজার অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। অনেক গ্রামবাসী কৃষি বহির্ভূত আয় যেমন, ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরি তথা বেতনের উপর নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও গ্রামবাসীর বৃহৎঅংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল।

এমারগাও গ্রামে পূর্বে আউশ ও আমন ছিল প্রধান ধানী শষ্য। বর্তমানে এখানে বোরো, ইরি প্রধান ধানী ফসল। কিন্তু জমিতে আমন ধান চাষ করা হয়। কার্তিক মাসে কৃষকেরা খাল সংলগ্ন বা অন্য কোন ছোট খাটো জমিতে ধানের বীজ বপন করে। ধানের বীজ বপন করার এক মাস পর চারাগুলো যখন ৫ থেকে ৬ ইঞ্চি লম্বা হয় তখন এগুলো তুলে মূল ফসলী জমিতে লাগানো হয়। ইরি ধান লাগানোর পর জমিতে পানিসেচ করতে হয়, ইউরিয়া ও টিএসপি সার ব্যবহার করা হয় এবং নিয়মিত আগাছা পরিস্কার করতে হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ধান কাটা হয়। যে সব কৃষকেরা আমন চাষ করে তারা শ্রাবন ও ভাদ্র মাসে ধান বপন করে এবং অগ্রহায়ন ও পৌষ মাসে আমন ধান কাটা হয়।

এমারগাও গ্রামের কৃষি পণ্যের মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে সবজি চাষ। এই গ্রামে প্রায় প্রতিটি পরিবার খাওয়া ও বিক্রির জন্য সবজি চাষ করে। এখানকার মাটি সবজি চাষের জন্য উপযোগী এবং এই গ্রামে প্রচুর সবজি উৎপাদন হয়। এমারগাওবাসীরা রবিশস্য খুব একটা চাষ করে না। এরা কিছু পরিমাণ সরিষা, ধনিয়া মাসকলাই এবং খেসারির ডাল চাষ করে। খেসারির ডাল গাছ সাধারণত শাক ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এমারগাও গ্রামে ঋতু অনুযায়ী সবজি চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালে এই গ্রামের জমিতে, লালশাক, ডাটা, মিষ্টি কুমড়া, ঢেড়স,

Dhaka University Institutional Repository

ঝিঙ্গা, কহী,ধুন্দল, চালকুমড়া, এবং পুইশাক চাষ কর হয়। শীতকালে বাঁধা-কপি, ফুলকপি, টমেটো, আলু, লাউ, শিম, গাজর, মুলা, ওল কপি, বেগুন, পালং শাক, লাল শাক ইত্যাদি সবজি চাষ করা হয়। এইসব সবজি গ্রাম সংলগ্ন আটি বাজার ও ঢাকা শহরের বিভিন্ন বাজারে বিক্রির জন্য প্রেরিত হয়। এমারগাও গ্রামের সবজি এখানকার অন্যতম অর্থকরী কৃষিপণ্য এবং কয়েকটি পরিবার এই কৃষিপণ্যের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই গ্রামে চারটি গরুর খামার আছে। খামারের গরুর দুধ আটির বাজার ও কেরানীগঞ্জ উপজেলায় এবং কেউ কেউ ঢাকায় এসে বিক্রি করে। এমারগাও গ্রামে ব্যক্তিগতভাবে দুই চারটি গরু ও ছাগল সবাই পালন করে। গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন করে। বাড়িত পালিত হাঁস-মুরগি থেকে তাদের নিত্যদিনের চাহিদা মেটানো হয়। এছাড়া কয়েকটি মুরগির খামার রয়েছে। যেখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুরগি পালন করা হয়।

৪.৫ গ্রামের অধিবাসীদের পেশা

মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হয় পেশার মাধ্যমে। জীবিকা নির্বাহের জন্য পেশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। পেশার ধরণের সাথে জীবন মান তথা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়। এমারগাও গ্রামের শ্রমবিভক্তি মূলতঃ লিঙ্গভিত্তিক। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া পুরুষ ও মহিলাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা। এই গ্রামের কৃষক পুরুষেরা মাঠে, দোকানে, বাজারে ও কলকারখানায় কাজ করে। পুরুষদের কাজ হচ্ছে জমিতে চাষাবাদ, ক্ষেত তৈরী এবং ফসল নিড়ানো। অল্প বয়সের ছেলে শিশুরা বাবাকে মাঠের কাজে সাহায্য করে, ফসল নিড়ানীতে সাহায্য করে, গবাদি পশু রক্ষণাবেক্ষণ করে, পিতার জন্য দুপুরে মাঠে খাবার নিয়ে যায়। দরিদ্র পরিবারের ছেলে শিশুরা আটি বাজারের হোটেলে ও বিভিন্ন দোকানে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে। কৃষিকাজ ছাড়া এই গ্রামের পুরুষেরা ব্যবসা, কন্ট্রাক্টার, চাকুরি ও অকৃষি মজুর হিসাবে নিয়োজিত আছে।

মহিলাদের প্রধান কাজ হচ্ছে গৃহস্থালী। তারা রান্নাবান্না ও সন্তান লালন-পালন, ফসল শুকানো ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। গ্রামের মহিলারা তাদের কর্মসময়ের একটা বৃহৎ অংশ গৃহস্থালী কাজে ব্যয় করেন, যে কাজকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। এমারগাও গ্রামের মেয়ে শিশুরা অনেক অল্প বয়স থেকে মাকে রান্নায়,

থালা-বাসন ও মাছ তরকারি ধোয়ায় এবং টিউবয়েল থেকে পানি আনার কাজে সাহায্য করে। মেয়ে শিশুদের আরেকটি প্রধান কাজ হচ্ছে মা যখন গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত থাকে তখন ছোট ভাই বোনদের লালন-পালন করা। প্রচলিত মূল্যবোধের মাপকাঠিতে এমারগাও গ্রামের মেয়ে শিশুদের ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও ত্যাগ এই তিনগুণের সমাহারে আদর্শ নারী হিসেবে গড়ে ওঠার শিক্ষা দেওয়া হয়। পরিবারের বৃদ্ধা মহিলারা শিশুদের দেখাশোনা করে, পুত্রবধুদেরকে গৃহস্থালী নানা রকম কাজ কর্মে সাহায্য করে।

এমারগাও গ্রামের মহিলাদের গৃহস্থালী কাজের এই সনাতন ধারায় এসেছে পরিবর্তন। গ্রামীন মহিলারা জীবন ও জীবিকার তাগিদে জমিকে বেছে নিয়েছে অর্থ উপার্জনের পথ। ঘরের চার দেওয়ালের গন্ডী পেরিয়ে তারা বেরিয়ে এসেছে জীবিকার সন্ধানে। এমারগাও গ্রামের অধিবাসীদের পেশা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। নিম্নের ২- নং সারণীতে এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং ২: গ্রামীন জনগনের পেশা

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষিকাজ	৫৩	২৬.২৪
অকৃষি মজুর	৩৮	১৬.৬৭
চাকুরি	৩১	১৩.৬০
ব্যবসায়ী	৪৫	১৯.৬০
ঠিকাদার	১৯	৮.৩৩
গাড়ীর ব্যবসা (রিকশা ভ্যান)	১৫	৬.৫৮
দুধ বিক্রেতা	৯	৩.৯৫
অন্যান্য	১৮	৭.৮৯
মোট	২২৮	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারণীর তথ্যে দেখা যায় গ্রামবাসীর সর্বাধিক অর্থাৎ ২৩.২৪ শতাংশ কৃষক। কৃষিকাজের পর সর্বাধিক হলো ব্যবসায়ী যার শতকরা হার ১৯.৭৪। আর অকৃষি মজুর ১৬.৬৭ শতাংশ, চাকুরি ১৩.৬০

শতাংশ, ঠিকাদার ৮.৩৩ শতাংশ, গাড়ীর ব্যবসা ৬.৫৮ শতাংশ, দুধ বিক্রেতা ২.৩৮ শতাংশ এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছে ৭.৮৯ শতাংশ।

৪.৬ এমারগাও গ্রামের ভূমি ব্যবস্থার তথ্য

আমাদের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ কৃষিতে উৎপন্ন হয় এবং কর্মরত মানুষের শতকরা ৫৫ ভাগ কৃষির সাথে জড়িত। কৃষিখাতকে এড়িয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের ভিত্তি সুদৃঢ় করা সম্ভব নয়। অতি প্রাচীন কাল থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি হল প্রধানত গ্রামকেন্দ্রীক। গ্রামকে কেন্দ্র করেই মানুষের দৈনন্দিন জীবন এবং সমস্ত কর্মকান্ড আবর্তিত হতো। গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি, ছোট ছোট কুটির শিল্প। ছোট ছোট কুটির শিল্পে যারা নিয়োজিত তারাও আংশিকভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই জন্য কৃষিভূমিই গ্রামের মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস। গ্রামীন জীবনে ক্ষমতা কাঠামোর ভিত্তি হলো ভূমি বা জমি। বাংলাদেশের যে কোন গ্রাম-সমাজের স্তরায়নে জমির পরিমাণ ও মালিকানার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জমিকে কেন্দ্র করে তার মালিকানা, ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে গড়ে উঠে ভূমি সম্পর্ক, যা স্তরভেদে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

বাংলাদেশের গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ধারণে তাদের পারিবারিক জমি জমার পরিমাণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। গ্রামীন এলাকার জনগোষ্ঠী প্রধানত জমিজমার উপর নির্ভরশীল। কৃষি চাষযোগ্য জমি তাদের জীবিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মাধ্যম। কিন্তু বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি জমির পরিমান বাড়ে নি। যার ফলে কৃষিভূমির উপর জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক। বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ প্রায় ০.২৫ একরেরও কম এবং পরিবার প্রতি কৃষিভূমি প্রায় ২.০০ একর যা বলতে গেলে ন্যূনতম পর্যায়ে পৌঁছেছে। গ্রামীন বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ৫৬ শতাংশ এবং এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া নিম্নবিত্ত ও কৃষক শ্রেণীর জমির পরিমাণ ০.০৫ থেকে ২.৪৯ একর যা পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার প্রতিপালনের জন্য খুবই নগণ্য। সেইজন্য একটি পরিবারকে শুধু কৃষির উপর নির্ভর থাকার জন্য যথেষ্ট নয়। এর ফলে গ্রামে ভূমিহীন উদ্বৃত্ত কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরোত্তর বাড়ছে। এই উদ্বৃত্ত কৃষি শ্রমিকের একটি অংশ বিভিন্ন প্রকার অকৃষিজ পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে এবং গ্রামে ক্রমান্বয়ে অকৃষিজ পেশার প্রসার হচ্ছে। গবেষণা এলাকায় পেশা সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় কৃষকাজের পর সর্বাধিক ১৯.৭৪ শতাংশ হচ্ছে ব্যবসায়ী এবং ১৬.৬৭ শতাংশ হচ্ছে অকৃষি মজুর। জমির মালিকানার ভিত্তিতে এমারগাও গ্রামে পাঁচ শ্রেণীর কৃষক রয়েছে। নিম্নের সারণী নং ৩- এর মাধ্যমে তাদের জমিজমার তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং ৩: গবেষনাধীন গ্রামের ভূমি বন্টনের চিত্র

জমির পরিমাণ	কৃষকদের শ্রেণীসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
০.৫০ একর	ভূমিহীন	১৮	৩৩.৯৬
০.৫০-২.৯৯ একর	ক্ষুদ্র কৃষক	১৫	২৮.৩০
২.০০-৪.৯৯ একর	মধ্যম কৃষক	১৩	২৪.৫৩
৫.০০ একর +	ধনী কৃষক	৭	১৩.২১
মোট		৫৩	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারণীর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সর্বাধিক ৩৩.৯৬ শতাংশ অর্থাৎ ১৮ জন ভূমিহীন যাদের জমির পরিমাণ ০.৫০ একর। এরপর রয়েছে ২৮.৩০ শতাংশ অর্থা ১৫ জন ক্ষুদ্র কৃষক যাদের জমির পরিমাণ ০.৫০-২.৯৯ একরের মধ্যে। আরও আছে ২৪.৫৩ শতাংশ অর্থাৎ ১৩ জন মধ্যম কৃষক যাদের জমির পরিমাণ ২.০০-৪.৯৯ একরের মধ্যে। ধনী কৃষক রয়েছে ১৩.২১ শতাংশ অর্থাৎ ৭ জনের জমির পরিমাণ রয়েছে ৫.০০ একরের উর্ধ্বে।

৪.৭ গ্রামের বাসস্থানের ধরণ

বাড়ি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাসস্থান নিজের জন্যে, সন্তানদের জন্যে, সুন্দর জীবন, মানুষ হিসেবে মর্যাদা ও মূল্যের স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্খা মেটাতে সাহায্য করে। একটি বাড়ি একটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুদৃঢ় গড়ে তুলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বাড়ি বলতে এমন একটি অস্তিত্ব বুঝায় যেখানে বেশীরভাগ পিতৃগোষ্ঠীর সদস্যরা বসবাস করে। গ্রামীন জনগোষ্ঠীর বাসস্থানের ধরণ বা আকার নির্ভর করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর। একই পিতৃসূত্রীয় পরিবার একই জমির উপর তাদের বসতবাড়িগুলো গড়ে তুলে আরেফিন, ১৯৯৪ : ৫২। বিভিন্ন পরিবারের আবাসিক ঘরগুলো একটি উঠানের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত। আবার অনেক সময় একই জমির সীমানায় ঘর বাড়ি বিভিন্ন দিকে সম্মুখ রেখে একটু স্বতন্ত্র বাড়ি বানায়। তবে সামনে উঠান রেখে ঘর নির্মান করা এমারগাও গ্রামের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এমারগাও গ্রামের ধনী কৃষক ও ধনী ব্যবসায়ীদের পাকা দালান আছে। পাকা দালানের বিভিন্ন কামরায় পারিবারিক সদস্য যেমন, ছেলে, মেয়ে বা পুত্রবধুরা বসবাস করে। এমারগাও গ্রামে সর্বাধিক সংখ্যক আছে সেমিপাকা বাড়ি। অনেকে আবার সেমিপাকা বাড়ির সাথে একটি টিনের ঘরও বসবাসের জন্য রেখেছেন। অনেকে সেমিপাকা বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দিয়েছে। ঢাকা শহরের মত এখানকার অধিবাসীদের কিছু অংশের আয়ের উৎস ঘর ভাড়া। যেসব লোকজন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসে নিকটবর্তী আটি বাজারে ব্যবসা, চাকুরি ও অকৃষি মজুর হিসাবে কাজ করে তারাই এখানে ঘর ভাড়া করে বসবাস করে। এমারগাও গ্রামে অধিকাংশ পরিবারেই রান্নাঘরটি প্রধান ঘরের সাথে লাগানো। অনেকে আবার ঘরের পিছনের দিকে রান্নাঘর বানায়। এমারগাও গ্রামে সেমিপাকা ঘরের প্রাধান্য থাকলেও রান্নাঘরটি সবাই টিনের চাল ও মুলি বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি করে। গ্রামবাসীরা কাঠ, ধঞ্চে, গাছের পাতা এবং গরুর শুকনো গোবরকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে। এমারগাওগ্রামে সব বাড়ির সামনে উঠোন আছে। উঠোন শস্য মাড়াই ও শুকনোর কাজে ব্যবহার করা হয়। যেসব পরিবার কৃষিকাজ করে না তারাও ঐতিহ্য রক্ষার্থে বাড়ীর সামনে উঠোন রেখে ঘর তৈরি করে। বাড়ি কিনারায় বা উঠোনের পাশে সবাই দু চারটি ফলের গাছ লাগায়। এমারগ্রাও এর অধিবাসীদের সবার বাড়ি সংলগ্ন কিছু জমি থাকে। এই জমিকে তারা পালান বলে। এই পালনে তারা সবজির চাষ করে। এই পালানের সবজি দিয়ে তাদের পারিবারিক সবজির চাহিদা পূরণ হয়। এমারগাও-এর অধিবাসীদের বাসস্থানের ধরণ ও সংখ্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল যা নিম্নের সারণীতে তুলে ধরা হলো।

সারণী নং ৪: গ্রামের বাসস্থানের ধরণ ও সংখ্যা

বাসস্থানের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার
পাকা বাড়ি	১০	৫.৪১
সেমিপাকা বাড়ি	১৩৪	৭২.৪৩
১টি সেমিপাকা ও ১টি টিনের ঘর	১৬	৮.৬৫
টিনের ঘর	২১	১১.৩৫
বাঁশের ঘর	৪	২.১৬
মোট	১৮৫	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারণীর তথ্য বিশেষণ করে দেখা যায় সেমিপাকা ঘর রয়েছে সর্বাধিক ৭২.৪৩ শতাংশ অর্থাৎ ১৩৪ টি পরিবারের। এরপর রয়েছে টিনের ঘর ১১.৩৫ শতাংশ অর্থাৎ ২১ টি পরিবারের। ১টি সেমিপাকা ও ১ টি টিনের ঘর রয়েছে ৮.৬৫ শতাংশ অর্থাৎ ১৬টি পরিবারের। সম্পূর্ণ পাকা বাড়ি রয়েছে ৫.৪১ শতাংশ অর্থাৎ ১০টি পরিবারে এবং বাঁশের ঘর রয়েছে ২.১৬ শতাংশ অর্থাৎ ৪টি পরিবারের।

৪.৮ গবেষনাধীন গ্রামের পরিবারের ধরণ

পরিবার একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করি, লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়ে উঠি, কর্মজীবনে কাজ শেষে পরিবারে ফিরে আসি আবার পরিবারেই একজন সদস্যের মৃত্যু গটে। অর্থাৎ জন্ম জীবন ও মৃত্যুতে পরিবারই আশ্রয় স্থল। এমারগাও গ্রামে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান- সন্তানি নিয়ে গড়ে গড়ে উঠেছে এক একটি পরিবার। এমারগাও গ্রামে পরিবারগুলো গড়ে উঠেছে এমন কতক লোক নিয়ে যারা রক্ত, বৈবাহিক বা দত্তকসূত্রে সম্পর্কযুক্ত। পরিবার হলো উৎপাদন ও ভোগের একটি মৌলিক একক। পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যদের ভরণ-পোষণসহ অন্যান্য দায়-দায়িত্ব বহন করে। বাংলাদেশের পরিবারের সার্বজনীন রূপের মত এমারগাও গ্রামেও স্বামীকেই পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে হয়। পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও স্বামীর ওপরেই ন্যস্ত। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

এমারগাও গ্রামের পরিবারের মধ্যে এসেছে পরিবর্তন। অনেক পরিবারে স্ত্রীরাও পরিবারের বাইরে কাজ করেণ, আয়-উপার্জন করেন এবং সংসারের ভরণ-পোষণ চালাতে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন।

পরিবার শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের কিছু পরিবারে স্ত্রীকে পরিবার বলে। আবার একটি পরিবারের সকল সদস্যকে বুঝাতে পরিবার শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত পরিবার প্রত্যয়টি চুলা, ঘর, খানা যারা (এক সঙ্গে খায়) এবং ঘর (আক্ষরিক অর্থে বাসা) ক্যাটাগরীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। গ্রামবাসীরা পরিবার সংখ্যাকে চুলা দ্বারা নির্ধারণ করে কারণ একটি পরিবারের খাবার তৈরি একটি চুলায়। (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিবার নির্ধারণে খানা জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করে।) ঘর (সংস্কৃত শব্দ 'গৃহ' যার অর্থ বসবাসের ঘর) শব্দটিও পরিবার বুঝাতে ব্যবহার করা হয় (আরেফিন, ১৯৯৪ : ৫৬)। এবং এর দ্বারা বুঝানো হয় কিছু লোককে যারা একসঙ্গে একটি গৃহে বসবাস করে। খানা শব্দটিও পরিবার বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। যার অর্থ একটি একান্নবর্তীগোষ্ঠী।

এমারগাও গ্রামে একই বাড়ীতে ধনী এবং দরিদ্র পরিবার বসবাস করে যেটা আবাসিক বাসস্থান দ্বারা বুঝা যায়। একই বাড়ীতে বসবাসরত চাই ভাইয়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা বুঝা যায় আবাসিক বাসস্থান দ্বারা। একই বাড়ীতে কারো পাকা দালান, কারো সেমিপাকা ঘর, কেউ টিনের ঘরে বসবাস করে। এমারগাও গ্রামে সর্বাধিক পরিবারের সেমিপাকা ঘর রয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা কৃষিকাজের সাথে সাথে অনেকে ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত। তাছাড়া ঢাকা ও কেরানীগঞ্জ উপজেলার সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকাতে শহরের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে এই গ্রামের উপর। যার জন্য এই গ্রামবাসীর সবারই লক্ষ্য পাকা অথবা সেমিপাকা বাড়ি তৈরি, যার কারণে এই গ্রামে সর্বাধিক সেমিপাকা বাড়ি রয়েছে। খুব দরিদ্র পরিবার ছাড়া সবারই আবাসিক ঘরের নিকটে রান্নাঘর আছে। মাটির চুলায় তারা কাঠ, ধঞ্চে, গাছের পাতা, গরু শুকনো গোবর দিয়ে রান্না করে। এমারগাও গ্রামে ধনী পরিবারে শহরের আসবাবপত্রের নকশার অনুরূপ আসবাবপত্র রয়েছে। এই গ্রামের ধনী পরিবার গুলো শহরের স্বচ্ছল পরিবারের মত সাজানো গোছানো। আর্থিকভাবে মাঝারি স্তরের পরিবারগুলোর একটি বা দুটি চৌকি, দুই তিনটা চেয়ার একটি বা দুটি বেঞ্চ একটি ছোট টেবিল, দুই চারটি জলচৌকি এবং পিঁড়ি দেখা যায়। দরিদ্র পরিবার গুলোর চৌকি নাই, তারা মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ঘুমায়। ধনী পরিবারে টিভি ও ফ্রিজ রয়েছে যা তারা কিনেছে অথবা ছেলের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে পেয়েছে।

সাধারণভাবে এমারগাও গ্রামের পরিবার গুলো এক সময়ে যৌথ পরিবার ছিল। বাবা-মা, দাদা-দাদী, চাচা-চাচী এবং তাদের সন্তানাদিসহ নাতি-নাতনীদের নিয়ে গঠিত হতো বৃহদাকারের যৌথ পরিবার, এসব যৌথ পরিবারে সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও ছিল অনেক। বয়স্ক পুরুষ সদস্য এসব যৌথ পরিবারে নেতৃত্ব দিতেন। যৌথ পরিবার ছিল উৎপাদন ও ভোগের এক একটি ইউনিট। যৌথ পরিবারের সদস্যরা এক অপরের সঙ্গে জ্ঞাতিবন্ধন ছাড়াও দায়িত্ব-কর্তব্যে ছিল বাঁধা। পারিবারিক বন্ধন ছিল মজবুত। প্রতিটি যৌথ পরিবার বংশ মর্যাদা ও আত্মসম্মান নিয়ে ধনে-জনে তৃপ্তি সহকারে বসবাস করত। পরিবারের সকল সম্পদও সুযোগ এমনকি খাদ্য-সামগ্রীও একে অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে গ্রহণ করত। রোগ-ব্যাধি হলে যৌথ পরিবারেরর সদস্যরা একে অপরের সেবা যত্নে এগিয়ে আসত। পরিবারের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়ার মধ্যে অনাবিল আনন্দ ছিল ঐতিহ্যবাহী সেইসব যৌথ পরিবারের। কিন্তু আর্থিক দুরাবস্থা, পেশাগত পরিবর্তন, নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রভাব, শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি, পারিবারিক কলহ ও দ্বন্দ্ব- সংঘাত, ব্যক্তিগত পর্যায়ে উন্নয়ন ভাবনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিকাশের কারণে যৌথ পরিবারে দ্রুত ভাঙন দেখা দিয়েছে।

এমারগাও গ্রামে বেশীভাগই একক পরিবার। একজন স্বামী, একজন স্ত্রী এবং তাদের সন্তানাদি নিয়ে এই পরিবার গঠিত। বাবা হচ্ছেন এই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে থাকলে তাকে এই পরিবারের দায়িত্বভার নিতে হয়। আবার একক পরিবারে পিতার মৃত্যুর পর উপার্জক্ষম পুত্র সন্তানের পরিবারে বিধবা মাকেও সদস্য হিসাবে দেখা যায়। এমারগাও গ্রাম বেশী ভাগই পিতৃপ্রধান পরিবার। এই গ্রামে পরিবার প্রধান পিতা বা স্বামীর হাতে কর্তৃত্ব ও পরিবার পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে। আবর সব পরিবারই পিতৃসূত্রীয় বংশধারার নীতিমালা অনুসরণ করে। পিতৃসূত্রীয় পরিবারে সন্তান সন্ততি পিতার ধারার সম্পত্তি এবং বংশ নাম বা মর্যাদা উত্তরাধিকারী সূত্রে অর্জন করে। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকারি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সন্তান-সন্ততি পিতা ও মাতা উভয় থেকে সম্পত্তিলাভ করেছে, যদিও পুরুষ ও স্ত্রী (যেমন-ভাই-বোন) ভেদে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে সম্পত্তির পরিমাণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। বাংলাদেশের হিন্দু পরিবারে সাধারণত কন্যারা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না- যদিও ভারতের হিন্দুসমাজে ১৯৫৫ সাল থেকে হিন্দু পারিবারিক আইন মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফলে ভারতের হিন্দু পরিবারের পিতৃসম্পত্তি সকল ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হচ্ছে। এর সাথে বিবাহবিচ্ছেদের (যা আগে অনানুষ্ঠিক ছিল) আইনও পাস হয়েছে। এখন বিবাহ সামাজিকভাবে অনুষ্ঠিত হলেও রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে নিবন্ধন করতে হয়। তা না হলে কোন বিবাহ আইন সিদ্ধ বলে গণ্য হয় না। এমারগাও বাসীর পরিবারের ধরণ সম্পর্কিত তথ্য সারণী নং ৫- এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারনী নং ৫: গবেষনাধীন গ্রামের পরিবারের ধরণ

পরিবারে ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার
একক পরিবার	১৬৭	৯০.২৭
যৌথ পরিবার	১৮	৯.৭৩
মোট	১৮৫	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারণীর তথ্যে দেখা যায় এমারগাও গ্রামের ৯০.২৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৬৭ একক পরিবার। আর যৌথ পরিবার ৯.৭৩ শতাংশ অর্থাৎ ১৮টি যৌথ পরিবার রয়েছে।

৪.৯ গ্রামীন পরিবারের সদস্য সংখ্যা

আকার ও কাঠামোগত দিক থেকে এমারগাও এর পরিবারগুলো ছিল যৌথ পরিবার। যৌথ পরিবার গুলো দায়িত্ব কর্তবে পরস্পরের সঙ্গে যেমন আবদ্ধ ছিল তেমনি পরিবারের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়ার মধ্যে অনাবিল আনন্দ ছিল এইসব যৌথ পরিবারের। এইসব যৌথ পরবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ১০-১৫ জনের মধ্যে। কোন কোন যৌথ পরিবারে ২০ জনও পারিবারিক সদস্য ছিল। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারনে যৌথে পরিবারে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। এমারগাও গ্রামে এখন পর্যন্ত যে কয়েকটি যৌথ পরিবার তাদের ঐতিহ্য বজায় রেখে টিকে সেগুলোর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ থেকে ১০ জনের মধ্যে। একটি যৌথ পরিবারে দেখা গিয়েছে ৩ ছেলে ও ২ মেয়ের মধ্যে ২ মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং ২ ছেলেকে বিয়ে করিয়েছেন। এই যৌথ পরিবারে পুত্র, পুত্রবধু ও নাতনী সহ মোট পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০ জন।

এমারগাও গ্রামে সর্বাধিক সংখ্যক আছে একক পরিবার। এই গ্রামে নতুন দম্পত্তি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২ জন। এদের অনেকে আবার দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসে এখানে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছে। ধনী পরিারের সদস্য সংখা ৪ থেকে ৫ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই পরিবারগুলোতে আবার পরিবার প্রধানের বাবা বা বিধবা মা পারিবারিক সদস্য হিসেবে আছেন। এমারগাও গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবারের আকার বড় অর্থাৎ পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অজ্ঞতা, অসচেতনতা, পারিবারিক আয় বৃদ্ধির চিন্তা, বার্ধক্যে সন্তানদের ওপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি নানা কারণকে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী করা হয়। এমারগাও গ্রামে যেসব কৃষি মজুর পরিবার রয়েছে তাদের সদস্য সংখ্যা বেশী। এসব পরিবারের পিতা, ছেলে সবাই কৃষি জমি তৈরি, ফসল নিড়ানি, ফসল কাটা ইত্যাদি কাজে বাবাকে সাহায্য করে। অকৃষি মজুর পরিবারে দেখা যায় বাবা রিকশা বা ভ্যান গাড়ী চালায়। ছেলে হোটেল অথবা দোকানে কাজ করে। স্ত্রী ও মেয়ে শস্য ঘরে তোলা, সবজি চাষ অথবা ধনী পরিবারে ঝিয়ের কাজ করে। নিম্নের ৬- নং সারণিতে এমারগাও গ্রামের পরিবারের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং ৬ : গ্রামীন পরিবারের সদস্য সংখ্যা

মোট সদস্য সংখ্যা	সংখ্যা (পরিবার)	শতকরা হার
২	৮	৪.৩২
৩	১৪	৭.৫৭
৪	৭৬	৪১.০৮
৫	৪৫	২৪.৩৩
৬	১১	৫.৯৫
৭	১৩	৭.০২
৮	৩	১.৬২
৯	৫	২.৭০
১০	১০	৫.৪১
মোট	১৮৫	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত তথ্য বিশেষণ করে দেখা যায় যে এমারগাও গ্রামে ৪ সদস্যের পরিবার আছে ৪১.০৮ শতাংশ অর্থাৎ ৭৬টি পরিবারে। এরপর রয়েছে ৫ জন সদস্য রয়েছে ২৪.৩৩ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫ টি পরিবারে। যৌথ পরিবারের ১০ জন সদস্য রয়েছে ৫.৪১ শতাংশ অর্থা ১০টি পরিবারে ২ জন সদস্য রয়েছে ৪.৩২ শতাংশ অর্থাৎ ৮টি পরিবারে। ৩ জন সদস্য রয়েছে ৭.৫৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৪টি পরিবারে। ৬ জন সদস্যের পরিবার আছে ৫.৯৫ শতাংশ অর্থাৎ ১১টি পরিবারে। ৭ জন সদস্য আছে ৭.০২ শতাংশ অর্থা ১৩টি পরিবারে। ৮ জন সদস্য আছে ১.৬২ শতাংশ অর্থাৎ ৩টি পরিবারে। ৯ জন সদস্য রয়েছে ২.৭০ শতাংশ অর্থাৎ ৫টি পরিবারে। এগুলো এমারগাও গ্রামের যৌথ পরিবার।

৪.১০ গবেষনাধীন গ্রামের বিয়ের ধরণ

বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মকর্তৃক অনুমোদিত এমন এক চুক্তি যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা একত্রে বসবাস করার বৈধ ক্ষমতা লাভ করে, অর্জন করে পরিবার গঠনের যোগ্যতা, যা পরিণামে কতক পারস্পরিক অপরিহার্য অধিকার ও কর্তব্যের বিকাশ ঘটায়। বিবাহ ব্যবস্থা সদ্য বিবাহিতদের জন্য নতুন সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বিয়ের মাধ্যমে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী পক্ষের এবং স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর পক্ষের ব্যাপক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এছাড়া বিবাহ ব্যবস্থা স্বামী স্ত্রীর জৈবিক ও সামাজিক অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক এবং সম্ভাব্য সন্তানের সঙ্গে সম্ভাব্য পিতা-মাতার সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

এমারগাও গ্রামের বিয়ে ব্যবস্থা অভিভাবক কর্তৃক আয়োজিত। সাধারণত পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকবৃন্দ নিজেরা অথবা মধ্যস্থতা রক্ষাকারী ঘটকের সাহায্যে বিবাহের কথাবার্তা চুড়াভ ও চুক্তি সম্পাদন করেন। ছেলে এবং মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে বাবাই উদ্যোগ নেন এবং এক্ষেত্রে তার মতামতই চুড়ান্ত হিসেবে গ্রহণযোগ্য। বিয়ের ব্যাপারে পারিবারিক বংশমর্যাদা, চেহারা, বয়স, আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত মান ইত্যাদি পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এমারগাও গ্রামে বিয়ের ব্যাপারে বংশ মর্যাদাকে গুরুত্ব দিলেও ধনী ও শিক্ষিত পাত্রের কাছে বংশ মর্যাদা কম গুরুত্ব পাচ্ছে। নিম্ন মর্যাদার উচ্চ শিক্ষিত পাত্রের কাছে কন্যা বিয়ে দিতে ধনী ব্যক্তিরা বেশ আগ্রহী কারণ এতে কন্যা শহরে যেয়ে বসবাস করবে এবং সুখে থাকবে। আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে নিচু বংশ মর্যাদার সম্পদশালী পাত্রের কাছে উচ্চ বংশ

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদার কন্যার বিয়ে হয়েছে, কারণ এতে কণ্যা আর্থিক স্বচ্ছলতা পাবে। এধরনের অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ এমারগাও গ্রামে সংখ্যায় কম হলেও অভিভাবকরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এই ধরণের বিবাহে বেশ আত্মতৃপ্তি লাভ করে। সমমান বিবাহরীতি এমারগাও গ্রামের বিয়ের সাধারণ রূপ। পাত্র-পাত্রীর শিক্ষা, অর্থসম্পদ, শারীরিক সৌন্দর্য এই বিশেষ বিশেষ গুণ ছাড়া এই গ্রামে সমমানের বিয়ে ব্যবস্থা বেশী লক্ষ্য করা যায়। বিয়েতে যৌতুক দেওয়া এমারগাও গ্রামে একটি প্রচলিত প্রথা। যৌতুক দেওয়া-নেওয়াকে তারা স্বাভাবিক চোখে দেখে। মেয়ে বড় হলে বিয়ের সময় মেয়ের বরকে নগদ টাকা, আসবাবপত্র দিতে হবে এই জন্য তারা মেয়ের অল্প বয়স থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিতে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। তেমনিভাবে ছেলের বিয়ের সময় ঐ একই ব্যক্তি আবার নগদ টাকা ও আসবাবপত্র পেয়ে থাকে। শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষিত, উচ্চ-বংশমর্যাদা ও অতিশয় সুন্দরী ছাড়া যৌতুক আদান প্রদান এই গ্রামের একটা সাধারণ ব্যাপার যেটাকে বিয়ের আর্থিক লেনদেন বলা যায়। অতিশয় দরিদ্র পরিবার ছাড়া এই গ্রামে সামর্থ্য অনুযায়ী বিয়েতে সবাই আর্থিক লেনদেন করে আবার কয়েকটি দরিদ্র পরিবারের যৌতুকের টাকা পিতা-মাতা পরিশোধ করতে না পারায় বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে।

এমারগাও গ্রামে ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো বিয়ের অনুষ্ঠান খুব ঝাকঝমকভাবে পালন করে। বিয়ের প্রস্তাব, পাকা কথা, গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠান বৌ-ভাত ইত্যাদি পর্বে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ হয়। মেয়ের বিয়ে অনুষ্ঠান ও ছেলের বৌভাত অনুষ্ঠানে দাওয়াতী মেহমানরা বিভিন্ন উপহার সামগ্রী নিয়ে বিয়ের দাওয়াত খেতে আসে। এই গ্রামের বিয়েতে উপহার হিসেবে নগদ টাকা বেশীর ভাগ দাওয়াতী মেহমান প্রদান করে। এই গ্রামে প্রেম পরিণয়ের সংখ্যা কম। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এটাকে তেমন সমর্থন না করলেও আজকাল অভিভাবকরা প্রেম পরিণয়কে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নেয়। পূর্বের বাল্য বিবাহ প্রথা এখন আর এই গ্রামে না থাকলেও ছেলেদের বয়স ২০ ও মেয়েদের বয়স ১৫ বছর হলে অভিভাবকরা বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। বাংলাদেশ সরকার বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ এবং ছেলেদের সর্বনিম্ন বয়স ২২ বৎসর নির্ধারণ করেছে এই নীতিমালা এই গ্রামে মানা হয় না।। এমারগাও গ্রামে আগে যে পরিমাণ বহুস্ত্রী বিবাহ ছিল তা বর্তমানে শিক্ষার প্রসার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক দুরবস্থার কারণে কমে গিয়েছে। পূর্বের দুইটি ধনী কৃষক পরিবারে বহু স্ত্রী দেখা গিয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে যাদের আর্থিক অবস্থা আগের মত স্বচ্ছল নাই। এই গ্রামের দরিদ্র অকৃষি মজুর যেমন, রিকশা চালক, গাড়ীর হেলপার, বিভিন্ন প্রকার মিস্ত্রি পরিবারের পুরুষ সদস্যরা একের পর এক বিবাহ করছে, আর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করছে বা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ না করে আবার অন্যত্র বিবাহ করছে। এক্ষেত্রে তারা প্রথম স্ত্রীর কোন খোজ খবর রাখে না এবং ভরণ পোষণ ও দেয় না। বারবার বিবাহ এবং স্ত্রী বর্জনকে সাধারণত বহু স্ত্রী বিবাহ বলা যায় না। কন্যাদায়গ্রস্থ দরিদ্র পিতা মাতা যৌতুক সমস্যার কারনে এবং বিয়ের পর স্ত্রী পরিত্যাগ করার কারনে কন্যাকে বিয়ে দিয়েও দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারছে না। এর মুলকারণ অর্থ-সামাজিক অবস্থা তথা দারিদ্র্যতা। এই গ্রামে ভ্রাতৃবিধবা বিবাহ না থাকলেও দুইটি শ্যালিকা বিবাহ পাওয়া গিয়েছে। এই দুইটি ক্ষেত্রেই স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সন্তানদের লালন-পালনের জন্য স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে করেছে। এই দুইটি পরিবারই ধনী পরিবার যেখানে কন্যার পিতা মাতা আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য মৃত মেয়ের স্বামীর সঙ্গে কন্যাকে বিয়ে দিয়েছে। এই গ্রামের প্যারালাল এবং ক্রস কাজির বিবাহের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এগুলো সাধারণত প্রেম গঠিত কারণে বেশী সংগটিত হয়েছে। আবার সম্পদ, শিক্ষা ও সৌন্দর্যের দিক থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অভিভাবক নিজেরা আগ্রহী হয়ে প্যারালাল বা ক্রস কাজিন বিয়ের ব্যবস্থা করেণ। নিম্নের সারণীতে এমারগাও গ্রামের ১৪৭টি বিবাহের ধরণ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং ৭: গবেষনাধীন গ্রামের বিবাহের ধরণ

বিবাহের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার
অনুলোম বিবাহ	২১	১৪.২৯
প্রতিলোম বিবাহ	৯	৬.১২
সমমান বিবাহ	৭৩	৪৯.৬৬
প্রেমঘটিত বিবাহ	১৫	১০.২০
বহুস্ত্রী বিবাহ	২	১.৩৬
লেভিরেট বিবাহ	-	-
সরোরেট বিবাহ	২	১.৩৬
প্যারালাল কাজিন বিবাহ	১২	৮.১৬
ক্রসকাজিন বিবাহ	১৩	৮.৮৪
মোট	১৪৭	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপিত সারণীর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এমারগাও গ্রামে সর্বাধিক সংখ্যক রয়েছে সমমান বিবাহ ৪৯.৬৬ শতাংশ অর্থাৎ ৭৩টি। এরপর রয়েছে অনুলোম বিবাহ ১৪.২৯ শতাংশ অর্থাৎ ২১। এই গ্রামে প্রেমঘটিত বিবাহ রয়েছে ১০.২০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫টি। এমারগাও গ্রামে বহুস্ত্রী বিবাহ ও সরোরেট বিবাহ রয়েছে যথাক্রমে ১.৩৬ ও ১.৩৬ অর্থাৎ ২টি করে। এখানে প্যারালাল কাজিন বিবাহ রয়েছে ৮.১৬ শতাংশ অর্থাৎ ১২টি এবং ক্রসকাজিন বিবাহ রয়েছে ৮.৮৪ শতাংশ অর্থাৎ ১৩টি।

৪.১১ গবেষনাধীন গ্রামীন জনগনের শিক্ষা

মানুষের পূর্ণ বিকাশের জন্যে প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষার আলো না পেলে ব্যক্তি মানুষ যেমন বিকেশিত হয় না, তেমনি দেশ ও সমাজ উন্নত হতে পারে না। আমাদের জাতীয় জীবনের সকল সমস্যা, সঙ্কট ও দুর্দশার মূল উৎস শিক্ষার অভাব। শিক্ষার অভাব তথা নিরক্ষরতা থেকে যদি জনসাধারণকে মুক্ত করা যেত তাহলে বর্তমানে জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষি স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ উন্নয়ন, সমবায় ইত্যাদি জাতিগঠন মূলক সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টাই সাফল্যমন্ডিত হতো। একটা উন্নত দেশের জন্য চাই শিক্ষিত জনশক্তি। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের চালিকা হিসাবে কাজ করে। বিশ্বের উন্নত দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই বাজেটের একটা অংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করে জনসংখ্যাকে মানব-সম্পদ-এ পরিণত করেন। পরবর্তীতে এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক অগ্রগতির চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। একটি জাতির প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষা মায়ের দুধের মত অপরিহার্য্য। ইউনেস্কোর সংবিধানে বলা হয়েছে জাতি, ধর্ম, ধনী, নির্ধন, স্ত্রী, পুরুষ নির্বিচারে সকলের শিক্ষার জন্য সমান সুযোগ করে দিতে হবে।

সবার জন্য শিক্ষা এই আন্তর্জাতিক ঘোষনায় অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ। কিন্তু আর্থিক এবং লিঙ্গ বৈষম্যের দরুণ এই আন্তর্জাতিক ঘোষণার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে এখনও এদেশের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ধনী-গরিব বৈষম্য, নারী-পুরুষ বৈষম্য, গ্রাম- শহর বৈষম্য এসব কারণে এ দেশে শিক্ষার ভারসাম্য অবস্থা বিরাজমান নয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৫ বছর বয়োসধর্ধ জনগণের শিক্ষার হার দাড়িয়েছে প্রায় ৬৪ শতাংশ। কিন্তু গ্রামের দরিদ্র মানুষের মধ্যে এ হার খুবই কম। দরিদ্র পরিবারের একজন ছেলে বা মেয়েকে আর্থিক

Dhaka University Institutional Repository

দৈণ্যতার দরুন তাদের অভিভাবকরা স্কুলে পাঠানের চেয়ে উপার্জনমূলক কাজে লাগানো প্রতি বেশি আগ্রহী। ফলে এসব ছেলে মেয়ের শিশু শ্রমে নিয়োজিত হয়ে শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচেছ। প্রাথমিক স্কুলে গমনোযোগী বয়সের শিশুদের স্কুলে গমন না করা, স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত না হওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না করে স্কুল ত্যাগ করার অন্যতম কারণই হচ্ছে দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষার মত মানবিক সম্পদটি অধিকার করতে না পেরে তারা দারিদ্র্য চক্র হতেও বেরিয়ে আসতে পারছে না। কেননা যে কোন লাভজনক পেশায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য শিক্ষা এবং দক্ষতা হচ্ছে অবশ্য পূরণীয় শর্ত। ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষার যে আন্তর্জাতিক অঙ্গিকার উচ্চারিত হয়েছে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বাংলাদেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করেছে। তার মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম, গণশিক্ষা অষ্টম শ্রেণী থেকে ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা সরকারিকরণ এবং বিনামূল্যে বই বিতরণ ও প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, প্রতিটি উচ্চবিদ্যালয় এবং কলেজে ডাবল শিফ্‌ট চালু করা ইত্যাদি প্রধান। আবার দরিদ্র অভিভাবকগণ যাতে তাদের সন্তানদের জীবিকা অর্জনের তাগিদে শিশুশ্রমে নিয়োজিত না করে প্রাথমিক স্কুলে প্রেরণ করতে আগ্রহী হন, সে লক্ষ্যেই ১৯৯৩ সালের জুলাই মাস হতে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। দেশের ৪৬৪ টি উপজেলার প্রত্যেকটি হতে অর্থনৈতিক ও শিক্ষার দিক হতে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ৪টি ইউনিয়নকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ কর্মসূচির আওতাভূক্ত করা হয়। দেশের সকল জনসাধারণের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত করেছে। দরিদ্র ছেলেমেয়েদের শিক্ষার লক্ষ্যে ব্র্যাক, প্রশিকা এবং কারিতাসের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। প্রশিকা এবং ব্র্যাক দরিদ্র পিতামাতর সন্তানদের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করে। ব্র্যাক অবকাঠামোগত উন্নয়নে ৩০ শতাংশ অপরদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ অর্থ খরচ করে।

এমারগাও গ্রাম শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ পশ্চাৎপদ। এই গ্রামে কয়েক বছর পূর্বেও কোন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ অধিবাসী ছিল না। এই গ্রামে মাধ্যমিক পাশ লোককে উচ্চশিক্ষিত হিসাবে গণ্য করা হতো এবং

শিক্ষিত বলে সমাজে তিনি উচ্চমর্যাদা ভোগ করতেন। বর্তমানে এই গ্রামে ৫ জন স্নাতক ও ২ জন স্নাতকোত্তর পাশ অধিবাসী আছেন যারা ঢাকায় চাকুরি ও বসবাস করেন। এই গ্রামের বেশীরভাগ পুরুষ ও মহিলা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর আর লেখাপড়া করে না। এরপরই তারা চাকুরি, ব্যবসা ইত্যাদি পেশাগত জীবনে প্রবেশ করে। শিক্ষা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে পেশাগত জীবনে সাফল্য আনে, এটা এখন এই গ্রামের প্রতিটি অভিভাবক উপলব্ধি করে এবং সন্তানদের লেখপড়া শিখাতে চান। এই গ্রামের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে জয়নগর প্রাইমারী স্কুলে পড়ে। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ভাওয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে লেখাপড়ার জন্য ভর্তি হয়। এই গ্রামটি আটি বাজার সংলগ্ন হওয়ায় পাঁচদানা উচ্চ বিদ্যালয়ে এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা বেশী লেখাপড়া করে। ধনী পরিবারের ছেলে- মেয়েরা জয়নগর প্রাইমারী স্কুলে না যেয়ে আটি বাজারে অবস্থিত কিন্ডার গার্টেন গুলোতে লেখাপড়া করে। এস.এস.সি পাশ করার পর আটিবাজারের নিকটবর্তী নয়াবাজার ডিগ্রী কলেজে ও রুইতপুর অবস্থিত এখানকার ইস্পাহানি ডিগ্রী কলেজে এখানকার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। এমারগাও গ্রামের ৩২৫ জন পুরুষ অধিবাসীর শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের ৮-নং সারণীতে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং ৮ : গবেষনাধীন গ্রামের শিক্ষাগত যোগ্যতা (পুরুষ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার
নিরক্ষর	৪৫	১৩.৮৫
স্বাক্ষর করতে জানে	১৪৫	৪৪.৬২
প্রাথমিক	৭৬	২৩.৩৮
এস এস সি	৩৫	১০.৭৭
এইচ এস সি	১৭	৫.২৩
স্নাতক	৫	১.৫৪
স্নাতকোত্তর	২	০.৬২
মোট	৩২৫	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারণীর তথ্য বিশেষণ করলে দেখা যায় শুধু স্বাক্ষর করতে জান এরকম লোকের সংখ্যা ৪৪.৬২ শতাংশ অর্থাৎ ১৪৫ জন। প্রাথমিক শিক্ষালাভকারী লোকের সংখ্যা ২৩.৩৮ শতাংশ অর্থাৎ ৭৬ জন। এপর রয়েছে নিরক্ষর ১৩.৮৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫ জন, এসএসসি পাশ ১০.৭৭ শতাংশ অর্থাৎ ৩৫ এবং এইচএসসি পাশ রয়েছে ৫.২৩ শতাংশ অর্থাৎ ১৭ জন। এমারগাও গ্রামে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী লোকের সংখ্যা যথাক্রমে ১.৫৪ শতাংশ ৩০.৬২ শতাংশ অর্থাৎ ৫ জন ও ২ জন।

৪.১২ এমারগাও গ্রামের নারী শিক্ষা

বেইজিং ঘোশষণায় বলা হয়েছে, শিক্ষা একটি মানবিক অধিকার এবং সমতা উন্নয়ন ও প্রগতির লক্ষ্য অর্জনে এক অপরিহার্য হাতিয়ার। নারীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে হলে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে সমতা থাকতে হবে। বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সকল পর্যায়ে অসমতা রয়েছে। এডুকেশন ওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুরুষদের তুলনায় দেশের নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে ১২ শতাংশের ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে। ২০০১ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী নারী স্বাক্ষরতার হার ৪০.৮ শতাংশ এবং পুরুষ স্বাক্ষরতার ৫৩.৯ শতাংশ। প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলেদের ভর্তির হার শতকরা ৮১ ভাগ আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ৭৬ ভাগ। মাধ্যমিক পর্যায়ে এই হার ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪৮ ও ৩৬ ভাগ। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে নারী। এর পিছিয়ে থাকার পেছনে সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর শিক্ষা ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে। অধিকারভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির অভাবে মেয়ে শিশুকে মূলধারার শিক্ষায় কম দেখা যায়। ইউনিসেফের তথ্য অনুসারে, প্রাথমিক স্কুলে পড়ার উপযোগী ১২ লাখ শিশু স্কুলে যায় না। এর মধ্যে ৫৩ শতাংশ মেয়ে শিশু। সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের এক তৃতীয়াংশ শিশুর ৮৫ শতাংশ মায়েরা কখনও স্কুলে যায় নি। ইদানিং অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং দাতাসংস্থার ছাত্রী উপবৃত্তিসহ নারী শিক্ষার প্রসারে বেশ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ নেয়ার ফলে আগের চেয়ে স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার বেড়েছে। কিন্তু স্কুলের পাঠ শেষ করার আগেই ঝরে পড়েছে অনেকে। ব্যানবেইস এর পরিসংখ্যান অনুসারে ষষ্ট থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ১৭.২ শতাংশ। আর ৯ম ও ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ৫৪.৮ শতাংশ। বর্তমান স্কুল

Dhaka University Institutional Repository

কলেজে মেয়েদের ভর্তির হার বাড়ছে, এটা আশার কথা, কিন্তু পরবর্তীতে ঝরে পড়ার হার বাড়ছে। আর এর জন্য প্রধানত দায়ী পরিবারের দারিদ্র্য ও সামাজিক নিরাপত্তর অভাব। সরকার ২০০৫ সালের মধ্যে সব স্কুলে সমান সংখ্যক ছেলেমেয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

দরিদ্র্যতা, রক্ষণশীলতা, অজ্ঞতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে এমারগাও গ্রামে নারী শিক্ষার হার কম। মেয়ে জন্ম নেওয়ার পর অভিভাবকদের এরকম চিন্তা থকে কিভাবে মেয়েকে বিয়ে দিবেন। মেয়ের বিয়ের খরচের জন্য তারা মেয়ের অল্প বয়স থেকে টাকা জমান। এই গ্রামে মেয়েরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেও মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো বিয়ে দেয়া। এই গ্রামে একজন মেয়েকে স্কুলে পাঠানো বা শিক্ষার পিছনে ব্যয় করা থেকে বিয়ের অনুষ্ঠান বা যৌতুকের পিছনে অর্থ ব্যয়কে লাভজনক মনে করে। দরিদ্র্য পরিবারের মেয়ে শিশু পরিবারের আয় বাড়তে অন্যের বাড়ীতে কাজ করে অথবা তাদের মা যখন অন্যের বাড়ীতে কাজ করে তখন তারা ছোট ভাই বোন দেখাশুনা করে, গৃহস্থালী কাজে মাকে সাহায্য করে, কাজ শেষে বাবা বাড়ি ফিরলে তাকে খাওয়া দেওয়া, যত্ন করা, মেয়ে শিশুর প্রতিদিনের কাজ। এই সব দরিদ্র পরিবারগুলো শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝে না। আবার বুঝলেও দরিদ্র পরিবারগুলো অর্থের জন্য তাদের ছোট ছেলে-মেয়েকে কাজে দেন। এভাবে শিশুদের স্বাভাবিক গুণাবলি হারিয়ে যায়। শ্রমজীবী শিশুদের মধ্যে ২২ শতাংশ শহর এলাকায় কাজ করে, এর মধ্যে ১৯ ভাগই কন্যা শিশু, যার মূলত গৃহপরিচারিকার কাজে নিয়োজিত।

এমারগাও গ্রামে শিক্ষিত মহিলা অভিভাবক বা মা হচ্ছে প্রাইমারী স্কুল পাশ। কিন্তু বর্তমানে এমারগাওবাসী নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং নারী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা দুর হয়েছে। বর্তমানে এই গ্রামের মেয়ে শিশুরা ব্যাপকভাবে জয়নগর প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া করছে। প্রাইমারী স্কুল পাশ করে তারা পাঁচদানা উচ্চ বিদ্যালয় ও ভাওয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করছে। এই গ্রামের মহিলাদের লেখাপড়া পঞ্চম শ্রেণী-অষ্টম, শ্রেণী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। এই গ্রামে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ কোন মহিলা নাই। এই গ্রামে ব্রাক পরিচালিত স্কুলে দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা লেখাপড়া করছে। ব্র্যাক স্কুলে প্রতি কর্ম দিবসে ২ শিফটে ৮ থেকে ১২ টা এবং ১ থেকে ৪টা এই সময়ের মধ্যে প্রতি শিফটে ৩৬ করে ৭২ জন ছাত্রের

Dhaka University Institutional Repository

লেখাপড়ায় ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বালিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষাকর্মসূচিতে অভিভাবকদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরার ফলে এই গ্রামের ৫০ জন মেয়ে শিশু ব্র্যাক স্কুলে লেখা পড়া করছে। মেয়েরা শিক্ষিত হলে শিক্ষিত স্বামী পাওয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষিত মেয়ের বিয়ের সময় যৌতুক দিতে হয়না। এসব কারনে অভিভাবকরা কন্যা সন্তানের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। আবার মেয়েরা লেখাপড়া শিখে চাকুরি করছে বা বিভিন্ন উৎপাদন কর্মকান্ড নিয়োজিত হয়ে পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করছে। এর ফলে অভিভাবকদের কন্যা সন্তানের শিক্ষা দানের অনীহা দূর হয়েছে এবং মেয়েরা লেখাপড়ায় এগিয়ে এসেছে। ধর্মীয় শিক্ষাকে গ্রামবাসীর বিশেষ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। প্রায় প্রতিটি পরিবারের ছেলেমেয়ে মসজিদে যেয়ে কোরআন পাঠ করতে শিখে। ধনী পরিবারগুলো বাড়ীতে ইমাম রেখে ছেলেমেয়েদের কোরআন তিলওয়াত শেখান। মসজিদের ইমামকে গ্রামবাসী খুব শ্রদ্ধা করে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ইমামকে দাওয়াত করে খাওয়ান। এই গ্রামের ছেলেরা আটি বাজারে এবতেদায়ী মাদরাসায় লেখাপড়া করে। কেউ মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া সমাপ্ত করলে তাকে খুব সন্মান করা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান গ্রামবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

এমারগাও গ্রামের ২১৮ জন মহিলার শিক্ষার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। যা সারণী নং ৯- এ তুলে ধরা হলো-

সারণী নং- ৯: গ্রামীন অধিবাসীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (মহিলা)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার
নিরক্ষর	৪৭	২১.৫৬
স্বাক্ষর করতে জানে	৮২	৩৭.৬১
প্রাথমিক	৫৪	২৪.৭৭
এসএসসি	২৭	১২.৩৯
এইচএসসি	৮	৩.৬৭
স্নাতক	-	-
স্নাতকোত্তর	০	-
মোট	২১৮	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত সারণীর তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায় স্বাক্ষর করতে জানে এরকম মহিলার সংখ্যা ৩৭.৬১ শতাংশ অর্থাৎ ৮২ জন। এরপর রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষালাভকারী মহিলার সংখ্যা ২৪.৭৭ শতাংশ অর্থাৎ ৫৪ জন। এই গ্রামের সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে নিরক্ষর রয়েছে ২১.৫৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৭ জন। এছাড়া এসএসসি পাশ রয়েছে ১২.৩৭ শতাংশ অর্থাৎ ২৭ জন এবং এইচএসসি পাশ ৩.৬৭ শতাংশ অর্থাৎ ৮ জন। এই গ্রামে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ কোন মহিলা নাই।

৪.১৩ গ্রামের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি অবস্থা

কোন ব্যক্তির সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের প্রথম পদক্ষেপ। একজন ব্যক্তিতার মৌলিক শারীরিক চাহিদা মেটানোর পরেই শুধুমাত্র অন্য বস্তুগত ও অবস্তুগত চাহিদা মেটানোর কথা চিন্তা করতে পারে। এই দিক থেকে বিচার করলে, মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য অবশ্যিক শর্তগুলোর মধ্যে পুষ্টিমানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

পুষ্টিহীনতা হলো সেই অবস্থা যখন কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, সাধারণ কর্মক্ষমতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে পুষ্টিহীনতা শরীরের একটি ক্রমবর্ধমান পুষ্টি সমস্যার গুরু, যা প্রাথমিকভাবে খাদ্য ঘাটতি অর্থাৎ সুষম ও পরিমিত খাদ্যের অভাব থেকে সৃষ্টি হয়। অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে মানব দেহে ব্যাপক পুষ্টিহীনতার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে ওজন হ্রাস পায়। বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে শারীরিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অপুষ্টিজনিত কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ফলে তারা সহজে রোগাক্রান্ত হয়। অসুস্থতার ক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসা না করা হলে রোগ সেরে গেলেও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে পুষ্টি পরিস্থিতির আরও অবণতি হয়। এইভাবে ক্রমাগত অসুস্থতা ও পুষ্টিহীনতার নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া তাদের অকালমৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়ায় (চৌধুরী, ১৯৯৭ : ৯৮)। পুষ্টিহীনতায় প্রাথমিকভাবে দেহতন্তু ও দেহস্থ তরল পদার্থ কমে যায় ফলে দেহের ওজন কমে এবং বিশেষত শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। তন্তু এবং ইন্দ্রিয় ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে স্বাস্থ্যগত অবণতি ঘটতে থাকে এবং মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। অর্থাৎ পুষ্টিহীনতার নানা মাত্রা, প্রকৃতি ও তীব্রতার উপরেই নির্ভর করে এর দৈহিক বহিঃপ্রকাশ।

পুষ্টিহীনতাকে দারিদ্র্যের একটি চরম প্রকাশ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। দারিদ্র্যকে বিভিন্ন উপাদান ও মাত্রা দিয়ে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মতভেদ

Dhaka University Institutional Repository

থাকলেও পুষ্টিহীনতার যে দারিদ্র্যের একটি চরম রূপ, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ কম। একটা দেশের পুষ্টিগতমান কতগুলো পর্যায়ক্রমিক অবস্থার সমষ্টি যা একক মাপকাঠি দ্বারা পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। কতকগুলি নির্ণায়কের মাধ্যমে পুষ্টিমানের বিভিন্ন দিক পরিমাপ করা সম্ভব যা দ্বারা সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি অবস্থা বিশ্লেষণ করা যায়। এই পরিমাপের একটি প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণের উপর আলোকপাত করা। পুষ্টিমান নির্ণয়ের আরেকটি প্রত্যক্ষ নির্ণায়ক হচ্ছে দেহের পরিমাপ। এই পরিমাপ অবশ্য খাদ্য গ্রহণ ছাড়াও বয়স, লিঙ্গ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশিত Houschold Expenditure Surbey, 1995/96 অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহন পরিমাপে ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে পল্লী জনগোষ্ঠীর ৪৭.১ শতাংশ দারিদ্র সীমার নিচে এবং দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালরি গ্রহন পরিমাপে ২৪.৬ শতাংশ ছিল চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে। ১৯৯৬২-৬৪ সালের তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ব অংশে খাদ্যগ্রহণ এবং শিশুদের দৈহিক পরিমাপ (Anthropometry) সম্পর্কিত তথ্যাবলী সর্বপ্রথম United States Development of Health, Education and Welfare (DHEW. 1966) এর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান অনুষদ (INFS) যথাক্রমে ১৯৭৫/৭৬ এবং ১৯৮১/৮২ সালের পুষ্টি বিষয়ক জরিপ কাজ সম্পন্ন করে। BIDS ১৯৮১/৮২ সালে তুলনামূলক বড় আকরে এ বিষয়ে দুটি জরিপ সম্পন্ন করে। বিবিএস (Bandgladesh Bareau of Statistics) Houschold Expenditure Survey (HES)- র মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ ও আয় বন্টনের উপর নিয়মিত তথ্যসংগ্রহ করে থাকে। BBS ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে খানাভিত্তিক, খাদ্যভিত্তিক, খাদ্যগ্রহন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। অপরপক্ষে পুষ্টিবিষয়ক জরিপ ২৪ ঘন্টায় খাবারের ওজন নেয়ার উপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। গ্রামীন এলাকায় মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণ ১৯৬২-৬৪, ৮৮৬.০০ গ্রাম, ১৯৭৫-১৯৭৬, ৮০৭.৩০ গ্রাম, ১৯৮১-৮২, ৭৬৪.৫০ গ্রাম, ১৯৮২-৮৩, ৭৪৬.৩০ গ্রাম এবং ৮১০.০০ গ্রাম। এই জরিপগুলোতে শুধুমাত্র বুকের দুধ ত্যাগ করেছে এমন শিশুকে গণ্য করা হয়েছে। গ্রামীন বাংলাদেশে মৌসুম ও অঞ্চল ভেদে খাদ্য গ্রহণে পার্থক্য দেখা যায়। কিছু কিছু অঞ্চলে যখন ঘরে নতুন ফসল উঠে তখন খাদ্য গ্রহণের মাত্রা বাড়ে। আবার অনেকক্ষেত্রে এক জেলার সাথে অন্য জেলার খাদ্য গ্রহণে পার্থক্য দেখা যায়। গ্রামীন বাংলাদেশে ১৯৭৫-

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৬ সালের পুষ্টিমান জরিপের তথ্য থেকে জানা যায় খাদ্য গ্রহণে ব্যাপক মৌসুমী ও আঞ্চলিক পার্থক্য রয়েছে। খাদ্য গ্রহণে প্রধানত নির্ধারিত হয় ঐ এলাকার খাদ্য উৎপাদন দ্বারা, যা আবার অনুসরণ করে স্থানীয় খাদ্য উৎপাদন চক্রকে। আর জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যভোগ প্রধানত নির্ধারিত হয় দেশজ খাদ্য উৎপাদন দ্বারা।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিখাতে ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্য বর্তমান। বাংলাদেশের ৭০% নারী পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন। বিশ্ব ব্যাংকের এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে বাংলাদেশে একজন পুরুষ গড়ে প্রতিদিন ২,২৯৯ ক্যালরী গ্রহন করেন আর একজন নারী গ্রহণ করেণ গড়ে ১,৮৪৯ ক্যালরি। বাংলাদেশে ৫ বছরের নীচে ছেলে শিশুর তুলনায় মেয়ে শিশুর ক্যালরি গ্রহণের হার শতকরা ১৬ ভাগ কম। ৫-১৪ বছরের বয়সের ছেলের তুলনায় মেয়ে ১১ ভাগ কম এবং প্রাপ্তবয়স্কদেয় মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী শতকরা ২৯ ভাগ একজন নারীকে ১৫ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত একজন পুরুষের তুলনায় বেশি ক্যালরি যুক্তি খাবার গ্রহণ করায় কথা কিন্তু বাস্তবে হয় উল্টো। বাংলাদেশে এই বয়সে ৫৮% নারী রক্তশূণ্যতায় ভোগেন। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ হাজার নারী প্রসবকালীন জটিলতার মারা যান। ইউনিসেফের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবছর প্রায় ৬,০০,০০০ জটিল ডেলিভারী কেসের মধ্যে ৯০% পরিচালিত হয় অল্পশিক্ষিত ধাত্রীর হাতে। প্রতিবছর প্রায় ৪ মিলিয়ন নারী সন্তান জন্ম দেন, এদের মাঝে ৬০% রক্তশূণ্যতা এবং অপুষ্টিতে ভোগেন। দেশের ৭০% নারী নিরাপদ মাতৃত্ব ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। ফলে নারী বিকলাঙ্গ ও কম ওজনের শিশুর জন্ম দেয়। বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ শিশু জন্মায় কম ওজনে এবং প্রতি হাজারে ৫টি শিশু মারা যায় জন্মের সময় পুষ্টিহীনতার কারণে। প্রসূতি মাতৃমৃত্যুর হার ৪.২% একজন নারী তখনই চিকিৎসার সুযোগ পায় যখন সে গৃহকর্মের অনুপুযোগী হয়ে উঠে। গ্রামের দরিদ্র নারীর চেয়ে শহরের বস্তীবাসী নারী অনেক বেশি সংক্রামক ব্যাধির শিকার। বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবই এর মূল কারণ। এশিয়ায় ১৪% পল্লী নারী এবং ৩২% শহুরে নারী বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে পানি দূষণ এক মারাত্মক পর্যায়ে উপণীত হয়েছে। দেশের ৫২ টি জেলার টিউবয়েলের পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল দেশে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অগ্রাধিকারযুক্ত বিষয়। জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে জনস্বাস্থ্যের বিশেষ ভূমিকা আছে। উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা সুস্বাস্থ্যের জন্য একটি অন্যতম শর্ত। এটা আত্মমর্যাদারও প্রতীক। সমগ্র বিশ্বে এখনো ২.৫ বিলিয়নের অধিক জনগোষ্ঠী স্যানিটেশন সুবিধা বঞ্চিত যার মধ্যে ১.০ বিলিয়নেরও বেশি শিশু। আর এই স্যানিটেশন সুবিধা না থাকার করুণ পরিণতি হচ্ছে প্রায় প্রতি সেকেন্ডে একটি শিশুর মৃত্যু। যে কারণে জাতিসংঘ কর্তৃক সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (MDG) নির্ধারণে স্যানিটেশন কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গতি এখনো কাঙ্খিত রূপ লাভ করেনি। সামগ্রিকভাবে স্যানিটেশন বিষয়ে জনসচেতনতা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে অধিকতর স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে তা জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। উন্নত স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তোলা, ঘরে ঘরে স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন ও তা ব্যবহার এবং সকল কাজে নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিকরণের মাধ্যমে এ অজর্ন সম্ভব। জনস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশ উন্নয়নে স্যানিটেশনের গুরুত্ব সকলের মাঝে তুলে ধরার অঙ্গীকার নিয়ে জাতিসংঘ ২০০৮ সালকে 'স্যানিটশন বর্ষ' হিসেবে পালন করার ঘোষণা দিয়েছে। এ বিচেনায় বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছে। এ উদ্যোগ সফল জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে উলেখযোগ্য অবদান রাখবে। বিশেষ করে পরিবেশ বান্ধব স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরিবার পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

স্যানিটেশন এবং দারিদ্র্য এর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। মৌলিক সেবা ও সুবিধা বঞ্চিত হওয়ার কারণে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন। দৈনন্দিন জীবকা অর্জনের জন্য শারীরিক সক্ষমতার উপর নির্ভরশীল দরিদ্রদের ক্ষেত্রে অসুস্থতার কারণে আয় এবং উৎপাদন হ্রাস পাওয়া অতিরিক্ত প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। কাজেই সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যথাযথভাবে গড়ে তোলা। আর এর সরাসরি প্রভাব রয়েছে দরিদ্র্যতার

Dhaka University Institutional Repository

উপর। এসব ব্যবস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মলতঃ মহিলা ও শিশুদের রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা, অসুস্থতা এবং মৃত্যুর ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। বিগত দুদশকে (১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে) হাসপাতলের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। প্রতি দশ লক্ষ মানুষের জন্য হাসপাতালের সংখ্যা ৬ থেকে বেড়ে হয়েছে ১০ এবং ১৯৮০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা প্রতি ৪০০০ জনের জন্য একটি থেকে কমে প্রতি ৩০০০ জনের জন্য একটি হয়েছে। একই সময়ে চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় আড়াইগুণ বেড়ে প্রতি লাখ মানুষে এ সংখ্যা ১০.৫ থেকে বেড়ে ২৪.১ হয়েছে। একই সময়ে রেজিস্টার্ড নার্সের সংখ্যা প্রায় চারগুণ বেড়ে প্রতি লাখ মানুষের জন্য ৩.৪ থেকে হয়েছে ১৩.৬ জন। বাংলাদেশের শতকরা ৯৫ ভাগ শিশু এখন ভিটামিন 'এ' কার্যক্রমের আওতায় এসেছে। শতকরা ৭৮ শতাংশ পরিবারের সদস্যরা এখন আয়োডিনযুক্ত লবন খান। শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষে এখন টিউবয়েলের পানি পান করেন (আর্সেনিক ঝুঁকিসহ)। ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত ৮৪.৭৩ ভাগ পরিবারকে স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। একশ ভাগ শিশুই পোলিও টিকা পেয়ে থাকে। ৬১% মানুষ ডায়রিয়া হলে খাবার স্যালাইন পান করেন। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষাক্ষেত্রে উলেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও বিপুল সংখ্যক মানুষ মানব উন্নয়নের এসব সূচক বিচারে এখনও অবহেলিত ও বঞ্চিত রয়ে গেছে।

এমারগাও গ্রামের এলাকাবাসীরা বেশিরবাগ তিনবেলা ভাত খেয়ে থকেন। ভাতকে তারা প্রধান খাদ্য হিসাবে গণ্য করেন। কিছু ধনী পরিবার যারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন তারা সকালের নাস্তা রুটি খান। দরিদ্র্য পরিবাগুলো আটার দাম চাউলের দামের চেয়ে একটু কম বলে এক বেলা রুটিখান। পুষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞ বলে রুটি খাওয়াকে তারা দারিদ্র্যতা মনে করেন। ভাত-ডাল, শাক, মাছ-মাংস, সবজি এলাকাবাসীর দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত। এলাকার ধনী পরিবারগুলো সপ্তাহে দুই দিন মাংস, এবং দুটি মাছের তরকারি দিয়ে ভাত খান। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো ডাল, মাছ ও সবজি দিয়ে ভাত খান। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার গুলো সপ্তাহে তিনদিন মাছ চার দিন সবজি-ডাল দিয়ে ভাত আহার করেন। এই গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলো সাধরণত ডাল-ভাত, শাক-সবজি খেয়ে থাকেন। দরিদ্র পরিবার গুলোর খাদ্য তালিকায় মাছ থাকে সপ্তাহে এক অথবা দুইদিন। দরিদ্র পরিবারগুলো

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান খাদ্য শাক-ভাত। কৃষিজীবি পরিবারগুলোতে দুধের গরু থাকলেও তারা দুধ পান করার চেয়ে পার্শ্ববর্তী বাজারে বিক্রি করতে বেশী আগ্রহী। দরিদ্র পরিবারগুলো দারিদ্র্যতার কারণে দুধ পান না করে গোখাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে দুধ বিক্রি করতে বাধ্য হন। ধনী পরিবার গুলো নিয়মিত দুধপান করে এবং দুধকে তারা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাবার মনে করেন। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো দুধ-ডিম অনিয়মত হারে খান কিন্তু নিম্নবিত্ত দরিদ্র পরিবারগুলোর খাদ্য তালিকায় দুধ ডিম থাকে না। গ্রামের ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সদস্যরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যেলরি গ্রহন করে। কিন্তু নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের সদস্যরা প্রয়োজনী ক্যালরি গ্রহন করতে পারে না ফলে তারা পুষ্টিহীনতায় ভোগে।

এমায়গাও গ্রামবাসী মহিলারা পুষ্টি স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতিক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় সুবিধা বঞ্চিত একটি গোষ্ঠী। গ্রামবাসী গৃহকত্রী পরিবারের সবার শেষে এবং সর্বশেষ তলানীটুকু আহার হিসেবে গ্রহণ করে। পরিবারের পুরুষ সদ্যসরা আগে আহার করেন। তারপর ছেলে মেয়েরা আহার করেন। অনেক সময় গৃহকর্তাও ছেলে মেয়ে একসাথে আহার করলেও গৃহনেত্রীর সবার শেষে আহার করাটা একটা প্রচলিত প্রথা। যে কোন পরিবারে খাবারের ভাল অংশটুকু গৃহকর্তা অথবা ছেলের জন্য রাখা হয়, কিন্তু সেটা গৃহকর্তী বা মেয়ের জন্য থাকে না। খাদ্য গ্রহণের এই বৈষম্য পুরুষ কর্তৃক হচেছ না, এটা মেয়েরা নিজেরাই করছে। প্রচলিত মূল্যবোধ মেয়েদের ছোট বেলা থেকে এ ধরণের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধারক এবং বাহক নারীকে পুষ্টিহীন করে ফেলেছে। খাদ্য গ্রহণের এই ব্যবস্থার ফলে মেয়ে শিশু ছেলে শিশুর তুলনায় কম ক্যালরি আহার গ্রহণ কলে। ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে খাদ্য গ্রহণ কিছুটা সঠিক থাকলেও দরিদ্র পরিবারের মহিলারা মারাত্মক অপুষ্টির শিকার হয়ে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। এই গ্রামের ডেলিভারী কেসের মধ্যে ৯০% পরিচালিত হয় অপ্রশিক্ষিত ধাত্রীর হাতে। ধনী পরিবারের মহিলারা প্রসবের সময় হাসপাতাল বা মাতৃসদনে যায়। এই গ্রামের শিক্ষিত মহিলা নিরাপদ মাতৃত্ব ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের মহিলার প্রসবের সময় হাসাতালে যাওয়াক বাড়তি ঝামেলা মনে করে। সাম্প্রতিকালে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম এবং এনজিওগুলো নারীদের স্বাস্থ্যের যত্নের উপর বিশেষভাব নজর দিচেছ। এই গ্রামের মহিলার এখন মাতৃসদন অথবা

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও পরিচালিত টিকাদান কেন্দ্র থেকে টিটেনাসর টিকা গ্রহন করেন। প্রতিটি পরিবারের অভিভাবকরা টিকাদান কেন্দ্র যেয়ে শিশুদের ৬টি মারাত্মক রোগের টিকা গ্রহণ করেন এবং ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ান।

গ্রামবাসীরা অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অসচেতনতার কারনে রোগ ব্যাধিতে ঝাড়-ফুক এর আশ্রয় নেন। গ্রামের একাংশ লোকজন এখনও বিশ্বাস করে ঝাড় ফুক দিয়ে অসুখ ভাল হয় তাই তারা অসুখ হলে ফকির দরবেশের দ্বারস্থ হন। গ্রামের অধিবাসী রোগ ব্যাধিতে কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহন করে। এছাড়া গ্রামবাসীর বৃহৎ অংশ কেরানীগঞ্জ উপজেলা হাসপাতাল, আটি বাজারস্থ ডাক্তারখানা ও ঢাকায় এসে চিকিৎসা গ্রহণ করে।

চরম দরিদ্র পরিবার ছাড়া এই গ্রামে পরিবার প্রতি একটি করে টিউবয়েল আছে। এই গ্রামের ভাড়াটিয়া অধিবাসীরা বাড়ীওয়ালার টিউবয়েলের পানি ব্যবহার করে এবং দরিদ্র পরিবারগুলো নিকটস্থ বাড়ির টিউবয়েলের পানি ব্যবহার করে। অধিকাংশ গ্রামবাসী খাওয়া, গোসল কাপড় কাচা, রান্না ও থালা বাসন ধোয়ার কাজে টিউবয়েলের পানি ব্যবহার করে। এই গ্রামে ৯টি পুকুর রয়েছে। পুকুরের পানি গোসল ও কাপড় কাচার কাজে ব্যবহার করা হয়। শুস্ক মৌসুমে পুকুরে অল্প পানি থাকে। টিউবয়েল প্রসারের কারনে পুকুরের গুরুত্ব কমে গিয়েছে। সরকার উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হোক বরাদ্দের ২০% অর্থ স্যানিটেশন খাতে ব্যয় নির্দিষ্টকরণ স্যানিটেশন উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখছে। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণে এ ব্যবস্থা সহায়ক হয়েছে। এই গ্রামে স্যানিটারী ল্যাট্রিন আছে ১৫৮টি এবং কাঁচা, অন্যান্য ব্যবস্থা রয়েছে ২৭টি। বৈদ্যুতিক সুবিধা আছে ১৭৩টি পরিবারে এবং ১২টি পরিবার বৈদ্যুতিক সুবিধা নাই। নিম্নের ১০- নং সারণীতে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উপাদানের তথ্য উপস্থাপন করা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং- ১০: গ্রামীণ স্বাস্থ্যের সহায়ক উপাদান সম্পর্কিত তথ্য

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উপাদান	সংখ্যা	শতকরা হার
টিউবয়েল	১৪১	৭৬.২২
পুকুর	৯	৪.৮৬
অন্যান্য	৩৫	১৮.৯২
স্যানিটারী ল্যাট্রিন	১৫৮	৮৫.৪১
অন্যান্য ব্যবস্থা	২৭	১৪.৫৯
বৈদ্যুতিক সুবিধা আছে	১৭৩	৯৩.৫১
বৈদ্যুতিক সুবিধা নাই	১২	৬.৪৯

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উপাদানের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় টিউবয়েলের সংখ্যা ৭৬.২২ শতাংশ পুকুরের সংখ্যা ৪.৮৬ এবং অন্যান্য ব্যবস্থা আছে ১৮৯২ শতাংশ। লাট্রিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন আছে ৮৫.৪১ শতাংশ এবং ১৪.৫৯ শতাংশ অন্যান্য ব্যবস্থা। বৈদ্যুতিক সুবিধা আছে ৯৩.৪১ শতাংশ পরিবারে এবং বৈদ্যুতিক সুবিধা নাই ৬.৪৯ শতাংশ পরিবারে।

৪.১৪ স্থানীয় সরকার এমারগাও গ্রাম প্রেক্ষিতে

স্থানীয় সরকার হচ্ছে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অন্যতম প্রধান একটি বিষয়। তৃনমূলে বা দেশের স্থানীয় পর্যায়ে মানব উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এবং ক্ষুধা দারিদ্র্যের অবসানে প্রয়োজন শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। বাংলাদেশে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ইউনিয়ন। ইউনিয়ন হচ্ছে কতিপয় গ্রাম এর সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় সরকারি সংস্থা।

বাংলাদেশে স্বাধীন হওয়ার পর থেকেও এ পর্যন্ত বেশ কিছু রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। আর এ দেশের জাতীয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রামের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। গ্রামের প্রাচীন রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তে নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর প্রবর্তন হিসারে এদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম ইউনিয়ন

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের নির্বাচন হয়, ফলে তখন স্থানীয় সরকার গঠিত ও সংগঠিত হয়। বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির নামই হল ইউনিয়ন পরিষদ। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় একটি ইউনিয়ন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ লাভ করেছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি কালে এর নাম ছিল ইউনিয়ন বোর্ড, ১৯৫৯ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর ইউনিয়ন কাউন্সিলের পরিবর্তে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। গ্রাম পর্যায়ে এই তিন ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই (ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনয়ন কাউন্সিল, ইউনয়ন পরিষদ) নির্বাচিত সংগঠন, যদিও এগুলির শাসনতন্ত্র এবং কার্যাবলির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানের ইউনিয়ন পরিষদই হলো গ্রামীন বাংলাদেশের সর্বনিম্নস্তরের আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত রাজনৈতিক একক।

এর পরের উঁচু পর্যায়ে রাজনৈতিক একক ছিল জেলা বোর্ড (বর্তমানে জেলা পরিষদ)। এটা ছিল জেলা পর্যায়ের। ১৯১৯ সালের স্থানীয় সরকারি আইনের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ বা বোর্ড গঠিত হয়েছিল। এর পূর্বে ১৮৮০ সালের চৌকিদারী আইনের অধীনে প্রতিগ্রামে বা কয়েক গ্রাম মিলে একটি করে পঞ্চায়েত ছিল। ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী প্রতি জেলায় জেলা বোর্ড এবং মহাকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড গঠনের নিয়ম ছিল। তখন থেকে জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড, মহাকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং গ্রাম পর্যায়ে পঞ্চায়েত স্থানীয় বিষয়াদি দেখাশুনার কাজ করে আসছিল। ইউনিয়ন বোর্ড (বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ) গুলো স্থানীয় বিষয় যেমন শান্তিরক্ষা এবং ছোট খাট বিবাদ মীমাংসা করার কাজ ইত্যাদি করত। জেলা বোর্ডের একটি অধীনস্থ সংগঠন হিসেবে গ্রাম উন্নয়নের সব কাজ ইউনিয়ন বোর্ডকে করতে হতো এবং কখনো কখনো সরকার প্রদত্ত খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র বন্টন করতো। প্রতি ইউনিয়নকে একটি করে স্কুল পরিচালনাও এর কাজের অন্তর্ভূক্ত ছিল। রাস্তাঘাট, সেতু নির্মান ও সংরক্ষণ ইত্যাদি ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির অন্যতম।

পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের মৌলিক গণতন্ত্রী বলা হতো। ১৯৬২ সালে আয়ুব খান দেশকে একটি নতুন শাসনতন্ত্র দেন। এতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে দেশে প্রেসিডেন্ট ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচন করতো। পরবর্তীকালে মৌলিক গণতন্ত্রীর সংখ্যা প্রতি প্রদেশে ৬০ হাজার উন্নীত করা হয়। যেহেতু মৌলিক গণতন্ত্রীরা দেশের সর্বময় প্রশাসক প্রেসিডেন্ট এবং আইন সভার সদস্য নির্বাচন করার ক্ষমতা লাভ করে, তাই তারা দেশে যথেষ্ট ক্ষমতাবান হিসেবে বিকাশ লাভ করে। কারণ, মৌলিক গণতন্ত্রীরা সব সময় আইয়ুব খানে পক্ষে কাজ করত এবং আউয়ুব খান ও তাদেরকে খুশী রাখার জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করত। ফলে তারা গ্রামের একটি নতুন ক্ষমতাধর কিন্তু দালাল শ্রেণীর সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতার পর, ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পুনগঠিত হয়। আগের ইউনিয়ন কাউন্সিলের স্থলে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

কেরানীগঞ্জ উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে এমারগাও গ্রাম তারানগর ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভূক্ত। তারানগর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের অধীন এমারগাও গ্রাম। একজন চেয়ারম্যান ৯ জন সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্য নিয়ে তারানগর ইউনিয়ন পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত। ২০০৩ সালে সর্বশেষ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান চেয়ারম্যানের বাড়ি চন্ডীপুরা গ্রামে। এমারগাও গ্রামের পার্শ্ববর্তী জয়নগর গ্রাম ৯ নং ওয়ার্ডের অন্ত র্ভূক্ত। ১৯৯৭ ও ২০০৩ সালের নির্বাচন জয়নগর গ্রাম থেকে একজন মেম্বার নির্বাচিত হন। তারানগর ইউনিয়নের ৩ জন মহিলা সদস্যের বাড়ি যথাক্রমে জয়নগর গ্রামে, কাঁঠালতলী গ্রামে ও নীমতলি গ্রামে।

এমারগাও গ্রাম হচ্ছে আটি বাজার সংলগ্ন। আটি বাজার থেকে ৫০০ গজ দুরে তারানগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় অবস্থিত। তিন বছর পরপর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তারানগর ইউনিয়ন পরিষদে সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৩ সালে। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে একজন চেয়ারম্যান ও ৯ টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত চেয়ারম্যান স্থানীয় পর্যায়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য নিয়োজিত থাকেন। গ্রামবাসীরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়। গ্রামে জমির সীমানা, জমির আইল, ফসল কাটা, বিবাহ বিচ্ছেদ, যৌতুক প্রদান ইত্যাদি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে চেয়ারম্যান ও তার অধীনে নির্বাচিত সদস্যরা মিলে এসব গোলযোগ মীমাংসা করেন। জমি-জমা সংক্রান্ত গোলযোগই গ্রামে বেশি দেখা যায়। চেয়ারম্যান

Dhaka University Institutional Repository

অনেকসময়ে নিজে একাই দুই পক্ষের লোকদের একসঙ্গে নিয়ে গোলযোগের মীমাংসা করেন। অনেক সময় স্থানীয় মাতুব্বর, ইউপি সদস্যদের নিয়ে একটি নির্দিষ্ট দিনে সালিশ ডেকে গোলযোগ মীমাংসা করেন। ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাত মিটায় সামাজিক অনুষ্ঠানের (বিবাহ) ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার প্রশাসনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহে, স্থানীয় সংসদ সদস্য, ত্রানসামগ্রী বিতরণকারী সংস্থা, কোন উচ্চস্তরের প্রশাসনিক ও পুলিশ অফিসারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। সরকারি ত্রান সামগ্রী এই সংগঠনের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ সরকারি ঋণ বা রিলিফ বন্টনের মাধ্যমে গ্রামবাসীর সঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে দেয়। রাস্তা পুল এবং জেলা কাউন্সিল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জেলা পরিষদের সকল সম্পত্তি দেখাশুনা করা ইউনয়ন পরিষদের কাজ। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ হাত দেওয়া ও বাস্তবায়ন করণও ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব সরকারি পূর্ত কর্মসূচিসমূহ এই সংগঠনের মাধ্যমেই সম্পূর্ন হয়।

গ্রামীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, স্বাস্থ্য সুবিধার অপ্রতুলতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশে সরকার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃদ্ধদের জন্য জরা সম্বন্ধীয় সুবিধা প্রদানের বিষয়টি প্রথমবারের মত সংযোজিত করে। এই লক্ষ্যে ১৯৯৭ সাল হতে সমগ্র দেশে সীমিত আকারে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি চালু করা হয়। এজন্য প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় সারা দেশে প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫ জন মহিলা এবং ৫ জন পুরুষ বয়স্ককে মাসিক ১০০ টাকা করে স্থানীয় ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত কমিটি ভাতা প্রার্থী বাছাই করে। বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় বসবাসরত অধিকাংশ মানুষই দারিদ্র্য পীড়িত। আর গ্রামের এই দরিদ্র অসহায় ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। বাংলাদেশে বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, পরিত্যক্তা এবং বিচ্ছিন্ন মহিলাদের সংখ্যা সমগোত্রীয় পুরুষদের সংখ্যার চাইতে ১৪ গুণ বেশি। (BBS, 2000)। বাংলাদেশের পুরুষ শাসিত সমাজে স্বামী ও অভিভাবকহীন এসব মহিলারা গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই আর্থিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং প্রথাগত ভাবে বৈষম্যের শিকার। এ ক্ষেত্রে মহিলারা শুধু নিজেরাই নয়, তাদের দ্বারা

পরিচালিত পরিবারগুলোও দরিদ্র। সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পল্লী অঞ্চলের বিধবাও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাদের দুঃখ দুদর্শা লাঘব করার জন্য ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের ৫ জন বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে এককালীন নগদ ১০০ টাকা হারে সাহায্য মঞ্জুর করেন। এই সাহায্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর থেকে সমগ্র দেশে প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫ জন অতি দরিদ্র দুস্থ ও অসহায় বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদেরকে নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এ বাবদ সরকার জাতীয় বাজেটে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখে। সে হতে প্রতি বছরই জাতীয় বাজেটে এই পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয়। এই ভাতা কার্যক্রমের অধীনে ২ লক্ষেরও অধিক মহিলা নিয়মিতভাবে ভাতা পাচ্ছেন। বয়স্ক ভাতার জন্য গঠিত কমিটিই বিধবা ভাতার বিষয়টি পরিচালনা করেন। তারানগর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা এমারগাও ও জয়নগর গ্রাম থেকে ৫ জন পুরুষ ও মহিলাকে বয়স্ক ভাতা এবং ৫ জন বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের ভাতার জন্য নির্বাচিত করেন। এরা এখন নিয়মিত বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থমহিলা ভাতা পাচ্ছেন।

তারা নগর ইউনিয়নের পূর্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় পূর্বে উচ্চ বংশ মর্যাদার লোকজন চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচিত হতেন। বর্তমানে অর্থসম্পদের কাছে বংশ মর্যাদার গুরুত্ব হারিয়েছে। তারানগর ইউনিয়নে যারা অর্থসম্পদের মালিক অর্থাৎ ধনী কৃষক বা ব্যবসায়ী তারাই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমান তারাগনর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একজন নামকরা ঠিকাদার, যার দুই ছেলে ইতালী প্রবাসী। আবার মধ্যবিত্ত পরিবারে শিক্ষিত যুবকরা স্থানীয় রাজনীতি ও নেতৃত্বে অংশ নিচেছন। শিক্ষিত বলে এরা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বর্তমানে চেয়ারম্যান সহ ৪ জন সদস এসএসসি পাশ। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় গ্রামে একটা উৎসব উৎসব ভাব বিরাজ করে এবং গ্রামের কৃষক, মজুর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, রিকশাচালক, কামার, কুমার ইত্যাদি শ্রেণীর লোকজন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ইউণিয়ন পরিষদ তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা এখনও তাদের হাতে আসে নাই। ক্ষমতা এখনও ধনী ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীর হাতে। এমরাগাও গ্রামে মাতুব্বর শ্রেণীর লোকজন এখনও জমি, টাকা

Dhaka University Institutional Repository

পয়সা এবং মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ইউপির কার্যক্রম পরিচালনায় নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতির কথা শোনা যায়। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা গেলে মাস্তানি, চাঁদাবাজি, নারী নির্যাতন ইত্যাদি কমে যাবে। স্থানীয় প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে এদেশের গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে।

১৯৯৭ সালে সরকার নতুন স্থানীয় সরকার আইন প্রণয়ন করে এবং এই আইনে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত পদে সরাসরি নারীদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়, যা এ দেশে নারীর আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত। বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের অবস্থান অসম। সমাজে নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় অধঃস্তন। এ ধরনের একটি সামাজিক অবকাঠামোয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ নারীদের কাছে অনেক বড় কটি প্রত্যাশার বাস্তবায়ন। নারীরা নির্বাচন করেছেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে, তাদের সাথে ছিল অনেক কর্মী এবং সমর্থক। প্রত্যক্ষ নির্বাচন নারীরা পছন্দ করেছেন কারন আগে সংরক্ষিত আসনে যে পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচন হতো তাতে করে মহিলা প্রার্থীর ইউনিয়নের সকল মহিলাদের সাথে তেমন যোগাযোগ থাকতো না। কারণ তিনি সদস্য হয়েছেন নিজের যোগ্যতায় নয়, পারিবারিক সূত্রে বাবা বা স্বামীর যোগ্যতায়। এ ধরণের নির্বাচনে প্রার্থী এবং ভোটদাতা দুজনেই দুজনের কাছে প্রায় অপরিচিত থাকেন। এখন প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নারী প্রার্থীরা সকলের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যাগুলো জেনে নিতে পারেন, এতে করে ভোটারদের প্রকৃত মতামত জানা যাবে। পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারীদের কিছুটা করুণার চোখেও পুরুষ সদস্যরা দেখতেন, কারণ তিনিতো প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেননি। কাজেই অর্থনৈতিক অথবা ইউনিয়নের উন্নয়নমূলক কোন কর্মকান্ডের দায়িত্ব দেয়া হতো না। পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কম ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব নারী সদস্যকে দেয়া হতো।

১৯৯৭ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ছুটির দিন বাদ দিয়ে ২৩ দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় দেশের ৪,২৭৪ টি ইউনিয়ন পরিষদে। ১৯৯৭ সাল থেকে নারীদের জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে তিনটি করে সংরক্ষিত আসন রাখা হয়। ঐ বছর থেকে প্রথম নারীরা সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। ৪,২৭৪টি ইউনিয়ন-এর জন্য নির্বাচিত নারী সদস্য হলেন ১২,৮২২

Dhaka University Institutional Repository

জন। এ ছাড়া ঐ সকল ইউনিয়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ৪৪,১৩৪ জন নারী। ২০০৩ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে ১৪ মাচ পর্যন্ত নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক দ্বিতীয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৯৭ সালের তুলনায় ২০০৩ সালের নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কিছুটা কমেছে। ৯৭ এর চেয়ে ২০০৩ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছটা কম হলেও সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীরা যুক্ত হয়েছেন- এটা নারীর অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়নের একটি উলেখযোগ্য দিক। ১৯৯৭ সালে এমারগাও গ্রাম থেকে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৩ সালে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। ৯ নং ওয়ার্ডের বর্তমান মহিলা সদস্যর বাড়ি জয়নগর গ্রামে। তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত একটি সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যদের যে ধরণের সুযোগ সুবিধা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে অংশ নেয়ার কথা তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। এছাড়া পুরুষ সহকর্মী, চেয়ারম্যান, গ্রামের টাউট-বাটপারদের গুজব ছড়ানো, নেতিবাচক মন্তব্য, অবজ্ঞা অবমূল্যায়ন নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে অতীতের অনেক ভাল উদ্যোগই অমনোযোগিতা, উদাসীনতা বা রাজনৈতিক কারনে সাফল্য পায়নি। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের যে দাবি এবং তা বাস্তবায়ন করার যে উদ্যোগ তার অনেকটুকুই সহজ হয়ে যাবে, যদি তৃনমূল পর্যায়ের স্থানীয় প্রশাসনে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা যায়। সামাজিক কুসংস্কার, নারী নির্যাতন-নিপীড়ন দূর করার পাশাপাশি নির্বাচিত নারী সদস্যদের মাধ্যমে শিক্ষাও সচেতনতার বিস্তার বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। সেই পথ ধরেই প্রতিষ্ঠিত হবে নারীর ক্ষমতায়ন।

৪.১৫ এমারগাও গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান এদেশ। দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। কৃষি প্রধান দেশ বলে বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। কৃষির প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে গ্রাম। কাজেই গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে প্রতিটি গ্রাম। গ্রামের উন্নতির ভিতরেই সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিহিত। বাংলাদেশে শতকরা ৭৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে, জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৩৭ ভাগ আসে কৃষি খাত থেকে এবং মোট কর্মসংস্থানের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বহন করে গ্রামীন খাত। তাই বাংলাদেশের গ্রাম উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম বলতে সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের অর্থাৎ গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্য যে কার্যক্রম গৃহীত হয় তাকেই বুঝানো হয়।

আশির দশকের আগে মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধিকেই উন্নয়নের সূচক মনে করা হতো। কিন্তু মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেই সব সময় মানুষের জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন কম হলেও অনেক গরিব দেশে জীবনের মান উন্নত হতে পারে। সেজন্য দরিদ্র মানুসের অনুকূলে বস্তুগত লভ্যতা বাড়িয়ে তাদের জীবনের উৎকর্ষ সাধনকেই বর্তমানে উন্নয়ন বলে গণ করা হয়। দরিদ্র মানুষের জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মাত্রার বস্ত্রের সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদনের অন্যতম উৎপাদনশীল উপাদান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এভাবে দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য একদিকে দেশের সার্বিক উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন অন্যদিকে এই উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল যাতে দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্রিয় থাকে তার প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন।

গ্রাম উন্নয়ন বলতে গ্রামের সকল শ্রেণী বা সকল স্তরের মানুষের সম-উন্নয়ন বোঝায়। অর্থাৎ শ্রেণী, বর্ণ স্তরভেদে গ্রামীন সকল মানুষের জীবনধারণের মানে সমান উন্নয়ন ঘটলে তাকেই বলা হয় গ্রাম উন্নয়ন। গ্রাম উন্নযনের জন্য কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যেমনঃ

(১) গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের সমউন্নয়ন নিশ্চিত করা ;

(২) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা;

(৩) স্থানীয় সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা

(৪) উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কৃষি পন্যের সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান;

(৫) কৃষি ও অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা

Dhaka University Institutional Repository

(৬) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন করে দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠীকে উপার্জনমূলক কাজে উৎসাহিত করা এবং নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

(৭) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা

(৮) স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় জনগণকে উদ্যোগী ও দক্ষ করে তোলা।

(৯) গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিতে সকল স্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

দরিদ্রের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকার ও এনজিওদের কর্মসূচি রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা যথা কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ইত্যাদির ব্যাপক কমূসূচি রয়েছে। এছাড়া কাজের বিনিময়ে খাদ্য ভিজিডি -কমূসূচি, গ্রামীন সড়ক/অবকাঠামো/ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি সৃষ্টি করা হয়েছে। সমাজ কল্যাণ, নারী ক্ষমতায়ন, শিশু অধিকার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা দেখা যাচ্ছে যা জনগণকে উন্নত জীবনে উৎসাহিত করবে। ১৯৯৭-৯৮ সালে দেশের গ্রামীন দারিদ্র বিমোচনের তিনটি কর্মসূচি মুল বাজেটের সাথে অর্ন্তভূক্ত হয়। এই তিনটি কর্মসূচির মধ্যে-

ক. বায়োজ্যষ্ঠ দরিদ্র লোকের জন্য বয়স্ক ভাতা।

খ. দরিদ্রদের জন্য গৃহায়ন তহবিল গঠন এবং

গ. যুবকদের জন্য একটি কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

২০০০ সালে বিশ্ব ব্যাংক থেকে যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় তাতে বাংলাদেশে দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য কতগুলো নীতি তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক মনে করে বাংলাদশের উন্নয়ন সহযোগী অন্যান্য সংস্থা ও তাদের সাথে একমত যে মোটামুটি পাঁচটি তত্ত্বের উপর ঘুরে দাড়ানো

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব হলে এদেশকে দারিদ্র্যের অভিশাপ হতে মুক্ত করা যাবে। স্তম্ভগুলো হচ্ছে,

ক. সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা।

খ. ব্যাপক ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি যার দ্বারা দারিদ্রজন গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধিকরণ;

গ. দ্রুত মানব সম্পদ উন্নয়ন বিশেষ করে নারীদের দক্ষতা বাড়ানো

ঘ. আর্থিক সংকট, আর্থ সামাজিক বৈষম্য ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর নাজুকতা হ্রাস করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া এবং

ঙ. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন। এই পাঁচটি সুচককে সমন্বিত একটি প্যাকেজ কর্মসূচি হিসেবে রূপদান করা সম্ভব হলে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার দ্রুত হ্রাস পাবে।

দারিদ্র বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সরকারিও বেসরকারী সংস্থাগুলো কেরানীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। কেরানীগঞ্জ উপজেলা থেকে এই সংস্থাগুলো কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন গ্রাম সমূহে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এমারগাও গ্রামে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার গ্রাম উন্নয়ন মূলক কর্মসূচির সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডঃ

সমগ্র দেশ ব্যাপী সমবায় ও অনানুষ্ঠানিক গ্রাম নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিআরডিবি বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় পল্লী উন্নয়ন বিশেষ করে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। গ্রামভিত্তিক কৃষক, মহিলা ও বিত্তহীন সমবায় সমিতির সদস্য-সদস্যাদের কৃষিও অকৃষি উপার্জনমূলক প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ করে বিআরডিবি। পল্লী উন্নয়ন বোর্ড থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও প্রাথমিক সমিতিগুলো মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিপন্য এবং কৃষি উৎপাদনের উপকরণ যেমন- সার, বীজ, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। বিআরডিবি দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পে গ্রামীন ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রর্মে সংশ্লিষ্ট করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে। এসব কর্মসূচিতে দরিদ্র মহিলাদের

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের আওতায় শাক-সবজির চাষ, পয়ঃনিষ্কাশন, রাস্তাঘাট উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যক্রম রয়েছে।

এমারগাও গ্রাম কৃষকসমিতি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতাভুক্ত। এই কৃষক সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০ জন। এই ২০ জন সদস্যের নিজস্ব পুঁজি আছে। এই সমিতি শেয়ার ক্রয় করেছে সাত হাজার ছয়শত দশ টাকা। এই কৃষক সমিতি ২০০৪-২০০০৫ সালে বোরো ধান চাষ করার জন্য ৭০,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছে। এই ঋণের টাকা তারা সুদ-মুলে ফেরত দিয়েছে এবং ঋণ গ্রহণকারী সবাই পুরুষ। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সর্বনিম্ন ২০০০ হতে ৫০০০ টাকা সর্বোচ্চ ১৫০০০ হতে ২০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করে। এই ঋণের বার্ষিক সুদের হার ১৫%। এমারগাও গ্রামের বিত্তহীন মহিলা উন্নয়ন সমিতি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড থেকে ঋন নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শাক-সবজির চাষ করেছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাংলাদেশ যুব ও ক্রীড়া যন্ত্রনালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর। এর উপর দেশের বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। এই অধিদপ্তর দেশের যুবসমাজকে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করেছে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আর্থিক সহযোগিতা দানের মাধ্যমে তাদেরকে কর্মে নিয়োজিত করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮১ সাল থেকে বিভিন্ন সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেডে ১২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯৫৩ জন যুব ও যুব মহিলাকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। যাদের মধ্যে এ সময় পর্যন্ত ১২ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৯৮ জন যুবও যুব মহিলা স্বাবলম্বী হয়েছে। এজন্য সরকার সকল জেলায় ও উপজেলায় এ অধিদপ পতরের অধীনে যুব উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালুর চেস্টা করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব এবং যুব মহিলাদেরকে মোট ৫৩৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। একটি পরিবারে ৫ জন সদস্যকে ঋণ প্রদান করা হয়। সর্বোচ্চ জনপ্রতি ৫০০০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা। ঋণ প্রদানের ৪র্থ সপ্তাহ থেকে শতকরা ৮% Sevice Charge-এ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। যে কোন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা, সেলাই, মাটির জিনিস, আচার তৈরী, চশমার লেন্স তৈরি, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-মোটাতাজাকরণ, মৎস্য চাষ, বনায়ন,

Dhaka University Institutional Repository

সবজি চাষ, বাঁশ ও বেতের কাজ, ব্লক ও বাটিক প্রিন্ট, পাম্প চালনা, গাড়ি চালনা, কম্পিউটার অপরেট ও মেরামত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে। দেশের যুব সমাজকে দেশ গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করা হয় এমারগাও গ্রামের পার্শ্ববর্তী ঘাটারচর গ্রামে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমিতি আছে যার সদস্য সংখ্যা ৫০ জন। এমারগাও গ্রামে যুব মহিলা সমিতি আছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক বিভাগ নামে একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাগ নারীদের জন্য জাতীয় মহিলা একাডেমী, মহিলা উন্নয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং ঢাকায় কর্মজীবি মহিলাদের জন্য হোস্টেল নির্মান ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহন করে। পরে আরো দুটি নতুন নারী উন্নয়ন প্রকল্প সংযোজন করে। সব প্রকল্পগুলো ১৯৭৮-৮০ সালে অন্তবর্তীকালীন দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময়ে নারী ইস্যুকে কল্যাণমূলক থেকে উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে মহিলা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা যায় যা পরবর্তীতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়। কেরানীগঞ্জ উপজেলার মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপজেলা কার্যালয় থেকে কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে তার কার্যক্রম চালায়। এই কার্যালয় থেকে মহিলাদের বিভিন্ন উপার্জন মূলক কাজের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। ৩০-৩৫ জনের একটা সমিতি করা হয় এবং সমিতির মাধ্যমে ঋন প্রদান করা হয়। এই সংস্থার সব ঋণগ্রহীতা মহিলা। এই সংস্থা থেকে বার্ষিক ৫% ভাগ হার সুদে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ হাজার এবং সর্বনিন্ম ২০০০ হাজার পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগলপালন, সেলাই মেশিন ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। এই মন্ত্রণালয় থেকে বিধবা ভাতাও স্বামীপরিত্যক্তা ভাতা দেওয়া হয়। এই অধিদপ্তর মহিলাদের টাইপিং, কম্পিউটার ও এমব্রডয়ারীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই কার্যালয় থেকে মহিলাদের বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কেরানীগঞ্জে অবস্থিত মহিলা অধিদপ্তরের সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুরদুরান্ত গ্রাম থেকে মেয়ে ও বয়স্ক মহিলা এসে সেলাই এর প্রশিক্ষণা গ্রহণ করে। ১ বছর মেয়াদী কোর্সে ২০০৬ সালে ৪৪ জন প্রশিক্ষণনাথী ছিল। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নির্যাতিত মহিলাদের পক্ষে কাজ করে। এই অধিদফতর নির্যাতিত মহিলাদের আইনী সহায়তা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ২০০৬ সালে এই অধিদপ্তর স্বামী কর্তৃক

Dhaka University Institutional Repository

পরিত্যক্ত পরিবার কর্তৃক পরিত্যাক্তা এবং সমাজ কর্তৃক নির্যাতিত মহিলাদের যে আইনি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, তার তালিকা হলো- জানুয়ারি-৪টা, ফেব্রুয়ারি- ৪টা, মার্চ- ৫টা, এপ্রিল- ৩টা নারী ১টা শিশু, মে- ৫টা, জুন- ৪টা, জুলাই- ৩টা, আগস্ট- ১টা, সেপ্টেম্বর- ৫টা, নভেম্বর- ৪টা এবং ডিসেম্বর- ৪টা, মোট ৪৩ জন মহিলাকে আইনি সহায়তা প্রদান করে। এমারগাও বাসী নির্যাতিত মহিলারা কেরানীগঞ্জ উপজেলাস্থ মহিলা অধিদপ্তর থেকে আইনি সহায়তা গ্রহন করে।

সমাজ সেবা অধিদপ্তর

কেরানীগঞ্জ উপজেলাস্থ সমাজ সেবা অধিদপ্তর দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুদ মুক্ত ঋণ দেয়। দরিদ্র লোকজনযাতে তাদের দারিদ্র্যতা মোচন করে স্বকর্মে নিয়োজিত হতে পারে, সেই জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা, গরু-ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন, চিঁড়া-মুড়ি তৈরি, কৃষি কাজ, শাক-সবজি চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর সুদমুক্ত ঋণ দেয় । এই অধিদপ্তর থেকে সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৩,০০০টাকা ঋণ দেওয়া হয়। ঋণ গ্রহনের ২ মাস পর থেকে কিস্তি পরিশোধ শুরু হয় এবং ১০ মাসের মধ্যে পুরো ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এবং ১০% (Service charge), সমিতির নিজস্ব তহবিল জমা থাকে। সমাজসেবা অধিদপতর মহিলা-পুরুষ উভয় পক্ষকে ঋণ প্রদান করলেও ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তারানগর ইউনিয়নে সমাজসেবার অধিদপ্তরের ৬টা মাতৃকেন্দ্র আছে। এই মাতৃকেন্দ্র থেকে মা ও শিশুর যত্ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হয়। মাতৃকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটা গ্রামের ২০-২৫ জন মহিলা একত্রিত হয়ে সমিতি গঠন করে। এই সমিতির মধ্য থেকে Leadership Grow করা হয়, তাদেরকে আত্মসচেতন করা হয়, যাতে তারা মা ও শিশুর পরিচর্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। মাতৃকেন্দ্রের ঋণ গ্রহনকারী সদস্যদের লেখা পড়া জানতে হয়। মাতৃকেন্দ্রের জন্য ১৫ হাজার থেকে ৯০ হাজার পর্যন্ত বিশেষ অনুদান দেওয়া হয়। ২০০৬ সাল পর্যন্ত তারা নগর ইউনিয়ন বিশেষ বরাদ্দ ছিল ২ লক্ষ ১২ হাজার ৫ শত টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৩ জন। এই অধিদপ্তর থেকে বয়স্ক ভাতা ও মুক্তি যোদ্ধা ভাতা প্রদান করা হয়। তারানগর ইউনিয়নের ১০৮ জন বয়স্ক ভাতা, ৭৫ জন বিধবা এবং ১২ জনকে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করা হয়। শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এসিড দগ্ধদের সমাজসেবা অধিদপ্তর নূন্যতম ১০ হাজার টাকা সুদ মুক্ত ঋণ প্রদান করে।

মৎস্য অধিদপ্তর

কেরানীগঞ্জ উপজেলা মৎস অধিদপ্তর এলাকার যুবকও জেলেদের মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ করেন। এই অধিদপ্তর এলাকার বেকার যুবকদের মৎস্যচাষের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন সচেতন করেন এবং মৎস চাষের জন্য প্রশিক্ষন প্রদান করেন। এই অধিদপ্তর মাছের খাবার, রেনু পোনা তৈরি, মাছ মোটাতাজারকন, পুকুর খনন, ঝাল কেনা প্রভৃতি কার্যক্রমের জন্য স্বল্পসুদে ঋন প্রদান করেন। কেরানীগঞ্জ উপজেলার প্রায় প্রতিটা গ্রামে এই অধিদপ্তরের কার্যক্রম রয়েছে। এমারগাও গ্রামের মৎস অধিদপ্তরের কোন কার্যক্রম নাই। কারন এমারগাও গ্রামে বেলে মাটি। বেলে মাটির পানি ধারন ক্ষমতা কম থাকে যার কারনে এই গ্রামের পুকুরগুলোতে পানি খুব অল্প থাকে। পানি ধারন ক্ষমতা সৃষ্টি করতে অনেক সময় লাগে এবং এটা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। তাছাড়া জমির দাম বেড়ে যাওয়ায় কারনে গ্রামবাসীরা পুকুর সৃষ্টিতে আগ্রহী নয়।

আশা

কেরানীগঞ্জ উপজেলায় আশার ৬টি ব্রাঞ্চ আছে। গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় জনগনকে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে আশার প্রতিষ্ঠা। আশা গ্রামীন দরিদ্রদের নিয়ে দল গঠন করে তাদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার যুক্ত করার চেষ্টা করে। যাদের মাসিক আয় ১২০০ টাকার বেশী নয় তারাই আশার সেবাগ্রহীতা হিসেবে নির্বাচিত হন। ঋন গ্রহনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তৃনমূল পর্যায়ে সাধারনত ২০ সদস্য সমন্বয়ে একটি করে দল গঠন করা হয়। আশা সেবা গ্রহীতাকে দলীয় শৃঙ্খলা, দলীয় সংহতি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। আশা সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে টার্গেট গ্রুপকে আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করে থাকে। আশা দরিদ্র জনগনের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে উপার্জনমূলক কাজের জণ্য ঋন প্রদান করে।

এমারগাও গ্রামে আশার একটি সমিতি আছে। এই সমিতির সদস্যারা বেশিভাগ ভূমিহীন ও দু:স্থ মহিলা। এরা আশা থেকে ঋন গ্রহন করে গরু ছাগল পালন ও সবজি চাষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছে। অর্থ

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জনকারী কাজের জন্য আশা সর্বোচ্চ ২৩ হাজার এবং সর্বনিম্ন ৫ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে। শতকরা ১৫% হারে ৪৫ কিস্তিতে আশার প্রদত্ত ঋন পরিশোধ করতে হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষি কাজের জন্য আশা পুরুষদেরও ঋন প্রদান করে থাকে।

গ্রামীন ব্যাংক

১৯৮৩ সালে এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে এ ব্যাংক স্থাপিত হলেও এর কার্যক্রম একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পের অধীনে ১৯৭৬ সালে শুরু হয়। ভূমিহীনদের নিয়ে গড়ে ওঠা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয় গ্রামীন ব্যাংক প্রকল্পের মধ্য দিয়ে। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যস্থায় যাদের সুযোগ নেই এমন দুস্থদের সহজ ঋন সুবিধা তাদের দোরগোড়ায় পৌছে দিয়ে তাদেরকে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম নিয়োজিত করা ও ঋন পরিশোধ প্রক্রিয়া তদারক ও পরিচর্যা করা এমন ধারনা নিয়েই এই ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। দেশের অভাবী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা দুর্বল, সবচেয়ে অসহায় সেই নারী সমাজকে এই ব্যাংক ঋনের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করে। সাধারনত যাদের চাষের জমির পরিমান আধা এককের অধিক নয় এবং যেসব পরিবারে মোট সম্পদের মূল্য এক একর জমির বাজার মূল্যের বেশি নয় তারাই গ্রামীন ব্যাংকের ঋন পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। ঋন নিতে আগ্রহী এমন সমমনা পাঁচজন নারী অথবা পুরুষ মিলে একটি দল গঠন করতে হয়। ঋন গ্রহনের জন্য ব্যাংকে কোন জামানতের প্রয়োজন হয় না। গ্রামের হত দরিদ্র, অসহায় নারীদের নিয়ে ব্যাংকিং, জামানতবিহীন ব্যাংকিং ছোটদলভিত্তিক ব্যাংকিং, ব্যাংকিংএর সেবা গ্রামের নরনারীদের দরোজায় পৌছে দেয়া, দেশের দরিদ্র নারীদের জীবনে এনেছে অমূল পরিবর্তন।

কেরানীগঞ্জ উপজেলায় গ্রামীন ব্যাং কের ৫টি শাখা আছে। আটি বাজারে অবস্থিত গ্রামীন ব্যাংক থেকে এমারগাও গ্রামের একটি সমিতি ঋন নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও সবজি চাষ করছে। গ্রামীন ব্যাংক খাস জমিতে ধান উৎপাদন, ক্ষুদ্র সবজি বাগান, ফল-মূল ও মসল্লা উৎপাদন, দুগ্ধবতী গাভী পালন, ধান ও ডাল ভাঙ্গানো, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, চিড়ামুড়ি তৈরি, সেলাই ও পোশাক তৈরি, গরু মহিষের গাড়ি, ভ্যান তৈরি, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন প্রভৃতি কাজের জন্য ঋন প্রদান করে থাকে। শতকরা ১৫ টাকা সুদে ৪২০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা ঋন দেয়। তবে ভূমিহীনদের যৌথ উদ্যোগ হিসেবে গভীর নলকূপ

প্রকল্প, মৎস্য খামার, হ্যাচারী ও চিংড়ি চাষ প্রকল্পে পাঁচ হাজারের অধিক টাকা ঋন দেয়। এছাড়া গ্রামীন ব্যাংক আট হাজার টাকা ব্যয়ে সিমেন্ট পিলারের উপর টিনের ঘর তৈরির জন্য একটি ঋন কর্মসূচি চালু করেছে। এছাড়া উচ্চ শিক্ষা ঋন, শিক্ষাবৃত্তি, ঋনবীমা ও ভিক্ষুকদের ঋনের ব্যবস্থা করেছে এই ব্যাংক।

ব্র্যাক

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ ও নিঃস্ব মানুষের জণ্য জরুরি ও তাৎক্ষনিক সাহায্য এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ফজলে হাসান আবেদের উদ্যোগে ব্র্যাক নামে ছোট একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে সেই সংগঠন বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ব্র্যাক দেশব্যাপী কাজ করছে সেই সমস্ত দরিদ্র/অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নের জন্য যারা অশিক্ষিত, রোগগ্রস্ত, শারীরিক ও মানসিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রতিবন্ধী ও অসহার্থ । ও গ্রাম উন্নয়নের জন্য ব্র্যাক বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ব্র্যাকের প্রধান কার্যক্রম হল গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্রদের মধ্যে বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজের জণ্য স্বল্প সুদে ঋন দান করা। সাধারনত ক্ষুদ্র ব্যবসা, গরু-ছাগল পালন, হাঁস-মুরগীর চাষ, মাছ, বাঁশ-বেত মাটির কাজ, কুটির শিল্প প্রভৃতি উপার্জনমূলক প্রকল্পের জন্য ব্র্যাক ঋন সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া নকসি কাঁথা ও হস্তশিল্প প্রকল্পের জন্য ব্র্যাক ঋন দেয়। দারিদ্র্য বিমোচনের জণ্য ব্র্যাকের মূল উদ্যোগটি হল লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার মধ্যে দিয়ে গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলা। ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠন গঠনের জন্য লক্ষিত জনগেষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ক্ষদ্রু দলে সংগঠিত হওয়ার জণ্য উৎসাহিত করা হয়। ক্ষুদ্র দলে সংগঠিত হলে ব্র্যাক সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্যা সম্পর্কে ও সমাজের আত্ম উন্নয়নের বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়। ৫ জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলোর সমন্বয়ে গ্রাম সংগঠন করা হয়। মহিলা ও পুরুষদের পৃথক গ্রাম সংগঠন গঠন করা হয়। প্রতিটি গ্রাম সংগঠনের সদস্য সংখ্যা হবে সর্বনিম্ন ২৫ জন, সর্বোচ্চ ৪০ জন। ৫ থেকে ৮টি ক্ষুদ্র দল নিয়ে এই গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলা হয়। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের পরিবারের মোট জমি ৫০ শতক বা তার কম বা সমপরিমান মূল্যের সম্পদ আছে, বৎসরে কমপক্ষে ১০০ শত দিন কায়িকশ্রম বিক্রি করে যাদের বয়স ১৮ থেকে ৫৫ বৎসরের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে

Dhaka University Institutional Repository

বসবাস করে, শ্রম দেওয়ার যোগ্যতা আছে অন্য কোন এনজিওর সঙ্গে যুক্ত নয়, বড় ধরনের ঋনী বা দায়বদ্ধ নয়- এই ধরনের গ্রামীন জনগোষ্ঠীকে লক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা এবং এই সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীই ব্র্যাক গ্রাম সংগঠনের সদস্য হওয়ার যোগ্য। লক্ষিত জনগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত ব্র্যাক গ্রাম সংগঠন সদস্য এবং শহর দরিদ্র সংগঠন সদস্যগন সঞ্চয় এবং ঋন গ্রহন করে থাকে। অতি দরিদ্রের Tup ঋন ৭ হাজার থেকে ৯ হাজার টাকা, MELA ঋন-২৫ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। VO সদস্যরা প্রথমবার ঋন নেয়ার ক্ষেত্রে ১০০০ থেকে ৫০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে প্রতিবার ২০০০ থেকে ৩০০০ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হয়।

ব্র্যাক পরিচালিত দরিদ্র শিশুদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসুচি। বিশেষভাবে মেয়ে ও শিশু শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে এই শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৮৫ সালে ২২টি এক কামরাবিশিষ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই কর্মসূচি শুরু হয়। ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে ৮ থেকে ১০ বৎসরের শিশু এবং BEOC মডেল কর্মসূচিতে ১১ থেকে ১৪ বৎসরের শিশুরা অন্তর্ভূক্ত হয়। এই NFPE কর্মসূচিতে ৩১ হাজার উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলে ১০ লক্ষ্যের ও বেশি দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে ৬৬ শতাংশ মেয়ে শিক্ষার্থী। ব্র্যাকের এই শিক্ষা কর্মসূচিতে ৫ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষাকে একজন শিক্ষকের মাধ্যমে ৪ বৎসরের সম্পূর্ণ করা হয়, ছুটির দিন কমিয়ে এবং ক্লাশ সময় বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে করা হয়। এমারগাও গ্রামে ব্র্যাক পরিচালিত একটি স্কুল আছে। এই গ্রামের দুই জন মহিলা শিক্ষকের মাধ্যমে দুই শিফটে ৬০ জন ছেলে-মেয়ে এই স্কুলে পড়ালেখা করে।

প্রশিকা

১৯৭৬ সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে গ্রামীন দরিদ্রদের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রশিকা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামের খেটে খাওয়া শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র কৃষক ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি প্রশিকার টার্গেট গ্রুপ। এছাড়া শহরের কম মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিক, দরিদ্র মহিলা, যুবক-যুবতীরাও প্রশিকার সেবার আওতাভুক্ত। ১৫-২০ জন গ্রামীন পুরুষ বা মহিলা সমন্বয়ে একেকটি দল গঠন করা হয়। এরপর সদস্য/সদস্যদের উন্নয়ন শিক্ষ প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন শিক্ষার মধ্যে রয়েছে মানব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা। এসবের মাধ্যমে উন্নয়ন অংশগ্রহনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধির জন্য কৃষি, সেচ, পশুপালন, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ, রেশম কর্মসূচি, হাঁস-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সামাজিক বনায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে রয়েছে প্রশিকার বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বয়স্ক শিক্ষা, ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য বাবা-মাকে উদ্বুদ্ধকরনে কর্মসূচি, আট বছরের বেশি বয়সী মেয়েদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি এবং নিরক্ষরদের জন্য গ্রাম পাঠচক্র কর্মসূচি আর স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য-পুষ্টি শিক্ষা, টিউবয়েলের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানিয় জলের ব্যবস্থাকরন, কম খরচে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন, সামাজিক বনায়ন, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষাকারী কৃষি কর্মসূচি প্রশিকার কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। এছাড়া শহরে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ও গ্রামীন গৃহায়ন কর্মসূচি এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন মাধ্যমে প্রশিকা দরিদ্রদের কল্যানে কাজ করেছে।

উপরোক্ত কর্মসূচি নিয়ে কেরানীগঞ্জ উপজেলায় প্রশিকার ৪টি ব্র্যাঞ্চ কাজ করছে। এমারগাও গ্রামে প্রশিকার একটি সমিতি রয়েছে। কেরানীগঞ্জ উপজেলায় প্রশিকার ৮০০ শত সমিতি রয়েছে। এই গ্রামের অধিবাসীরা প্রশিকা থেকে কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ, প্রভৃতি কার্যক্রমের জন্য ঋন দিয়েছে। প্রশিকা সর্বনিম্ন ১ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার পর্যন্ত ঋন প্রদান করে। শতকরা ১৪% হার লাভে ১ বৎসরের মধ্যে ঋন পরিশোধ করতে হয়। ঋন গৃহীতাদের সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋন পরিশোধ করে স্যানিটারী ল্যাট্রিনের জন্য বিনাসুদে ঋন দেওয়া হয়। প্রশিকা থেকে ঋন গ্রহন করে সবজি চাষ ও গরু পালন করে সমিতির সদস্যদের আর্থিক অবস্থা পূর্বের থেকে ভাল হয়েছে বলে জানিয়েছেন এমারগাও গ্রাম প্রশিকা সমিতির সদস্যরা।

পঞ্চম অধ্যায়

গ্রামের মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে অংশগ্রহন

বাংলাদেশের মহিলারা যুগ যুগ ধরে শোষিত অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থা ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীকে করে রাখা হয়েছে অবদমিত। নারীর মেধা ও শ্রমশক্তিতে শুধুমাত্র সাংসারিক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। দেশ ও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নারীকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। প্রচলিত জাতীয় আয় (GDP) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষদের উৎপাদনশীলতা যেখানে প্রায় ৯৮ শতাংশ হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীদের উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ গণনা করা হয়। গৃহস্থালীর কাজ প্রায় এককভাবে নারী করেছেন। কিন্তু কোথাও নারীদের গৃহস্থালীর কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হয় না। তাই বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীদের এই অদৃশ্য অবদান স্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যা পরিমাপ করা হয় না (রহমান ১৯৯৮)। নারীরা পৃথিবীর মোট কাজের তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পাদন করেন। কিন্তু মোট আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ তারা পান (উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৯৯৭)। উৎপাদনশীল পরিমন্ডলে নারীকে সবসময়ই অনুৎপাদনশীল এবং কেবল ভোগকারী হিসেবে মনে করা হয়। অথচ নারী সমানভাবে ভোগকারী এবং উৎপাদনকারী (সুলতানা: ১৪০৮ : ১৯৩)।

দেশের শতকরা ৪৬ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ হচ্ছে নারী। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজের উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশগ্রহন ব্যতীত জাতীয় সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের নারী সমাজকে বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ বিভিন্ন কর্মসূচি। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রামীন সমাজব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্র ঋন প্রকল্প, স্বনির্ভর কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার ফলে মহিলারা বিভিন্ন উৎপাদন কর্মকান্ডে নিয়োজিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছেন। পরিবারে অর্থ উপার্জনকারী সদস্য হওয়ায় পরিবারে তাদের মতামতের মূল্য বেড়েছে। মহিলারা সমাজে নিজেদের অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, ও এনজিও কর্তৃক শিক্ষাক্ষেত্র বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে মেয়েরা অধিকহারে স্কুলে যাচ্ছে এবং অভিভাবকদের মেয়ে সন্তানদের লেখাপড়ার প্রতি উদাসীনতা দুর হয়েছে। ধনী কৃষক পরিবারের মেয়েরা আগের তুলনায় অধিক হারে স্কুলে ও কলেজে পড়ছে এবং চাকুরিতে যোগ দিচ্ছে। শিক্ষা গ্রহণের জন্য এবং অর্থ উপার্জনকারী বিভিন্ন পেশায় অধিকহারে মেয়েদের অংশগ্রহনের ফলে পরিকল্পিত পরিবার তৈরির প্রবণতা এবং মেয়েদের বিয়ের বয়স আগের তুলনায় বেড়েছে। গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারের মহিলারা পূর্বে যারা পর্দার অন্ত রালে ছিল ব্যাপক হারে তারা এখন বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছে। ঘরের চার দেয়ালের গন্ডী পেরিয়ে জীবন ও জীবিকার তাগিদে বেছে নিয়েছে অর্থ উপার্জনের পথ। পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য দারিদ্র্যতা দুর করার জন্য, এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের জন্য এই গ্রামের মহিলারা যোগদান করেছে বিভিন্ন ধরণের কর্মক্ষেত্রে। এই গ্রামে ৭৪ জন উপার্জনকারী মহিলা আছে যারা বিভিন্ন অর্থ উপার্জনকারী পেশায় নিয়োজিত হয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে ও গ্রাম উন্নয়নে অবদান রাখছে এদের মধ্যে ১৬ জন বিভিন্ন অফিস ও কলে-কারখানায় চাকুরি করে আর ৫৮ জন স্বকর্মসংস্থানে, (যথা- ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষিকাজ, পশু-পাখী পালন) ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত আছেন। এইসব কর্মজীবি মহিলাদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করে অর্থ উপার্জনকারী কাজে তাদের অংশগ্রহন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সম্পৃক্ততা সংশ্লিষ্ট বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষনাধীন গ্রামের উপার্জনকারী মহিলাদের বয়স

এমারগাও গ্রামের অর্থউপার্জনকারী মহিলাদের বয়স কাঠামোর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। কেননা যে কোন ব্যক্তির বয়স দ্বারা তার কাজ করার শারীরিক যোগ্যতা ও সামর্থ্য বুঝা যায়। কর্মজীবি মহিলাদের বয়স কাঠামো ১১ নং সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং ১১ : গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের বয়স

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
১৫-১৯	২	২.৭০
২০-২৪	১৫	২০.২৭
২৫-২৯	২৬	৩৫.১৪
৩০-৩৪	১২	১৬.১২
৩৫-৩৯	৯	১২.১৬
৪০-৪৪	৪	৫.৪১
৪৫-৪৯	৩	৪.০৫
৫০-৫৪	২	২.৭০
৫৫-৫৯	১	১.৩৫
৬০+	-	-
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারণীর তথ্যে দেখা যায় সর্বাধিক সংখ্যক কর্মজীবি মহিলা রয়েছে ৩৫.১৪ শতাংশ অর্থাৎ যাদের বয়স ২৫-২৯ বছর এমন ২৬ জন। এরপর রয়েছে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সের আধিক্য যার শতাংশ ২০.২৭ অর্থাৎ ১৫ জনের। ৩০-৩৪ বছর বয়সের কর্মজীবি মহিলা রয়েছে ১৬.২২ শতাংশ অর্থাৎ ১২ জন। আরও রয়েছে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সের ২.৭০ শতাংশ অর্থাৎ ২ জন। ৩৫ থেকে ৩৯ বছর বয়সের মহিলা রয়েছে ১২.১৬ শতাংশ অর্থাৎ ৯ জন। ৪০-৪৪ বছর বয়সের কর্মজীবি মহিলা রয়েছে ৫.৪১ শতাংশ অর্থাৎ ৪ জন, ৪৫-৪৯ বয়সের রয়েছে ৪.০৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩ জন। ৫০-৫৪ বছর বয়সের রয়েছে ২.৭০ শতাংশ অর্থাৎ ২ জন এবং ৫৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সের আছে ১.৩৫ শতাংশ অর্থাৎ ১জন। ৬০ বছর বয়সের উর্ধ্বে কোন কর্মজীবি মহিলা এই গ্রামে নেই।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের উপার্জনকারী মহিলা পরিবারের সদস্যসংখ্যা

বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারগুলোতে পূর্বে সদস্য সংখ্যা বেশি থাকত। বর্তমানে শিক্ষার বিস্তার এবং ছোট পরিবারের গুরুত্ব অনুধাবন করে সবাই পরিকল্পিত পরিবার গঠনের উদ্যোগী হয়েছেন। এমারগাওবাসী ৭৪ জন কর্মজীবি মহিলার পরিবারে সদস্য সংখ্যার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা জাতীয় গড় পরিবারের সদস্য সংখ্যার কাছাকাছি। নিম্নের ১২ নং সারণীতে উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যার তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং ১২: পরিবারের সদস্য সংখ্যা

পরিবারের সদস্য সংখ্যা	সংখ্যা	শতকরা হার
১	-	-
২	৫	৬.৭৬
৩	২১	২৮.৩৮
৪	২৫	৩৩.৭৮
৫	১৪	১৮.৯২
৬	৬	৮.১১
৭	১	১.৩৫
৮	১	১.৩৫
৯	১	১.৩৫
১০	০	
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারণীর তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা যায় ৪ সদস্যের পরিবার রয়েছে সর্বাধিক ৩৩.৭৮ শতাংশ অর্থাৎ ২৫ জন মহিলার। এরপর সর্বাধিক রয়েছে ৩ সদস্যের পরিবার ২৮.৩৮ শতাংশ অর্থাৎ ২১ জন মহিলার। এরপর রয়েছে ৫ সদস্যের পরিবার ১৮.৯২ শতাংশ অর্থাৎ ১৪ জনের। ৬ সদস্যের পরিবার ৮.১১ শতাংশ অর্থাৎ ৬ জনের আছে। ২

সদস্যের পরিবার আছে ৬.৭৬ শতাংশ অর্থাৎ ৫ জন মহিলার। ৭, ৮ ও ৯ জন করে সদস্য রয়েছে ১টি করে পরিবারে যার শতকরা হার ১.৩৫ ভাগ। ১ এবং ১০ সদস্যের কোন পরিবার গবেষণাধীন উত্তরদাতা সদস্যর নাই।

পরিবারের পুরুষ সদস্য সংখ্যা

বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে পিতৃতান্ত্রিক এবং পিতৃসূত্রীয় সমাজ বলে পুত্র সন্তানই বাবা মার সম্পত্তি দেখাশুনা করে ও পরিবারের দায়-দায়িত্ব গ্রহন করে। বাংলাদেশের পরিবারের প্রধান অর্থউপার্জনকারী ব্যক্তি হন পুরুষ সদস্য। তাছাড়া পুরুষ প্রধান সমাজে বাবার সামাজিক প্রতিপত্তি, মান-সম্মান, যশ-খ্যাতি ইত্যাদি পিতা থেকে পুত্রে বর্তায়। গবেষণাধীন এসব কর্মজীবি মহিলা পরিবারে পুরুষ সদস্য গুরুত্বপূর্ন স্থান দখল করে আছে। এসব দিক বিবেচনা করে গবেষণাধীন পরিবারের পুরুষ সদস্য সংখ্যার তথ্য সংগ্রহ করে হয়। যা নিম্নের ১৩ নং সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

সারণী নং ১৩: পরিবারে পুরুষ সদস্য সংখ্যা

পুরুষ সদস্য সংখ্যা	সংখ্যা	শতকরা হার
১	১৫	২০.২৭
২	৩১	৪১.৯০
৩	১৭	২২.৯৭
৪	৮	১০.৮১
৫	২	২.৭০
৬	১	১.৩৫
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারণীর তথ্যে দেখা যায় গবেষণাধীন উপার্জনকারী মহিলা পরিবারে সর্বাধিক ৪১.৯০ শতাংশ অর্থাৎ ৩১টি পরিবারে ২ জন করে পুরুষ সদস্য রয়েছে। ৩ জন পুরুষ সদস্য রয়েছে ২২.৯৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৭টি পরিবারে। ১ জন করে পুরুষ সদস্য রয়েছে ২০.২৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ টি পরিবার। ৪ জন পুরুষ সদস্য আছে ১০.৮১ শতাংশ অর্থাৎ ৮টি

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারে। ৫ জন পুরুষ সদস্য রয়েছে ২.৭০ শতাংশ অর্থাৎ ২টি পরিবারে এবং ১ জন করে পুরুষ সদস্য আছে ১.৩৫ শতাংশ অর্থাৎ ৬টি পরিবারে।

উপার্জনকারী পরিবারের মহিলা সদস্য সংখ্যা

বাংলাদেশের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে এখানে পুরুষকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। গ্রামীন বাংলাদেশের সমাজ তথা পরিবারে কন্যা সন্তান ও মহিলাদেরকে অনুৎপাদনশীল ও পরিবারের বোঝা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বর্তমানে নারী সমাজ এই প্রচলিত মূল্যবোধকে ভেঙে দিয়ে বেছে নিয়েছে অর্থ উপার্জনের পথ। শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, রাজনীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর অংশগ্রহন আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের সাধারণ মহিলারা জীবন ও জীবিকার তাগিদে বেছে নিয়েছে অর্থ উপার্জনের পথ। এই সব অর্থ উপার্জনকারী মহিলারা একদিকে যেমন পরিবারের বাড়তি আয়ের উৎস অন্যদিকে চরম দরিদ্র্য পরিবারের মহিলারা পুরুষদের সাথে সমানভাবে বিভিন্ন পরিশ্রমী কাজে অংশগ্রহন করে জীবিকা নির্বাহ করছে ও পরিবার প্রতিপালন করছে। এর ফলে গ্রামীন সমাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মহিলা প্রধান পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে এবং পরিবারে মহিলা সদস্যের গুরুত্ব বাড়ছে। এইসব দিক বিবেচনা করে গবেষণাধীন উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবারের মহিলা সদস্য সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে যা সারণী নং ১৪ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং ১৪: পরিবারে মহিলা সদস্য সংখ্যা

মহিলা সদস্য সংখ্যা	সংখ্যা	শতকরা হার
১	১০	১৩.৫১
২	২৮	৩৭.৮৪
৩	২৭	৩৬.৪৯
৪	৬	৮.১১
৫	২	২.৭
৬	১	১.৩৫
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপিত সারণীর তথ্যে দেখা যায় ২ জন মহিলা সদস্য আছে ৩৭.৮৪ শতাংশ অর্থাৎ ২৮টি পরিবারে। এরপর আছে ৩ জন সদস্য পরিবার ৩৬.৪৯ শতাংশ অর্থাৎ ২৭টি পরিবার। ১০টি পরিবারে মহিলা সদস্য আছে ১৩.৫১ শতাংশ। ৪ জন করে মহিলা সদস্য আছে ৮.১১ শতাংশ অর্থাৎ ৬টি পরিবারে। ৫ সদস্যের পরিবার আছে ২.৭০ শতাংশ অর্থাৎ ২টি। ৬ জন করে সদস্যের মহিলা সদস্য রয়েছে ১.৩৫ শতাংশ অর্থাৎ ১টি পরিবারে।

গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবারের ধরণ

পরিবার মূলত একটি সামাজিক সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্যরা পরস্পর রক্ত সম্পর্কীয় সূত্রে এবং বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ। পরিবার একটি অকৃত্রিম এবং মৌলিক সামাজিক সংস্থা। সাধারণত পরিবার গড়ে ওঠে স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্তুতি নিয়ে। পরিবার একদিকে যেমন উৎপাদনের একক অন্যদিকে তা আবার ভোগের একক। বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজে পরিবারগুলো একাধারে উৎপাদন ও উপভোগের একক। সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ নানাবিধ প্রয়োজনের তাগিদে পরিবার জীবনের সূত্রপাত করে। পরিবার সমাজিক চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন রকম কর্ম সম্পাদন করে। পরিবার তার ভূমিকা ও কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমেই এর অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এবং গ্রামীন বাংলাদেশের পরিবারের আবেদন তাৎপর্যপূর্ন। পরিবারের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এমারগাওবাসী উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যা সারণী নং ১৫ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

সারণী নং ১৫: গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবারের ধরণ

পরিবারের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার
একক পরিবার	৭১	৯৫.৯৫
যৌথ পরিবার	৩	৪.০৫
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারণীর তথ্য বিশেষন করে দেখা যায় গবেষণাধীন এলাকার উপার্জনকারী মহিলাদের ৯৫.৯৫ শতাংশ অর্থাৎ ৭১ জনেরই একক

পরিবার। আর যৌথ পরিবার ৪.০৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩ জনের। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারনে যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়েছে। বর্তমানে একক পরিবারই পরিবারের সার্বজনীনরূপ। গবেষণা এলাকার তথ্য থেকে এ বিষয়টি বুঝা যায়।

উপার্জনকারী মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থান

বিবাহের মাধ্যমেই পরিবার গঠিত হয়। বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এমন একটি চুক্তি যার মাধ্যমে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা একত্রে বসবাস করার বৈধ ক্ষমতা লাভ করে, অর্জন করে পরিবার গঠনের যোগ্যতা, যা পরিনামে কর্তৃক পারস্পারিক অপরিহার্য অধিকার ও কর্তব্যের বিকাশ ঘটায়। বৈবাহিক অবস্থান ব্যক্তির পরিবারে নির্ণায়ক বিধায় গবেষণার এলাকার উপার্জনকারী মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থানের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নের ১৬ নং সারণীর মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো।

সারণী নং ১৬: উপার্জনকারী মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থান

বৈবাহিক অবস্থান	সংখ্যা	শতকরা হার
অবিবাহিত	৫	৬.৭৬
বিবাহিত	৩০	৪০.৫৪
বিধবা	১৬	২.৬২
তালাক প্রাপ্তা	১৫	২.২৭
স্বামী পরিত্যক্তা	৮	১০.৮১
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারণীর তথ্যে দেখা যায় কর্মজীবি মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক ৪০.৫৪ শতাংশ অর্থাৎ ৩০ জন মহিলা বিবাহিত। গবেষনায় এলাকার ২১.৬২ শতাংশ অর্থাৎ ১৬ জন মহিলা বিধবা। এরপর রয়েছে তালাক প্রাপ্তা ২০.২৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ জন। এছাড়া স্বামী পরিত্যক্তা উপার্জনকারী মহিলা রয়েছে ১০.৮১ শতাংশ অর্থাৎ ৮ জন। অবিবাহিত কর্মজীবি মহিলা আছে ৬.৭৬ শতাংশ অর্থাৎ ৫ জন। বিবাহিত মহিলারা সংসারের স্বচ্ছলতা আনয়নের জন্য দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির জন্য কিংবা

স্বামীর অক্ষমতা দায়িত্বহীনতার জন্য বেছে নিয়েছে অর্থউপার্জনকারী পথ। আবার বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত বা স্বামী পরিত্যক্তারা সংসার ও সন্তানের ভরন পোষনের জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। অবিবাহিত ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে লেখাপড়া শিখে ঘরে বসে না থেকে অর্থ উপার্জনকে অধিকাতর শ্রেয় মনে করেন। তাই এরাও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে।

উপার্জকারী মহিলাদের পেশা

পেশা মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা নারীকে অর্থকরী শ্রম হতে বিচ্ছিন্ন করে আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে রাখা হয়। ফলে নারী হয়ে পড়ে পুরুষের শ্রমের উপর নির্ভরশীল। গৃহস্থালীর কাজ এককভাবে নারী সম্পাদন করছেন। কিন্তু কোথাও নারীর গৃহস্থালী কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হয় না। আইএলওর এক সমীক্ষায় প্রকাশ "নারীর মোট গৃহস্থালী শ্রম যোগ করলে তা অনেক দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেক হবে। আর এক সমীক্ষায় প্রকাশ সামগ্রিকভাবে কৃষিতে নারীর অংশ গ্রহনের হার ৬১.৬% এবং পল্লী এলাকায় ৬৭.৮%। ১৯৮১ সালে বিআইডিএস কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা জরিপে দেখা গেছে ২১২৭৬ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে ১০ বছরের উর্ধ্বে বয়সী ২১১৩ হাজার জন কুটির শিল্পে নিয়োজিত। এই কর্মে নিয়োজিত মোট জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশ নারী। দেশের বিভিন্ন পোশাক শিল্পে কর্মরত ১৩ লাখ লোকের মধ্যে ৮০ শতাংশ হচ্ছে নারী। পোশাক শিল্প আজ নারী শ্রমিকের উপর নিভরশীল। এই শিল্প দেশের ৭৫ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। তাই প্রকারান্তরে দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও নারীর শ্রমের উপর নির্ভরশীল। গ্রামে নারীরা দৈনিক ৮ থেকে ১২ ঘন্টা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদনশীল কর্মে ব্যয় করে থাকে। আজ সারা বিশ্ব উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী-পুরুষের অংশগ্রহনকে উৎসাহিত করছে। পৃথিবীর অর্ধেক জনশক্তিকে ঘরে বসিয়ে রাখলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। আমাদের নারী বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন তার নিজস্ব যোগ্যতায়। নিভর করেছেন নিজের ক্ষমতার ওপর। তাই নারীরা কৃষিকাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহন করছে। গবেষনা এলাকার মহিলাদের সমাজের প্রচলিত প্রথা ভেঙে বেরিয়ে এসে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন বিভিন্ন অর্থউপার্জনকারী কাজে। এই গ্রামের কর্মজীবি মহিলারা নিজেকে স্বাবলম্বী করার জন্য সংসারের আয় বৃদ্ধির জন্য

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য কিংবা স্বামীর অবর্তমানের সংসারের পুরো দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নিয়ে গ্রহণ করেছে বিভিন্ন ধরণের অর্থউপার্জনকারী পেশা। নিম্নের ১৭ নং সারণীতে তা তুলে ধরা হলো।

সারণী নং ১৭: উপার্জনকারী মহিলাদের পেশার ধরণ

পেশায় ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষিকাজ	৯	১২.১৬
চাকুরি	১৬	২১.৬২
ক্ষুদ্রব্যবসা	২৮	৩৭.৮৪
হাস-মুরগি ও পশু পালন	১২	১৬.২২
দর্জির কাজ	৬	৮.১১
শাড়ি বিক্রি	৩	৪.০৫

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারণীর তথ্যে দেখা যায় কর্মজীবি মহিলাদের সর্বোচ্চ ৩৭.৮৪ শতাংশ অর্থাৎ ২৮ জন ক্ষুদ্র ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহন করেছেন। বিভিন্ন কল-কারখানা, অফিস-আদালতে চাকুরি করছে ২১.৬২ শতাংশ অর্থাৎ ১৬ জন। কৃষি কাজে নিয়োজিত আছেন ১২.১৬ শতাংশ অর্থাৎ ৯ জন মহিলা। পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে ১৬.২২ শতাংশ অর্থাৎ ১২ জন মহিলা। সেলাই মেশিন কিনে দর্জির কাজ করে ৮.১১ শতাংশ অর্থাৎ ৬ জন মহিলা। শাড়ি বিক্রিকে পেশা হিসেবে গ্রহন করেছেন ৪.০৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩ জন মহিলা। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋন গ্রহন করে মহিলারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন। যার জন্যে ক্ষুদ্র ব্যবসাই গবেষণা এলাকার সর্বোচ্চ সংখ্যায় পেশাধারী লোক।

উপার্জনকারী মহিলাদের মাসিক আয়

দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার জন্য মাসিক আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয়। মাসিক আয় দ্বারা একটি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ধারণ করা যায়। আয় দ্বারা যে কোন ব্যক্তি তার মৌলিক প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। মাসিক ও বাৎসরিক আয় দ্বারা ব্যক্তির দারিদ্র্যতাকে চিহ্নিত করা যায় এবং মাসিক

আয় বৃদ্ধি পেলে মানুষ তার মৌলিক প্রয়োজন মিটাতে পারে যা ব্যক্তির দারিদ্র্যতা ঘুচাতে সাহায্য করে। এই সব দিক বিবেচনা করে গবেষনা এলাকার কর্মজীবি মহিলার মাসিক আয়ের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। নিম্নের ১৮ নং সারণীর মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং ১৮: মাসিক আয়

মাসিক আয়	সংখ্যা	শতকরা হার
৭০০-১৬০০	৩	৪.০৫
১৬০১-২৫০১	৯	১২.১৬
২৫০২-৩৪০২	২৫	৩৩.৭৮
৩৪০৩-৪৩০৩	২১	২৮.৩৯
৪৩০৩-৫২০৪	১৪	১৮.৯২
৫২০৫-৬১০৫	২	২.৭০
৬১০৬+	-	-
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারণী নং ৫.৬ তে দেখা যায় সর্বাধিক মহিলার ৩৩.৭৮ শতাংশের অর্থাৎ ২৫ জনের মাসিক আয় ২৫০২-৩৪০২ টাকার মধ্যে। এরপর রয়েছে ২৮.৩৯ শতাংশ অর্থাৎ ২১ জনের মাসিক আয় ৩৪০৩-৪৩০৩ টাকার মধ্যে। উপার্জনকারী মহিলার ১৮.৯২ শতাংশ অর্থাৎ ১৪ জনের মাসিক আয় ৪৩০৪-৫২০৪ টাকার মধ্যে। আর উপার্জনকারী মহিলার ১২:১৬ শতাংশ অর্থাৎ ৯ জনের মাসিক আয় ১৬০১-২৫০১ টাকার মধ্যে। উপার্জনকারী মহিলার ৪.০৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩ জনের মাসিক আয় ৭০০-১৬০০ এবং ২.৭০ শতাংশ অর্থাৎ ২ জনের আছে ৫২৫-৬১০৫ টাকা মাসিক আয়। গবেষণা এলাকার সংগৃহীত তথ্য হতে দেখা যায় উপার্জনকারী মহিলারা চাকুরি, পশুপালন, কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত হয়ে মাসিক উপার্জন করেছেন। এই মাসিক উপার্জন দিয়ে কেউ ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাচেছন, কেউ সাংসারে স্বচ্ছলতা আনয়ন করেছেন, কেউবা উপার্জিত অর্থ সঞ্চয় করেছেন। এই ভাবে গ্রামবাসী

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জনকারী মহিলারা দারিদ্র বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নের অবদান রাখছে।

খাদ্য তালিকা

জীবন ধারণের জন্য খাদ্য অপরিহার্য। বেচে থাকার জন্য আমরা যা কিছু আহার করি তাকেই খাদ্য বলে। খাদ্য শরীরের বৃদ্ধি সাধন, ক্ষয় পূরনে, কর্মশক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে। উপযুক্ত খাদ্য গ্রহনে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। খাদ্য গ্রহন না করলে দেহ দুর্বল হয়ে যায় ও কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। দারিদ্র্য পরিমাপে সাধারণ ভাবে একজন ব্যক্তির নানাবিধ মৌলিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখা হয় অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহনকে দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারণ হিসেবে ধরা হয়। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত Household Expenditure Survey 1995/96 অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি পরিমাপে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ৪৭.১ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালরী গ্রহন পরিমাপে ২৪.৬ শতাংশ ছিল চরম দারিদ্রসীমার নিচে। একজন স্বাভাবিক পূর্ন বয়স্ক মানুষের দৈনিক ২২০০ কিলো ক্যালরি খাদ্যের প্রয়োজন। যেহেতু অপযাপ্ত খাদ্য গ্রহণে দারিদ্র্যর একটি প্রধান ধরণ হিসাবে বিবেচনা দেয়া হয় তাই গবেষণা এলাকার উপার্জনকারী মহিলা পরিবারগুলোর দৈনিক খাদ্যতালিকায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে১৯- নং সারনীর মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হলো।

সারনী নং ১৯: দৈনিক খাদ্য বস্তুগ্রহন

দৈনিক খাদ্যবস্তু গ্রহন	সংখ্যা	শতকরা হার
ভাত- রুটি- ডাল- শাক- সবজি, মাঝে মাঝে মাছ	২৫	৩৩.৭৮
ভাত- ডাল- মাছ, শাক- সবজি	২৭	৩৬.৪৯
ভাত- ডাল- মাছ- মাংস, সবজি	৬	৮.১১
ভাত- রুটি- ডাল- শাক- দুধ- মাংস	৫	৬.৭৬
ভাত- ডাল- শাক- দুধ সপ্তাহে ২ দিন মাছ	১১	১৪.৮৬
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারনীর তথ্য বিশেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকার মহিলা উপার্জনকারী পরিবারে দৈনিক খাদ্য তালিকায় ভাত- রুটি- ডাল- শাক সবজি ও মাঝে মাঝে মাছ গ্রহন করে ৩৩.৭৮ শতাংশ অর্থাৎ ২৫ টি পরিবারে। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ভাত ডাল সবজিও মাছ ২ বেলা গ্রহন করে ৩৬.৪৯ শতাংশ অর্থাৎ ২৭ জনের পরিবারে। দৈনিক ভাত- ডাল- মাছ- মাংস গ্রহন করে ৮.১১ শতাংশ অর্থাৎ ৬ টি পরিবারে। খাদ্য তালিকায় ভাত- রুটি- মাছ-মাংস দুধ সবজি গ্রহনকারী ৬.৭৬ শতাংশ অর্থাৎ ৫টি পরিবারে। আর খাদ্যবস্তু হিসেবে ভাত-রুটি-ডাল-শাক সবজি দুধ ও সপ্তাহে ২ দিন মাছ গ্রহন করে ১৪.৮৬ শতাংশ অর্থাৎ ১১টি পরিবারে। এমরগাও গ্রামের উপার্জনকারী মহিলা পরিবারে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাদের খাবারের মান পূর্বেই থেকে উন্নত হয়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো ২ বেলা মাছ-সবজি ও ডাল দিয়ে ভাত খান। দরিদ্র পরিবারগুলো শাক সবিজ ও মাঝে মাঝে মাছ গ্রহন করে। আবার যেসব দরিদ্র পরিবারে দুধেল গাভী পালন করে তারা মাছ গ্রহন না করলে ও দুধ গ্রহন করে। উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ হতে প্রতীয়মান হয় যে মহিলা উপার্জনকারী এসব পরিবারে খাবারে মান পূর্বের থেকে উন্নত হয়েছে।

উপার্জনকারী মহিলাদের বাসস্থানের ধরণ

বাসস্থান মানুষের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ন একটি উপাদান। মানুষ তার জীবনের বেশীরভাগ সময় বাড়িতেই কাটায়। খাওয়া, পড়া, শিশুদের যত্ন নেওয়া, তাদের পড়ানো, বিশ্রাম, ঘুমানো, কাপড় কাচা ও শুকানো, ঘরবাড়ি মোরমত, সামজিক অনুষ্ঠান, বন্ধু ও আত্মীয়দের সংগে আলাপ ও আপ্যায়ন-এ সব কিছুই হয় গৃহে। গ্রামের গরিবরা, বিশেষ করে স্বনিয়োজিত মেয়েরা গৃহকে ছোট খাট উৎপাদন সংগঠন হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। কাঁথা সেলাই, হাস মুরগি পালন, তাঁত বোনা, কাঠ মিস্ত্রির কাজ এরকম হাজারো কর্মকান্ড গৃহতেই সম্পাদিত হয়। গরিব গৃহবধু বাড়ির আঙ্গিনায় তরিতরকারি ও ফলমূলের গাছ লাগায়। বাসস্থান গরিবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক বিনিয়োগ। মোটামুটিভাবে শক্ত সমর্থ একটি গৃহ তার অধিবাসীদের রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, বন্যার মতো নানা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করে থাকে। একটি ভালো বাড়ি পরিবারের সদস্যদের সুস্থ শরীরেরও অঙ্গীকার (রহমান, ১৩৯৮ :১১৯)। তাদের উৎপাদনক্ষম রাখার প্রতিশ্রুতি। বাসস্থানের এইসব অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীতার জন্য এমারগাও গ্রামের দরিদ্র উপার্জনকারী মহিলাদের

Dhaka University Institutional Repository

বাসস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কর্মজীবি মহিলাদের অনেকের পূর্বে টিনের ঘর ছিল। যখন থেকে এই সব মহিলারা উপার্জন করা শুরু করে তখন তারা কষ্ট করে হলেও তাদের বাসস্থান সেমিপাকা ঘরে রূপান্তরিত করে। নিম্নে সারণী নং ২০ এর মাধ্যমে বাসস্থানরে ধরন উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং ২০: উপার্জনকারীদের বাসস্থানের তথ্য

বাসস্থানের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার
পাকা বাড়ি	০	
সেমিপাকা ঘর-২টি	২৬	৩৫.১৪
সেমিপাকা ঘর-১টি টিনের ঘর-১টি	২৩	৩১.০৮
টিনের ঘর	২১	২৮.৩৮
বাঁশের ঘর	৪	৫.৪০
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারণীর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এমারগাও গ্রামের উপার্জনকারী মহিলা পরিবারের ২'টি করে সেমিপাকা ঘর ৩৫.১৪ শতাংশ অর্থাৎ ২৬ জনের। এরপর রয়েছে ১টি করে সেমিপাকা ঘর ৩১.০৮ শতাংশ অর্থাৎ ২৩ জনের। দরিদ্র উপার্জনকারী মহহিলাদের টিনের ঘর রয়েছে ২৮.৩৮ শতাংশ অর্থাৎ ২১ জনের। আর বাঁশের ঘর আছে ৫.৪০ শতাংশ অর্থাৎ ৪ জনের। গবেষনা এলাকার সর্বাধিক সংখ্যক রয়েছে সেমিপাকা ঘর, যা দারিদ্র বিমোচনে উপার্জনকারী মহিলাদের ইতিবাচক ভূমিকার প্রতিনিধিত্ব করে।

গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের ঋন সম্পর্কিত তথ্য

বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র বিমোচনের প্রধান লক্ষ্য হলো গ্রামীন জনগনের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অবকাঠমোগত উন্নয়ন সাধন। গ্রামীন দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দূর করার জন্য পঞ্চাশের দশকের থেকে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করেছে। এই সব কর্মসূচির মধ্যে ছিল, দরিদ্র নারী, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের সহজশর্তে ঋন সহায়তা

প্রদান করা। গ্রামীন পূর্ত কর্মসূচি মাধ্যমে রাস্তাঘাট, পুকুর সংস্কার, পতিত জমি চাষাবাদ প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সার, বীজ, কীটনাশক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কৃষি উপকরন ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা করে। আর আরডিবি গ্রামভিত্তিক কৃষক মহিলা, বিত্তহীন সমবায় সমিতির সদস্য সদস্যাদের কৃষি ও অকৃষি উপার্জনমূলক প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী ঋন বিতরন কার্যক্রম পরিচালনা করে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য। গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে একটি বড় সমস্যা হলো মূলধনের স্বল্পতা বা যথাযথ মূলধন যোগানো সমস্যা। সরকারি পর্যায়ে মূলধন বা ঋন ব্যবস্থা থাকলেও তা অত্যন্ত সীমিত রয়েছে। বাংলাদেশে যে প্রচলিত ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋনদান ব্যবস্থা আছে তা থেকে মোট চাহিদার মাত্র ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ ঋন দেয়া হয়। অর্থাৎ ব্যাংক থেকে জনগন তাদের প্রয়োজনের মাত্র ১৫-২০ শতাংশ ঋন পেতে পারে। বাস্তব এ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন এনজিও নানা ধরনের ঋনদান কর্মসূচিত নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন শরনার্থীদের সেবা ও চিকিৎসার জন্য এনজিওরা কাজ শুরু করে। এনজিওরা বন্যা এবং ৭৪- এর দুর্ভিক্ষে মানুষের জন্য ত্রান ও পুনর্বাসনের কাজ করেছিল। কিন্তু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো ক্রমান্বয়ে বুঝতে পারে যে, ত্রান এবং পুনর্বাসন কাজগুলো শুধু আপৎকালীন সময়ের জন্য করা উচিত। না হলে এর উপর জনগনের নির্ভরশীলতা ক্রমশ বেড়ে যাবে। তারা উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারবে না। ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের পর দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্যে এনজিও কার্যক্রম চালু করা হয়। প্রথমদিকে পরিবারের প্রধান পুরুষকেই ক্ষুদ্র ঋন দেয়া হত। তবে আদায়ের হার ছিল দু:খজনক। এনজিও কার্যক্রম নিয়ে মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে পর্দার আড়াল থেকে মহিলাদের মাইক্রোক্রেডিটে আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এতে সুফল পাওয়া যায়। ৮০ দশকের শুরুতে মহিলাদের পরিবার প্রধান বিবেচনা করে এনজিওদের মাইক্রোক্রেডিটের বিস্তার ঘটতে থাকে। ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে এখন তা সারাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। গত তিন দশকে ক্ষুদ্র ঋনের লেনদেন গোটা দেশ জুড়ে এক নীরব বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋনের প্রভাব দেখা যায় এমারগাও গ্রামের কর্মজীবি মহিলা পরিবারে। আগে যেখানে মাটির ঘর ও ছনবাশের বেড়ার ঘরে দারিদ্র্য প্রকট ছিল, এখন সেখানে সেমি পাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘর অথবা টিনের বেড়া ও টিনের ছাউনি ঘর অতীতের বিমলিন দৃশ্য পাল্টে দিয়েছে। ক্ষুদ্র ঋন অনেক দরিদ্র উপার্জনকারী মহিলার দারিদ্র্যতা হ্রাস করে সংসারে এনে দিয়েছে স্বচ্ছলতা। এমারগাও গ্রামের উপার্জনকারী মহিলারা এখন আর পরমুখাপেক্ষী নয় বরং ঋন নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা করে তারা এখন অর্থ উপার্জনকারী সদস্য। সমাজ ও পরিবারে স্বাবলম্বী সদস্য। উল্লেখিত কারনে গবেষণা এলাকার দরিদ্র উপার্জনকারী মহিলাদের ঋন গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। নিম্নের ২১ সারণীতে তা উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং২১: গ্রামীন মহিলাদের ঋন গ্রহন সম্পর্কিত তথ্য

ঋন গ্রহন সম্পর্কিত তথ্য	সংখ্যা	শতকরা হার
ঋন গ্রহন করেছে	৪৬	৬২.১৬
ঋন গ্রহন করে নাই	২৮	৩৭.৮৪
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারণীর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এমারগাও গ্রামের উপার্জনকারী মহিলাদের মধ্যে ৬২.১৬ শতাংশ অর্থাৎ ৪৬ জন ঋন গ্রহন করেছেন এবং ৩৭.৮৪ শতাংশ অর্থাৎ ২৮ জন ঋন গ্রহন করে নাই।

ঋনদানকারী সংস্থা

দারিদ্র বিমোচনের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি ও ত্বরান্বিত করাসহ সার্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন আবশ্যক। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যাতে দারিদ্র লাঘব এবং টেকসই উন্নয়ন হয় সেজন্য তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাথে মাথাপিছু আয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পেতে হবে। যার ফলে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক খাত (শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন যাত্রার উন্নয়ন হয়। কৃষিখাতে অসম ভূমি ব্যবস্থাপনা লাঘব সাপেক্ষে পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন অকৃষি খাতসহ শহর অঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং এর জন্য শিল্প, ব্যবসা ও অন্যান্য সেবা খাতসহ অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর সাথে মুদ্রা নিয়ন্ত্রন, বিশেষ করে খাদ্য বহির্ভূত দ্রব্যাদি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সহায়ক হবে। দারিদ্র্য বিমোচন করা, পল্লী উন্নয়ন করা, দরিদ্রের

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারি বিভিন্ন সংস্থার রয়েছে নানা কর্মসূচি। তেমনি বাংলাদেশের এনজিওগুলোর বেশিরভাগ কার্যক্রমই পরিচালিত হয় দারিদ্র্য বিমোচন নিয়ে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। স্থানীয় সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উন্নত পদ্ধতির চাষাবাদ, কৃষিপন্যের সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা, কৃষি ও অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন করে দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠীকে উপার্জনমূলক কাজে উৎসাহিত করা এবং নারীর কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য বিমোচনের উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহকে সামনে রেখে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন টাকার অংকে বা পরিমানে ঋন প্রদান করে আসছে। এনজিওদের ক্ষুদ্রঋন কার্যক্রম দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিশ্বের প্রায় ১০০টিরও বেশি দেশে গ্রামীন মডেলের ব্যাংক চালু করা হয়েছে। গরিব মানুষ ঋন নিয়ে গাভী কেনেন, টুকটাক ব্যবসা করেন, হাঁস মুরগির চাষ করেন, তাঁত বোনেন, সবজির চাষ করেন। পুকুর কাটেন, দোকান দেন, স্বামীকে ব্যবসা করতে দেন এবং ছেলেকে বিদেশে পাঠান। পূর্বে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতে কোন মূলধন থাকত না, ফলে দরিদ্র জনেগাষ্ঠী কর্মদ্যোগী হওয়ার সাহস পেত না। ক্ষুদ্র ঋন এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মউদ্যোগী হতে সাহস যুগিয়েছে এবং স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে। এমারগাও গ্রামের দরিদ্র মহিলারা বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋন নিয়ে গাভী পালছে, সবজি চাষ করছে, ক্ষুদ্র ব্যবসা করছে, হাঁস-মুরগি পালন করছে। এমারগাও গ্রামের অর্থ উপার্জনকাজে নিয়োজিত মহিলারা আশা, প্রশিকা, গ্রামীন ব্যাংক, সাজেদা ফাউন্ডেশন থেকে ঋন গ্রহন করে বিভিন্ন কাজে বিনিয়োগ করেছেন। আলেয়া বেগম বয়স ৩৫, আশার সাথে ৮ বছর ধরে ঋন কার্যক্রম পরিচালনকা করছেন এবং তিনি ঋনের টাকা ক্ষুদ্র ব্যবসায় খাটিয়েছেন। সাবিনা বয়স ২৬ বছর প্রশিকার সাথে ৫ বছর ধরে ঋন কার্যক্রমে জড়িত। রিনা সুলতানা বয়স ২৩ বছর, আচার ও হজমি বানান। তিনি আশার সাথে ৫ বছর ধরে ঋন পরিচালনা করতেছেন। দরিদ্রদের আয়বৃদ্ধি, সম্পদ অর্জন ও মজুরি বর্ধনে ক্ষুদ্রঋনের বিশেষ ইতিবাচকে ভূমিকা রয়েছে। ক্ষুদ্রঋনের অন্যান্য

অনেকে ইতিবাচক সামাজিক প্রভাবও রয়েছে। বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মহিলারা আর্থিক কর্ম-কান্ডে অধিকতর দৃশ্যমান হয়েছে। নিম্নের সারণী নং ২২ -এর মাধ্যমে দরিদ্র কর্মজীবি মহিলাদের ঋন গ্রহনকারী সংস্থার তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং ২২: ঋনদানকারী সংস্থার নাম

ঋনদানকারী সংস্থার নাম	সংখ্যা	শতকরা হার
বিআইডিএস	১০	২১.৭৪
যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর	৫	১০.৮৭
গ্রামীন ব্যাংক	৫	১০.৮৭
আশা	১৫	৩২.৬১
প্রশিকা	১০	২১.৭৪
সাজেদা ফাউন্ডেশন	১	২.১৭
মোট	৪৬	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারণীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে উপার্জনকারী মহিলার সর্বাধিক ৩২.৬১ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ জন আশা থেকে ঋন গ্রহণ করেছে। এরপর রয়েছে ২১.৭৪ শতাংশ অর্থাৎ ১০ জন করে কর্মজীবি মহিলা প্রশিকা ও বিআইডিএস থেকে ঋন গ্রহন করেছে। ঋনগ্রহনকারী সদস্যের ১০.৮৭ শতাংশ অর্থাৎ ৫ জন করে গ্রামীন ব্যাংক ও যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋন গ্রহন করেছে। কর্মজীবি মহিলাদের ১ জন ঋন গ্রহন করেছে সাজেদা ফাউন্ডেশন থেকে।

গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের শিক্ষা

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ন উপাদান হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আত্মপরিচয়ে বড় হওয়ার শিক্ষা দেয়। শিক্ষা দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে দুভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত: শিক্ষা দরিদ্রের শক্তি বৃদ্ধি করে, ফলে তারা শোষনকে প্রতিরোধ করার শক্তি পায় এবং সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেদের সুবিধা বৃদ্ধি করাতে পারে। দ্বিতীয়ত: শিক্ষা অধিকতর লাভজনক চাকুরি লাভের সুযোগ করে দেয়।

শিক্ষা যে কোন জনগোষ্ঠীকে দক্ষ, সচেতন ও কর্মপোযোগী করে তুলতে সাহায্য করে। শিক্ষা শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। ভূমি ও অন্যান্য বৈষয়িক সম্পদের অধিক কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে। প্রযুক্তি ও দক্ষতাভিত্তিক অধিক রপ্তানি নিশ্চিত করে। নারীর আর্থসামাজিক ক্ষমতায়ন ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়হতা করে। শিক্ষার বিবিধ উপযোগিতা সত্ত্বেও গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠানোর বদলে উপার্জনমূলক কাজে লাগানোর প্রতি বেশি আগ্রহী। আমাদের জাতীয় জীবনের সকল সমস্যা, সঙ্কট ও দুর্দশার মূল উৎস শিক্ষার অভাব। শিক্ষার অভাব তথা নিরক্ষরতা থেকে যদি জনসাধারনকে মুক্ত করা যেতে তাহলে বর্তমানে জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজউন্নয়ন, ইত্যাদি জাতিগঠনমূলক সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টাই সাফল্যমন্ডিত হতো। এডুকেশন ওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পুরুষদের তুলনায় দেশের নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে ১২ শতাংশের ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে। সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর শিক্ষা ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষার বিস্তারের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়ার ফলে এবং মেয়েরা বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার ফলে নারী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা দুর হয়েছে। এমারগাও গ্রামের দরিদ্র উপার্জনকারী মহিলারা শিক্ষা গ্রহনে এগিয়ে এসেছে। নিম্নের ২৩নং সারণীতে শিক্ষার তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং ২৩ : গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার
নিরক্ষর	১৬	২১.৬২
নাম স্বাক্ষর	৩০	৪০.৫৪
প্রাথমিক	২৪	৩২.৪৩
এসএসসি	৪	৫.৪১
এইচএসসি	০	-
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত সারণীর তথ্যে দেখা যায় সর্বোচ্চ ৪০.৫৪ শতাংশ অর্থাৎ ৩০ জন শুধু নাম স্বাক্ষর করতে জানে এরপর রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষালাভকারী হার ৩২.৪৩ শতাংশ অর্থাৎ ২৪ জন। অর্থউপার্জনকারী মহিলার মধ্যে ২১.৬২ শতাংশ অর্থাৎ ১৬ জন নিরক্ষর। আর এসএসসি পাশ রয়েছে ৫.৪১ শতাংশ অর্থাৎ ৪ জন।

চিকিৎসা গ্রহন

স্বাস্থ্যগত অবস্থা মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ। স্বাস্থ্যের উন্নতি যেমন শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি করে তেমনি এটি মানব মূলধনের অন্যান্য বিষয় শিক্ষার শক্তিকেও উন্নত করতে সহায়তা করে। স্বাস্থ্য একটি দেশের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভগ্ন স্বাস্থ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবনযাত্রার মানকে ক্ষয় করে এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে। স্বাস্থ্যগত অবস্থা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ বিদ্যমান। ভগ্নস্বাস্থ্য দরিদ্রকে আবার দরিদ্রের দিকে ঠেলে দেয় এবং এই দারিদ্র্য আবার দরিদ্রকে আরও ভগ্নস্বাস্থ্যের সম্মুখীন করে। এটি আর ও অনেক ধরনের সমস্যা যেমন বেকারত্ব, উননিয়োজন ইত্যাদি সৃষ্টি করে যা পরিবারের আয় হ্রাস করে এবং জীবনযাত্রার মানকে ব্যাহত করে। বেশিভাগ দেশ জন্মকালীন জীবন প্রত্যাশা অথবা শিশু মৃত্যুর হারকেই স্বাস্থ্যগত অবস্থার নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাস্থ্যগত অবস্থার অন্যান্য নির্দেশক হচ্ছে বয়স এবং রোগ নির্দিষ্ট মৃত্যুহার অথবা রুগ্নতা। স্বাস্থ্যগত অবস্থা নির্ধারনে মহিলাদের শিক্ষার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুচক। এটি স্বাস্থ্যের উন্নতির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কেননা শিক্ষিত মহিলা স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়। খাদ্যের প্রাপ্যতা স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়। মোট জাতীয় আয়ের সাথে স্বাস্থ্যগত অবস্থার ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা আয় বাড়লে অধিক স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির সম্ভাবনা বাড়ে। হাসপাতাল, ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতাকেই নির্দেশ করে। স্বাস্থ্য একটি বহুমাত্রিক প্রপঞ্চ। চিকিৎসা বিজ্ঞান এর একটি মাত্রা যা মূলত রোগ বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে। গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী অজ্ঞতা কুসংস্কার ও অসচেতনতার কারনে রোগ ব্যাধি সম্পর্কে উদাসীন থাকে এবং সঠিক চিকিৎসা গ্রহন করে না। ফলে তারা নানা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সুস্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারনে তাদের শ্রম শক্তির অপচয় হয়। স্বাস্থ্যের উপর মজুরি শ্রমের প্রভাব বহুদূর প্রসারী। স্বাস্থ্য জীবন যাত্রার মান বিচারে একটি

Dhaka University Institutional Repository

অতি প্রয়োজনীয় মানদন্ড। স্বাস্থ্যের অভাবে জীবনকে উন্নত বলা যায় না। এসব দিক বিবেচনা করে গবেষনা এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা গ্রহন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নের ২৪- নং সারণীতে তা তুলে ধরা হলো।

সারণী নং ২৪: চিকিৎসা গ্রহনের ধরন

চিকিৎসা গ্রহনের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	২১	২৮.৩৮
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১৮	২৪.৩২
স্থানীয় এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র	২০	২৭.০৩
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র	৭	৯.৪৬
কবিরাজী চিকিৎসা	৫	৬.৭৬
ঝাড়-ফুঁক চিকিৎসা	৩	৪.০৬
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত ৫.১২ নং সারণীর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় উপজেলা সরকারি হাসপাতালে সর্বোচ্চ ২৮.৩৮ শতাংশ অর্থাৎ ২১ জন চিকিৎসা গ্রহন করে। এরপর স্থানীয় এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্রে ২৭.০৩ শতাংশ অর্থাৎ ২০ জন চিকিৎসা গ্রহন করে। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে ২৪.৩২ শতাংশ অর্থাৎ ১৮ জন চিকিৎসা গ্রহন করে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ৯.৪৬ শতাংশ অর্থাৎ ৭ জন গ্রহন করে। কবিরাজী চিকিৎসা গ্রহন করে ৬.৭৬ শতাংশ অর্থাৎ ৫ জন। গবেষণা এলাকার অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ৪.০৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩ জন এখনও ঝাড়-ফুক চিকিৎসা গ্রহন করে। গবেষণা এলাকার সংগৃহীত তথ্য বিশ্লে-ষণে দেখো যায় সরকারি স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা জনসাধারনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কেননা এখানে জুরুরি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় নামমাত্র মূল্যে। তাছাড়া গরিব মানুষের মানসম্পূর্ণ বেসরকারি সেবা গ্রহনের ক্ষমতা নেই।

সঞ্চয়

আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে। সঞ্চয় হতে মূলধনের সৃষ্টি। মূলধন উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিধায় সঞ্চয়ের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। বাংলাদেশে বিদ্যমান ব্যাপক দারিদ্রতার কারনে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক স্বচ্ছলতা নাই। কয়েক পুরুষ দারিদ্র্য আর নিগ্রহের মধ্যে জীবন কাটিয়ে তারা মানবিক মর্যাদা আর অধিকারের কথা অনেকক্ষেত্রে ভুলেযান। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর হলেও এদেশের কৃষিব্যবস্থা অদ্যবধি বেশ অনুন্নত। আমাদের দেশের কৃষি কাজকে ঘিরে কিছু সমস্যা যেমন, ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি, জমির খন্ড-বিখন্ডতা, মান্ধাতার আমলের চাষাবাদ পদ্ধতি রয়েছে বা উন্নতির পরিপন্থি। অনুন্নত কৃষি দেশকে দারিদ্র্য দশা থেকে মুক্তি দিতে পারছে না। গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় কম, ফলে সঞ্চয়ের হারও কম। বর্তমানে সরকারি ও বেরসকারি পর্যায়ে আধুনিক জ্ঞান, প্রযুক্তি, উন্নত সার বীজ প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে উন্নত সার, বীজ, কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে অকৃষি পেশার প্রসার ঘটেছে। গ্রামীন অশিক্ষিত দরিদ্র মহিলারা অর্থউপার্জনকারী কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংগঠিত করে অধিক পরিমান সুযোগ সুবিধা ও ঋন সরবরাহের বন্দোবস্ত প্রকারান্তরে নারী সমাজকে ক্রমাগত বর্ধিত হারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন সাহায্য করছে। এতে পরিবারে তথা গ্রাম অঞ্চলের উৎপাদন তথা আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহনের হার যত বেশি হবে গ্রামের উন্নতির হারও ততই দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে। গ্রামীন দরিদ্র কর্মজীবি মহিলাদের জীবন ব্যয় নির্বাহ করা কষ্টকর হলেও সন্তানের ভবিষ্য, রোগ-ব্যাধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য তারা সঞ্চয় করেন। যা নিম্নের সারণী নং ২৫ - এর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

সারনী নং : ২৫- গ্রামের উপার্জনকারী মহিলাদের সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্য

সঞ্চয় আছে কিনা	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২৬	৩৫.১৪
না	৪৮	৬৪.৮৬
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারণীর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় উপার্জনকারী মহিলাদের ৩৫.১৪ শতাংশ অর্থাৎ ২৬ জনের সঞ্চয় আছে। আর ৬৪.৮৬ শতাংশ অর্থাৎ ৪৮ জনের কোন সঞ্চয় নাই। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় উপার্জনকারী হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা যেমন বেড়েছে তেমনি পরিবারের ভরনপোষনের খরচের জন্য উপার্জনকারীরা সঞ্চয় করতে পারেন না অর্থাৎ মহিলা প্রধান পরিবার প্রতীয়মান হচ্ছে।

সঞ্চয়ের স্থান

সঞ্চয় মানুষকে দুর্দিনে সাহায্য করে। উন্নত জীবনযাপনের জন্য সহায়তা করে। এমারগাও গ্রামের উপার্জনকারী মহিলাদের সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার পর তারা কোথায় সঞ্চয় করে সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যা সারণী নং ২৬ -এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী নং২৬ : সঞ্চয়ের স্থান সম্পর্কিত তথ্য

সঞ্চয়ের স্থান	সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যাংক	১৪	১৮.৯২
নিজের ঘরে সঞ্চয় করেন	৮	১০.৮১
সঞ্চয়কৃত অর্থ অন্যের কাছে জমা রাখেন	৪	৫.৪১
সঞ্চয় করেন না	৪৮	৬৮.৮৬
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত সারণীর তথ্যে দেখা যায় সঞ্চয়কারী মহিলাদের ১৮.৯২ শতাংশ অর্থাৎ ১৪ জন ব্যাংকে সঞ্চয় জমা রাখেন এরপর রয়েছে ১০.৮১ শতাংশ অর্থাৎ ৮ জন সঞ্চয়কারী নিজের ঘরে সঞ্চয় করেন এবং ৫.৪১ শতাংশ অর্থাৎ ৪ জন নিজের সঞ্চয়কৃত অর্থ অন্যের কাছে জমা করে। আর ৬৪.৮৬ শতাংশ অর্থাৎ ৪৮ জন কোন সঞ্চয় করে না।

উপরিউক্ত প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় গ্রামীন মহিলারা সামাজিক কুসংস্কার ও পর্দা প্রথা ডিঙ্গিয়ে কর্মক্ষেত্রে বেড়িয়ে এসেছে গ্রহন করেছে বিভিন্ন অর্থ উপার্জনকারী পেশা। উচ্চ শিক্ষিত না হয়েও তারা পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরিবারে নির্ভরশীল সদস্য হিসেবে বোঝা না হয়ে নিজে রোজগার করে সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। এইসব গ্রামীন দরিদ্র কর্মজীবি মহিলা এখন শুধু গৃহিনীই নয় পরিবারের একজন উপার্জনকারী সদস্য। যার ফলশ্রুতিতে পরিবারের তাদের ভূমিকায় এসেছে পরিবর্তন। যা নিম্নে আলোচিত কয়েকটি কেইস স্টাডিটির মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কেইস স্টাডি-১

রিনা সুলতানা। বয়স ২৩ বছর। ১ ছেলে ও ১ মেয়ের জননী। স্বামী বর্গাচাষী। স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ী ও ননদসহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন। রিনা সুলতানা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করার পর রিনার দরিদ্র পিতামাতা তাকে বর্গাচাষী আবুল কালামের সাথে বিয়ে দেন। বিয়ের পর রিনা সুখের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে সংসার শুরু করে। কিন্তু দরিদ্র বর্গাচাষী আবুল কালামের সংসারে পদার্পনের ৩ বছরের মধ্যে অভাব আর দারিদ্র্যের কারনে রিনার সুখের স্বপ্ন মলিন হয়ে যেতে থাকে। রিনার দরিদ্র স্বামীর পক্ষে এত বড় একটা সংসারের ভরনপোষন করা অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। অভাব আর দারিদ্র হয়ে দাড়ায় সংসারে নিত্যসঙ্গী। এতগুলো মানুষের মুখের ভাত আসবে কোথেকে-এ ভাবনা থেকেই শিক্ষিত ও আত্মপ্রত্যয়ী রিনা উপার্জনের পথ খোজে। রিনা বুঝতে সক্ষম হয় যে বাড়তি উপার্জন ছাড়া তাদের সংসারের কষ্টের দিন শেষ হবে না। তাই রিনা আশা থেকে ৫০০০ হাজার টাকা ঋন গ্রহন করে ঘরের মধ্যেই শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসা। রিনা ঘরের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে বিভিন্ন ধরনের আচার ও হজমি তৈরি করে আটি বাজারের বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করেন। প্রথম দিকে এই ব্যবসা তিনি ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু

করলেও বর্তমানে তার এই কাজের জন্য তিনি দুইটি ঘর ব্যবহার করেন। তার কাজে তার ছোট ননদ তাকে সাহায্য করে। বর্তমানে রিনা সুলতানা তার ব্যবসা থেকে মাসিক ৩০০০ হাজার টাকা আয় করেন। তার এই বাড়তি আয়ের জন্য সংসারের নিদারুন কষ্টের দিনগুলির অবসান ঘটেছে। পরিবারের ভোগমান বড়েছে। রিনার অতিরিক্ত আয়ে সংসারের দারিদ্রতা কমাতে রিনার শাশুড়ী খুশী হয়ে গৃহস্থালী সমস্ত কাজের দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন। ফলে রিনা দিনের পুরোটা সময় তার ব্যবসার কাজে নিয়োজিত থাকেন। রিনা সুলতানাকে এখন আর খাওয়া পরার জন্য দু:চিন্তায় থাকতে হয় না। এখন আর টাকা পয়সার জন্য কারও কাছে হাত পাততে হয় না। এখন তিনি সংসারের ও সন্তানদের চাহিদা পূরন করতে পারেন ব্যবসার টাকা হতে। ফলে পরিবারে রিনা সুলতানার মর্যাদা বেড়েছে। ধৈর্য্য আর কঠোর পরিশ্রমই রিনা সুলতানাকে করেছে স্বাবলম্বী দূর করেছে তার দারিদ্র্যতা।

কেস স্টাডি-২

মনোয়ারা বেগম। বয়স ৪০ বছর। ৩ ছেলে ও ২ মেয়ের জননী। মনোয়ারার স্বামী আব্দুল জলিল ছিলেন প্রান্তিক কৃষক। স্বামী কৃষিকাজ করে তাদের সংসার টানাপোড়ন করে চলত। মনোয়ারার ৩০ বছর বয়সে স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে মনোয়ারা অকূল সাগরে নিমজ্জিত হন। স্বামী বেচে থাকা অবস্থায় কোনরকমে তার সংসার চলত। স্বামীর মৃত্যুর পর মনোয়ার দিশেহারা হয়ে যায়। এ অবস্থায় কি করবে, কোথায় যাবে, এতগুলো মানুষের মুখের আহার আসবে কোথেকে ছেলেমেয়গুলো মানুষই বা হবে কিভাবে- ইত্যাদি দু:চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলে। দিশেহারা মনোয়ারা নিজ আত্মবিশ্বাসের ওপর ভরসা করে স্বামীর রেখে যাওয়া তিন পাকি জমিতে সবজি চাষ শুরু করেন। আশা থেকে ৫০০০ হাজার ঋন নিয়ে মনোয়ারা চাষযোগ্য জমি ও বাড়ির পালানে সবজি চাষ করেন। সবজি চাষ করে সংসারে যাবতীয় খরচ মেটাতে পেরে তার সবজি চাষে আগ্রহ বেড়ে যায় এবং আশা থেকে আরেকবার ঋনগ্রহন করে তিনি ব্যাপকভাবে সবজি চাষ শুরু করেন। বর্তমানে তিনি বছরে তিনটি সবজির আবাদ করেন। সবজি চাষ করে তিনি তার দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। প্রথম অবস্থায় তিনি একাই সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। বর্তমানে তার বড় ছেলে তাকে সব কাজে সহযোগিতা করে। মনোয়ারার মেঝো ছেলে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছোট ছেলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ালেখা করে। প্রথমদিকে মনোয়ারার সবজি চাষে সাফল্য নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আত্মীয়-স্বজন সন্দিহান হলেও বর্তমানে মনোয়ারার সবজি চাষের সাফল্যে অনেককে সবজি চাষে অনুপ্রানিত করেছে। মনোয়ারা শীতকালে বিভিন্ন শীতকালীন সবজি আলু, মূলা, ফুলকপি, বাধাকপি, শিম, গাজর, লাউ, টমেটো, মটরশুটি পালং শাক ও লাল শাক চাষাবাদ করেন। গ্রীষ্মকালে তিনি মিষ্টি কুমড়া, ডাটা, পটল, ঝিঙ্গা, ধুনদল ঢেড়শ পুই শাক ইত্যাদি চাষাবাদ করেন। গ্রীষ্মকালীন সবজিগুলো তিনি একবার ফলভোগের পর আবার দ্বিতীয় মেয়াদে চাষাবাদ করেন। বাড়ির পালানে তিনি বিভন্ন প্রকার শাক আবাদ করেন। তার সবজি চাষ তদারকির জন্য তিনি স্থায়ীভাবে তিন জন লোক রেখেছেন। সংসারের যাবতীয় খরচবাদে মনোয়াবার বাৎসরিক ৬০০০ হাজার টাকা সঞ্চয় থাকে। এই টাকা জমিয়ে মনোয়ারা দুইটি সেমিপাকা ঘর বানিয়েছেন। ধের্য্য একাগ্রতা ও কঠোর পরিশ্রমই এনে দিয়েছে মনোয়ারার সাফল্য। মনোয়ারা এখন একজন আত্মপ্রত্যয়ী স্বাবলম্বী মহিলা।

কেস স্টাডি-৩

রাশিদা বেগম। বয়স ২৫ বছর। স্বামী চাঁন মিয়া রিকশাচালক। রাশিদা বেগমের দুই মেয়েসহ পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৪ জন। স্বামী চাঁনমিয়া পেটে গ্যাসটিকের ব্যাপার কারনে নিয়মিত রিকশা চালাইতে পারে না। রাশেদার স্বামীর বসতবাড়ি ছাড়া চাষযোগ্য কোন জমি নাই। স্বামীর একার আয়ে সংসার কোনো মত চলে, আবার চলে না। প্রায় সময়ই অর্ধাহারে থাকতে হয়। পরনের কাপড় ঠিকমত যোগাড় হয় না। সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারেন না। আজকের খাবার যোগাড় হলে হয়তো পরের দিনের খাবারের যোগাড় হয় না। নিদারুন এই দু:খ কষ্ট মনোয়ারাকে ভাবিয়ে তুলে। ছোট দুই মেয়েকে রেখে বাড়ির বাইরে মজুরি কর্ম গ্রহন করারও সাহস পাননা। এমতাবস্থায় বাড়ির মধ্যে কিছু করার সিদ্ধান্ত থেকে তার ক্ষুদ্র ব্যবসার দিকে আগ্রহ জাগে। এমারগাও গ্রাম সমিতির নেতা আলেয়া বেগমের সাথে ঋন গ্রহন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে রাশিদা ঋন গ্রহন করে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সাজেদা ফাউন্ডেশন থেকে ঋন গ্রহন করে বাড়ির সামনে ছোট একটি মুদির দোকান খুলে নিজেই দোকানি শুরু করেন। গ্রামীন পরিবেশে মহিলা মুদি দোকানি একটু ব্যতিক্রম বিষয়। প্রথমদিকে সবাই আড়চোখে তাকাত, টিটকারি-টিপ্পানি দিয়ে নানা কথা বলত। দারিদ্র্যতার কষাঘাতে রাশিদার মনোবল একটুও কমেনি। রাশিদার কথা হলো-পেটে ক্ষুধা নিয়ে মানুষের কথায় কান দিলে চলবো? কথায় তো আর

Dhaka University Institutional Repository

পেট ভরে না। যারা কথা কয়, তারা তো একবেলা ভাতদেয় না। মুদির দোকান থেকে রাশিদার মাসিক ৪০০০ হাজার টাকা আয়, যা দিয়ে তার সংসার বেশ ভালভাবে চলে যায়। এখন রাশিদার সংসারে কোন অভাব নেই। রাশিদার কথা হলো আমি চুরি করি না, ডাকাতি করি না, খেটে খাই- এতে লজ্জা বা অমর্যাদার কিছু নাই। লজ্জা করে ঘরে ঘোমটা দিয়ে বসে থাকলে কেউ পেটের ভাত দিবে না, পরনের কাপড়ও দিবে না। রাশিদা এখন সুখী। তার মেয়েরা এখন তিনবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে, জামা কাপড় পাচ্ছে। মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করার কথা ভাবছেন। ঘর বানানোর স্বপ্ন রাশিদার। রাশিদার অর্থউপার্জনকারী কর্মে নিয়োজিত হওয়ার পর তার পরিবারের দারিদ্র্যতা দূর হয়েছে, পরিবারে তার মর্যাদা বেড়েছে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইসব কিছু মিলিয়ে রাশিদা খুশি এবং তৃপ্ত।

কেস স্টাডি-৪

আয়েশা খানম। বয়স ৫০। এমারগাও গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা। তার স্বামী ওয়াজেদ আলী খান ব্যবসায়ী। আয়েশা খানম ৩ ছেলে ও ১ মেয়ের জননী। আয়েশা খানম ২ ছেলে ও ২ মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন। বর্তমানে ছোট ছেলেকে নিয়ে তার পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৩ জন। এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পর আয়েশা খানমের বিয়ে হয়। বিয়ের পর লেখাপড়ার প্রয়োজন আছে বলে তিনি ও তার পরিবার মনে করেন নাই। আর বিয়ের পর লেখাপড়া করার সুযোগ ও ছিল না। বিয়ের পর আয়েশা খানম সংসার জীবন শুরু করেন। গৃহস্থালী কাজকর্ম, সন্তান লালন-পালন ও শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবা যত্ন তিনি একাই সব করতেন। দ্বিতীয় সন্তান জন্মানোর পর পরিবার পরিকল্পনা অফিসের মাঠকর্মীদের কর্মতৎপরতা তাকে কর্মজীবি হতে উৎসাহ যোগায়। তিনি তার এক চাচার সহযোগিতায় পরিবার পরিকল্পনা অফিসে চাকুরি গ্রহন করে। সেই থেকে আজ অবধি তিনি চাকুরিতে কর্মরত আছেন। প্রথমদিকে স্বামী ও আত্মীয়-স্বজন চাকুরি করতে বাধা দিলেও যখন দেখা যায় তার মাসিক আয় সংসারে যথেষ্ট উপাকারে আসে, তখন তারা আর চাকুরি করার ব্যাপারে আপত্তি তুলে নাই। আয়েশা খানম তার বেতনের টাকা দিয়ে স্বামীকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছেন, সংসারের ভরন-পোষনের জন্য খরচ করেছেন, সন্তানদের শিক্ষার জন্য খরচ করেছেন। বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি স্বামী, ছেলে, বৌ, মেয়ে, মেয়ের জামাইকে উপহার দেন। আয়েশা খানম বড় দুই ছেলেকে সেমিপাকা ঘর বানিয়ে দিয়েছেন এবং নিজে

Dhaka University Institutional Repository

থাকার জন্য একটা পাকা বাড়ি বানিয়েছেন। পরিবারের সবাই তার প্রতি সন্তুষ্ট। আয়েশা খানম জীবনের শুরু থেকেই অর্থ উপার্জনকারী কাজে নিয়োজিত থাকায় তার পরিবারটি দারিদ্রের করালগ্রাসে নিমজ্জিত হয় নাই।। তিনি নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং তার পবিবারটিকে তিনি সমৃদ্ধ পরিবার হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তার বড় দুই ছেলে চাকুরি করছেন, ছোট ছেলে নবম শ্রেণীতে লেখাপড়া করছে। তার ছেলের বউরা চাকুরি অথবা ঘরে থেকে অর্থউপার্জনকারী কাজে নিয়োজিত হউক এটা আয়শা খানমের ইচ্ছা। মহিলাদের ঘরে বসে শুধু গৃহস্থালী কাজ করাকে তিনি অযৌক্তিক মনে করেন্ তার মতে প্রতিটি মহিলার নিজের জন্য সংসারের জন্য কিছু আয়ু করা উচিত। আয়েশা খানম ভালবাসেন নারীদের উপার্জনক্ষম ও মর্যাদাসম্পন্ন নারী হিসেবে দেখতে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশ সমাজ ব্যবস্থার নারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আইনগত দিক থেকে পুরুষের চেয়ে অনেক নিম্নে অবস্থান করছে।সামাজিক কিছু রীতি ও মুল্যবোধ জন্মের পর থেকে পৃথক ভাবে শিশুদের সামাজিকীরণ ব্যবস্থা চালু করে। এই রীতি ও মুল্যবোধ ছেলেদের একরকম এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে অন্যরকম আচরনের শিক্ষা দিয়ে থাকে। এদেশে যুগ যুগ ধরে নারীরা পুরুষের কর্তৃত্বের অধীন,পরিবারের লালনকারী এবং শিশুর জন্মদাতা হিসেবে পরিগনিত হয়ে এসেছে। সমাজে দারিদ্র্য বেকার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগনের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে নারী। পুষ্টি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পেশা প্রভৃতি সহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষদের তুলনায় সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠী। বাংলাদেশের সমাজে পুরুষেরা পরিবারের অন্নসংস্থানকারী ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে মহিলারা তাদের দেখাশোনার ও সন্তান লালন পালন সহ ঘরের যাবতীয় কাজ করবে বলে ধারনা করা হয়। ফলে পুরুষরা হয় পরিবারের কর্তা আর পুরুষদের উপর নির্ভরশীল বলে সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও মহিলারা তাদের অধীনে থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত ও নিম্নমর্যাদার জীবন যাপনে বাধ্য হয়। সেখানে তাদের নেই কোন আলাদা পরিচিতি, নেই কোন পৃথক মর্যাদা। পুরুষ প্রধান সমাজ জীবনের প্রায় সব পর্যায়েই নিজের নয় বরং পুরুষের পরিচয়ে তারা পরিচিতি হয় এবং পুরুষের মর্যাদা অনুযায়ীই সাধারনত নারীর মর্যাদা নিরুপিত হয়। আমাদের সমাজে নারীদের কর্মক্ষেত্র প্রধানত ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে। গৃহস্থালী কাজে আবদ্ধ রেখে নারীর মেধা ও শ্রমকে করা হয়েছে অবদমিত। প্রচলিত জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষদের উৎপাদনশীলতার যেখানে প্রায় ৯৮শতাংশ হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীদের উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ গনণা করা হয়। নারীরা তাদের কর্ম সময়ের বৃহৎ অংশ গৃহস্থালি কাজে ব্যয় করলেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন হতে একে কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়না। নারীরা সকল প্রকার কৃষি উৎপাদনের ৪০-৮০ শতাংশ দায়িত্ব

Dhaka University Institutional Repository

পালন করেন। বাংলাদেশে ধান গোলায় তোলা, ধান বীজসংরক্ষন করা, খাবারের জন্য শষ্য ভাঙ্গানো ও পরিস্কার করা, পাটকাঠি হতে আঁশ ছাড়ানো, পশু ও হাঁস-মুরগি যত্ন নেয়া, শাক সবজি উৎপাদন ইত্যাদি উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে নারী সরাসরি সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে মোট গ্রামীন নারীর ৭৩.৬ শতাংশ কৃষিতে কাজ করেন। কৃষি কর্মে মহিলা জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলেও অর্থনৈতিকভাবে এদের কর্মের মূল্যায়ন হয় না। কৃষি থেকে শুরু করে শিল্প সাংবাদিকতা, প্রশাসনসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীরা অংশগ্রহন করছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহন পুর্বের তুলনায় বেড়েছে। বর্তমানে নারীদের ভূমিকা সমাজে স্থবির নয় গতিশীল। পর্দার অন্তরাল থেকে গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারের মহিলারা এখন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে পুরুষদের পাশাপাশি অংশগ্রহন করছে। দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর মেয়েরা পোশাকশিল্পে, কারখানায় চাকুরি নিয়ে উৎপাদন মূলক কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছে। গ্রামের মেয়েরা আগের তুলনায় অধিক হারে স্কুল-কলেজে পড়ছে এবং চাকুরিতে যোগ দিচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রামীন সমাজব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পবির্তন নিয়ে এসেছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা প্রমাণ করেছে যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করলে যেমন, ঋণ, প্রশিক্ষন দক্ষতা ও অন্যন্য মানসিক সহযোগিতা পেলে গ্রামীন মহিলারা খাদ্য উৎপাদনে এবং পারিবারিক অর্থোপার্জনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এই সব কার্যক্রমে অংশগ্রহনের ফলে যে মহিলারা উপকৃত হয়েছেন, তাদের আত্মনির্ভরশীলতা ও লাভজনক স্বনিয়োগের সম্ভাবন সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের মধ্যে স্বামী পরিত্যক্তা ও ছিন্নমূল মহিলার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় স্ত্রী কর্তৃত্বাধীন পরিবারের অনুপাত ও ক্রমশ:ই বেড়ে গেছে। এই ধরনের পরিবারের বৃদ্ধি অনেক নারীর জন্যই স্বামী এবং যৌথ পরিবারের উপর নির্ভরশীলতা ও ভরসার বুনিয়াদ দুর্বল করে তাদের বাধ্য করেছে স্বনিয়োজিত অথবা মজুরিভিত্তিক কাজ খুজে নিতে। ফলে নারীর একার অথবা নারী এবং পুরুষের যৌথ উপার্জনের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্টী মধ্যে। এমারগাও গ্রামের ৭৪ জন কর্মজীবি মহিলাদের মধ্যে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের স্বামীর অবর্তমানে এদের ভরন-পোষণ দেবার লোকের অভাব রয়েছে। তাই সংসারের খরচ চালানোর জন্য সন্তানের মুখের অন্ন যোগানোর জন্য এরা রোজগার করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে।

আবার বিবাহিত মহিলারা সংসার পরিচালনায় স্বামীর অক্ষমতা, দায়িত্বহীনতা অথবা সংসারকে স্বচ্ছলভাবে চালানোর জন্য মজুরি কর্ম গ্রহন করেছে। পরিবার পরিচালনায় স্বামীর পাশাপাশি অথবা একাই সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে অর্থ-উপার্জনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। সমাজের প্রচলিত প্রথা ভেঙ্গে, পর্দা প্রথাকে উপেক্ষা করে যখন এই গ্রামীণ মহিলারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন থেকে তাদের জীবরে এসেছে আমূল পরিবর্তন। সমাজে ও পরিবারে এই সব কর্ম জীবি মহিলা এখন কার্যকরী ভুমিকা পালন করেছে। ফলে তাদের আর্থ সামাজিক জীবনে এসেছে পরিবর্তন। আলোচ্য অধ্যায়ে বিভিন্ন সারনীর মাধ্যমে কর্মজীবি মহিলাদের আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

পরিবার প্রধান

বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজে গুরুত্ব সহকারে পরিবার প্রধান এর অবস্থান নির্ণয় করা হয়। বাংলাদেশের পিতৃপ্রধান পরিবারে সাধারনত পিতা বা স্বামীই পরিবার প্রধান। পরিবার প্রধান হিসেবে পরিবার জীবনে কতগুলো উলেখযোগ্য বিষয় থাকে যেখানে পরিবার প্রধান কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হয়। যেমন- কোথায় সন্তান সন্ততি লেখাপড়া করবে, কখন-কোথায় তারা বিয়ে করবে, কর্মজীবনে কোন ধরনের পেশা গ্রহন করবে এসব ক্ষেত্রে পরিবার প্রধান সিদ্ধান্ত নেয়। গবেষণা এলাকার কর্মজীবি মহিলাদের পরিবার প্রধান সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ কালে দেখা গিয়েছে ৪৫ জন কর্মজীবি মহিলাই পরিবার প্রধান। এই পরিবার প্রধান মহিলারা একক নেতৃত্বে ও সিদ্ধান্তে সংসার পরিচালনা করছে। নিম্নের২৭- নং সারনীতে তা তুলে ধরা হলো।

সারনী নং ২৭: উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবার প্রধান

পরিবার প্রধান	সংখ্যা	শতকরা হার
নিজে	৪৫	৬০.৮১
স্বামী	২৪	৩২.৪৩
পিতা, বড় ভাই, পুত্র	৫	৬.৭৬
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপিত সারনীর তথ্য হতে দেখা যায় কর্মজীবি মহিলাদের সর্বোচ্চ ৬০.৮১ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫ জন নিজেই পরিবার প্রধান। এরপর রয়েছে ৩২.৪৩ শতাংশ অর্থাৎ ২৪ জনের পরিবারে প্রধান হচ্ছে স্বামী। পিতা,বড় ভাই ও পুত্র পরিবার প্রধান হিসেবে আছে ৬.৭৬ শতাংশ অর্থাৎ ৫ জনের। উপার্জনকারী সদস্য হিসাবে মহিলাদের পরিবার প্রধান হিসবে বিবেচিত হওয়ায় পরিবার ও সমাজে তাদের সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন হয়েছে এবং দারিদ্র বিমোচনে অংশ নিচ্ছে।

গৃহস্থালী কাজে উপার্জনকারী মহিলাদের ভুমিকা

গৃহস্থালী কাজ নারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গৃহস্থালীর কাজ প্রায় এককভাবে নারী সম্পন্ন করেন। নারীরা তাদের কর্মসময়ের বৃহৎঅংশ এইকাজে ব্যয় করেন। অধিকাংশ গ্রামীন নারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদন বা বাজারের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা কর্মকান্ডে জড়িত থাকেন। ধান গোলায় তোলা, ধান বীজ সংরক্ষন করা, খাবারের জন্য শষ্য ভাঙ্গানো ও পরিস্কার করা, পাটকাঠি হতে আঁশ ছড়ানো পশু হাঁস- মুরগি যত্ন নেয়া, শাক-সবজি উৎপাদন ইত্যাদি উৎপাদনমুলক কাজের সাথে সরাসারি সম্পৃক্ত। এছাড়া নারীরা রান্না করা কাপড় ও বাসনপত্র ধোয়া, ঘর পরিস্কার করা, পানি আনা, ছেলে মেয়েদের গোসল করানো স্বামী ও ছেলে মেয়েদের খাওয়ানো ইত্যাদি কাজগুলো এককভাবে নারী সম্পন্ন করেন। কিন্তু অর্থনেতিক দৃষ্টিকোন হতে একে কাজ হসেবে বিবেচনা করা হয়না। বাংলাদেশে ১০ থেকে ৬৪ বৎসর বয়স্ক কর্মক্ষম মহিলার জনসংখ্যার প্রায় ৯৫ শতাংশকে ঘরনী নামকরনে আখ্যায়িত করে রাষ্ট্রের শ্রমশক্তি থেকে তাদেরকে বাধ দেওয়া হয়েছে। গবেষণা এলাকার কর্মজীবি মহিলাদের কর্মজীবি হওয়ার পুর্বে ও কর্মজীবি হওয়ার পরে গৃহস্থালী কাজে তাদের ভুমিকায় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।যা নিম্নের ২৮-নং সারনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারনী নং ২৮ : গৃহস্থালী কাজে উপার্জনকারী মহিলাদের ভুমিকা

কর্মজীবি হওয়ার পুর্বে গৃহস্থালী কাজের তথ্য			কর্মজীবি হওয়ার পরে গৃহস্থালী কাজের তথ্য	
গৃহস্থালী কাজ করেন	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
নিজে করে	৬৪	৮৬.৪৯	৪২	৫৬.৭৬
নিজে ও অন্যান্যরা করে	৭	৯.৪৬	২৫	৩৩.৭৮
অন্যান্যরা করে	৩	৪.০৫	৭	৯.৪৬
মোট	৭৪	১০০	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারনীর তথ্যে দেখা যায় কর্মজীবি হওয়ার পুর্বে গৃহস্থালী কাজ নিজহাতে করতেন ৮৬.৪৯ শতাংশ অর্থাৎ ৬৪ জন। গৃহস্থালী কাজে অন্যের সাহায্যে করেন ৯.৪৬ শতাংশ অর্থাৎ ৭ জন। গৃহস্থালী কাজ অন্যের হাতে করাতেন ৪.০৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩ জন। কর্মজীবি হওয়ার পরে গৃহস্থালী কাজ ৫৬.৭৬ শতাংশ অর্থাৎ ৪২ জন নিজ হাতে করেন। কর্মজীবি মহিলার ৩৩.৭৮ শতাংশ অর্থাৎ ২৫ জন অন্যের সাহায্যে গৃহস্থালী কাজ করেন। গৃহস্থালী কাজ অন্যকে দিয়ে করান ৯.৪৬ শতাংশ অর্থাৎ ৭ জন। পরিবারের অর্থ উপার্জনকারী সদস্য হওয়ায় গৃহস্থালী কাজে মহিলাদের ভূমিকার পরিবর্তন এসেছে তা সংগৃহীত তথ্য হতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। মজুরি কর্ম গ্রহন করার কারনে এই সব কর্মজীবি মহিলারা আর পুর্বের মত গৃহস্থালী কাজে সময় দিতে পারে না। ফলে তারা গৃহস্থালী কাজে মা বোন শাশুড়ি বা মেয়ের সাহায্য নিয়ে থাকে। আবার সাহায্যকারী না পেলে গৃহস্থালী সমস্ত দায়িত্বই তাদের পালন করতে হয়। গবেষণা এলাকার মহিলাদের গৃহস্থালীর কাজের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসলেও গৃহকর্মে এখনও তাদের ভুমিকা গুরুত্বপুর্ণ।

নিজ আয়ের উপর নিয়ন্ত্রনের প্রকৃতি

বাংলাদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা সর্বক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের পরিবারে মেয়েরা সর্বদাই পুরুষের অধীনে থাকে। মহিলাদের চলা-ফেরা, আচার আচরন ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবাকিছুই

পুরুষের নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত হয়। বর্তমানে মহিলারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও দেখা যায় তার আয়ের উপর তার নিয়ন্ত্রন নাই। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় দিন মজুর দম্পত্তি দিনান্তে কাজ শেষে যখন মজুরি নেয় তখন তাদের দুজনারন মজুরি মালিকের কাছ থেকে স্বামী নিজ হাতে নিয়ে নেয়। এতে দেখা যায যে নিজের উপার্জিত অর্থের উপরত্ত মহিলাদের নিয়ন্ত্রন নাই। এই আর্থ সামাজিক ক্ষমতাহীনতাই মহিলাদেরকে ব্যাপক দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার জন্য বহুলাংশে দায়ী ।এমারগাও গ্রামের অর্থ উপার্জনকারী মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় মজুরি কর্ম তাদেরকে যথোষ্টভাবে ক্ষমতায়িত করেছে। সারনী নং ৬.৩ এ উপস্থাপিত তথ্য হতে দেখা যায় ৬৪.৮৬ শতাংশ মহিলা নিজ উপার্জিত অর্থের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে অর্থাৎ নিজের উপার্জিত অর্থ নিজেই খরচ করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন। প্রাপ্ত তথ্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে মজুরি কম মহিলাদের ক্ষমতায়নে সফল হয়েছে। ক্ষমতা অর্জন করার প্রধান শর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জন করা। অর্থ উপার্জন করে তা পরিবারে ব্যয় করলেই অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয় না। নিজের উপার্জিত অর্থ নিজ হাতে ব্যয় করার ক্ষমতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করা যায় এবং যার মাধ্যমে পরিবারে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা হয়।এই সব দিক বিবেচনা করে এমারগাও গ্রামের উপার্জনকারী মহিলাদের উপার্জিত অর্থের উপর নিয়ন্ত্রনের প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা সারনী নং ২৯- তুলে ধরা হয়েছে।

সারনী নং ২৯: উপার্জনকারী মহিলাদের উপার্জিত অর্থের উপর নিয়ন্ত্রনের প্রকৃতি।

আয়ের উপর নিয়ন্ত্রন	সংখ্যা	শতকরা হার
নিজের	৪৮	৬৪.৮৬
স্বামীর	১৩	১৭.৫৭
নিজের ও স্বামীর	৯	১২.১৬
পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের (যেমন- পিতা, বড় ভাই, পুত্র ইত্যাদি)	৪	৫.৪১
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারনীর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কর্মজীবি মহিলাদের সর্বোচ্চ ৬৪.৮৬ শতাংশ অর্থাৎ ৪৮ জনের নিজের উপার্জনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রন রয়েছে। তারা তাদের একক সিদ্ধান্তে নিজের উপার্জন খরচ করেন। স্বামীর সিদ্বান্তে নিজের উপার্জিত অর্থ খরচ করেন ১৭.৫৭ শতাংশ অর্থাৎ ১০ জন। দেখা গেছে ৭ থেকে ১২ ঘন্টা পরিশ্রম করেও তাদের উপার্জনের উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রন নেই। নিজের উপার্জিত অর্থের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রন না থাকার কারনে তারা নিজের উন্নতির জন্য খরচ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উপার্জনকারী মহিলারা তাদের উপার্জিত অর্থাৎ যৌথ সিদ্বান্তে খরচ করেন ১২.১৬ শতাংশ অর্থাৎ ৯ জন।আবার দেখা যায় বিধবা তালাকপ্রাপ্ত বা অবিবাহিত উপার্জন কারীর অর্থের নিয়ন্ত্রণ বাবা, বড় ভাই বা পুত্রের নিয়ন্ত্রণে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ৫.৪১ শতাংশ অর্থাৎ ৪ জনের উপার্জিত অর্থ নিয়ন্ত্রণ করেছে অন্যান্যরা। গবেষণা এলাকার তথ্য সংগ্রহ কালে দেখা গেছে যারা নিজের উপার্জিত অর্থ নিজের সিদ্বান্তে খরচ করেন তারা তাদের উপার্জিত আয় নিজেদের উন্নতির জন্য খরচ করছেন। উপার্জনকারী মহিলারা তাদের উপার্জিত অর্থের কিছু অংশ জমি, বাড়ি অথবা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছেন। কিছু উপার্জনকারী ভবিষৎ নিরাপত্তার জন্য উপার্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকে জমা রাখেন। এমারগাও গ্রামের উপার্জনকারী মহিলারা আর্থিক নির্ভরশীলতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত হয়ে আর্থ-সামাজিক জীবনে কিছুটা হলে পরিবর্তণ আনতে সক্ষম হয়েছে। উপার্জনকারী কর্ম মহিলাদের ক্ষমতায়নে সফল হয়েছে।

উপার্জনকারীদের উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ

আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ঘরের ভেতর নারী যুগ যুগ ধরে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই বৈষম্যের মূল কারণ নারী পুরুষের শ্রমের উপর নির্ভরশীল। সমাজ নারীকে অর্থকরী শ্রম হতে বিচ্ছিন্ন করে তার আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। এই পরনির্ভরশীলতার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তারা ঘরের বার হলেন এবং পুরুষের মত অর্থকর্মগ্রহণ করলেন। অর্থকর্ম গ্রহণ করার পরও কি তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল। সেটি নির্ধারণ করতে গেলে তার উপার্জিত অর্থ পরিবারে কোন খাতে ব্যয়িত হচ্ছে সেটি দেখতে হবে। এই সব কারণে এমারগাও গ্রামের কর্মজীবি মহিলাদের আয় পরিবারে কোন খাতে ব্যয় করা হয় তার তথ্য সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে।যা নিম্নের সারনী নং ৩০-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারনী নং ৩০: উপার্জনকারীদের উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের খাত সমূহ

ব্যয়ের খাত সমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
পরিবারের সার্বিক ভরন পোষণ	৩৩	৪৪.৫৯
পরিবারের সদস্যদের কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়	১৩	১৭.৫৭
ঋণ পরিশোধ	৫	৬.৭৬
বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যয়	৩	৪.০৫
সন্তানদের শিক্ষা	১২	১৬.২২
ঘরবাড়ি তৈরি ও মেরামত	৮	১০.৮১
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারনীর তথ্য বিশেষণে দেখা যায় কর্মজীবি মহিলাদের উপার্জিত অর্থ ৪৪.৫৯ শতাংশ অর্থাৎ ৩৩ জনই ব্যয় করেন পরিবারের সার্বিক ভরন পোষণে। পরিবারের সদস্যদের কাপড়ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ে স্বামীকে সাহায্য করেন ১৭.৫৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৩ জন। এরপর ঋণ পরিশোধ খরচ করেন ৬.৭৬ শতাংশ অর্থাৎ ৫ জন। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যয় করেন ৪.০৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩ জন।আর সন্তানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন ১৬.২২ শতাংশ অর্থাৎ ১২ জন। কর্মজীবিদের উপার্জিত অর্থ ঘরবাড়ি তৈরি ও মেরামতে ব্যয় করেন ১০.৮১ শতাংশ অর্থাৎ ৮ জন। এখানে উল্লেখ্য যে কর্মজীবি মহিলাদের ৩৩ জন (৪৪.৪৯%) পরিবারের সার্বিক ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালনকরেন। এক্ষেত্রে তারা সংসারের অন্নসংস্থানকারীর ভুমিকা পালন করেছেন এবং পরিবারে তারা প্রধান উপার্জনকারী সদস্য।এসব পরিবারকে মহিলা প্রধান পরিবার বলা যায় যেখানে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরিবারের খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত

খাদ্য জীবনধারনের জন্য অপরিহার্য। মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে খাদ্যের প্রয়োজন কে সবার আগে পূরন করার চেষ্টা করা হয়। অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহন দারিদ্র্যতার একটি প্রধান লক্ষণ। পরিবারের খাদ্য ক্রয় ও খাদ্য গ্রহণ সাধারণত পরিবারের সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কিত। খাদ্য দ্রব্য ক্রয় ও গ্রহন সম্পর্কিত তথ্য বিচার করলে দেখা যায় তাদের ভোগমান মজুরিকর্মগ্রহন করার পর বেড়েছে। উপার্জনকারী হওয়ার আগে তাদের ভোগমানের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুন। ১৬ জন চাকুরিজীবি মহিলা ও ৫৮ জন স্বকর্মেনিয়োজিত মহিলা উপার্জনকারী কাজে নিয়োজিত হওয়ার আগে দুই বেলা পেট ভরে খেতে পেতেন না। উপার্জনকারী হওয়ার পর তাদের ভোগমান বেড়েছে এবং খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন। নিম্নের ৩১-নং সারনীতে তা তুলে ধরা হলো।

সারনী নং ৩১: উপার্জনকারী মহিলা পরিবারের খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহন	সংখ্যা	শতকরা হার
নিজে	৪৩	৫৮.১১
স্বামী	১৭	২২.৯৭
যৌথ ভাবে (স্বামী স্ত্রী)	১০	১৩.৫১
পরিবারের অন্য সদস্যরা	৪	৫.৪১
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারনীর তথ্যে দেয়া যায় উপার্জনকারী মহিলাদের সর্বাধিক ৫৮.১১ শতাংশ অর্থাৎ ৪৩ জন নিজেই খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর রয়েছে ২২.৯৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৭ জনের স্বামী খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। স্বামী ও স্ত্রী যৌথভাবে খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ১৩.৫১ শতাংশ অর্থাৎ ১০ জন। পরিবারের অন্যান্যরা খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ৫.৪১ শতাংশ অর্থাৎ ৪ জন। উল্লেখিত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায় উপার্জনকারী মহিলারা পরিবারের প্রধান প্রধান বিষয়ের সিদ্ধান্ত

গ্রহনকারী। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত আসা যায় যে পরিবারে তাদের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিবারের দারিদ্র্য দুর করতে তারা সক্ষম হয়েছে।

পরিবারে বিবাহের খরচের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশে বিবাহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। বিবাহে নানা ধরনের সামাজিক আনুষ্ঠানিকতা পালন নিয়মে পরিনত হয়েছে। যে আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে পরিবারকে একটা বড় অংকের টাকা খরচ করতে হয়। দরিদ্র পরিবারগুলোর এই আনুষ্ঠানিকতা পালন করা অনেক ক্ষেত্রে কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে এবং এইজন্য দরিদ্র পরিবারগুলো বিবাহের বাহুল্য আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়ে সীমিত আয়োজনে বিবাহের অনুষ্ঠান করে। এসব দিক বিবেচনা করে দুই একটা ব্যতিক্রম ছাড়া গবেষণা এলাকার বিবাহ অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানিকতা সমাজজীবনে গুরুত্বাপূর্ন স্থান দখল করে আছে। গবেষণা এলাকার শ্রমজীবি মহিলা পরিবারগুলোতে বিবাহের খরচের ক্ষেত্রে কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা জানার জন্য এ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যা সারনী নং ৩২ এর মাধ্যমে তুলে ধরাহলো।

সারনী নং ৩২: উপার্জনকারী মহিলা পারবারে বিবাহের খরচের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকারী।

বিবাহের খরচের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত কারী	সংখ্যা	শতকরা হার
নিজে	৪৫	৬০.৮১
স্বামী	২২	২৯.৭৩
অন্যান্য	৭	৯.৪৬
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারনীর তথ্য হতে দেখাযায় বিবাহের খরচের ক্ষেত্রে কর্মজীবি মহিলাদের ৬০.৮১ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫ জন নিজে সিদ্ধান্ত নেন। স্বামী বিবাহের খরচের সিদ্ধান্ত নেন ২৯.৭৩ শতাংশ অর্থাৎ ২২ জন এবং ৯.৪৬ শতাংশ অর্থাৎ ৭ টি পরিবরে বিবাহের খরচের সিদ্ধান্ত অন্যান্যরা গ্রহণ করে। বিবাহে খরচের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যান্য সাথে ক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি জড়িত। সারনীতে প্রাপ্ত তথ্য হতে বিবাহে খরচের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে উপার্জনকারী মহিলাই ভূমিকায় প্রাধান্য পেয়েছে। এর থেকে দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রতীয়মান হয়।

যৌতুক সম্পর্কিত মতামত

বিয়েতে এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে বিয়ের আগে বা পরে বিয়ে বাবদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদান করতে সম্মত যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত হলো যৌতুক। বাংলাদেশে যৌতুক দাবি ও যৌতুক লেনদেন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসলেও সাম্প্রতিকালে যৌতুক একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বস্তুত গত ২৪/২৫ বছর যাবৎ যৌতুক সমস্যা প্রকট রূপ ধারন করেছে। যৌতুকের জন্য অনেক পরিবার ভেঙ্গে গিয়েছে ও যাচ্ছে। অনেক মহিলাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। যৌতুক দাবি মেটাতে গিয়ে অনেক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবার তাদের আর্থিক বিপর্যয় ডেকে আনে। যৌতুকের দাবি মেটাতে অনেকেই গৃহপালিত পশু বিক্রি করছেন, জমি বিক্রি করছেন, কেউবা সারাজীবনেরে সামান্য সঞ্চিত কিছু অর্থ সেটাও ব্যয় করছেন। যৌতুক মেটাতে তাই অনেক পরিবারই সর্বশান্ত হয়ে পথে বসেছে। বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা বাল্য বিবাহের একটি প্রধান কারণ। পাত্রীর বয়স কম হলে যৌতুক কম হয়। এ ক্ষেত্রে যৌতুকের দাবি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পিতা মাতা কণ্যাকে অল্প বয়সে বিয়ে দেন। একটি সমীক্ষার দেখা গেছে যৌতুকের জন্য যে নারীরা নির্যাতনের শিকার তাদের প্রায় ৪০ শতাংশেরই বয়স ১৮ কিংবা তার নিচে। প্রায় ১০ শতাংশ নারী যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। যৌতুক প্রথাটি বাংলাদেশের বিবাহ কৃষ্টিতে এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে যে যৌতুক ছাড়া বিবাহ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে। এমারগাও গ্রামে বিবাহে যৌতুক একটি প্রচলিত প্রথা হিসাবে স্বীকৃত। এই গ্রামে যৌতুক দেওয়া-নেওয়াকে স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে মনে করা হয়। ধনী পরিবারগুলো যৌতুক লেনদেন এর জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু দরিদ্র পরিবারগুলো যৌতুকের করালগ্রাসে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষার বিস্তার ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রভাবে যৌতুক প্রথাকে গ্রামবাসীরা এখন অসামাজিক প্রথা বলে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। উপার্জনকারী মহিলাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যৌতুককে অবৈধ প্রথা বলেছেন। নিম্নের সারনীতে-এ সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী নং ৩৩: উপার্জনকারী মহিলাদের যৌতুক দেয়া সম্পর্কিত মতামত

যৌতুক দেয়া সম্পর্কিত মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
যৌতুক দেয়া উচিত	৭	৯.৪৬
যৌতুক দেয়া উচিত নয়	৬২	৮৩.৭৮
মতামত নেই	৫	৬.৭৬
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারণীর তথ্যে দেখা যায় উপার্জন কারী মহিলাদের মধ্যে যৌতুক দেয়া উচিত নয় বলে মনে করেন ৮৩.৭৮ শতাংশ অর্থাৎ ৬২ জন। আর যৌতুক দেওয়া উচিত মনে করেন ৯.৪৬ শতাংশ অর্থাৎ ৭ জন। যৌতুক লেন-দেন সম্পর্কে কোন মতামত নেই ৬.৭৬ শতাংশ অর্থাৎ ৫ জনের। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায় যৌতুক দেয়া সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব উপার্জনকারী মহিলাদের সচেতনতারই বহি:প্রকাশ ঘটেছে। নারী সমাজের এই সচেতনতাই তাদের পরনির্ভশীলতা ও দারিদ্র্য মুক্ত করতে সহায়তা করবে।

উপার্জনকারী মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহনের ধরন

নির্বাচন একটি গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ন বিষয়। নির্বাচনে হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য জন প্রতিনিধি বাচাইয়ের একটি অন্যতম মাধ্যম। বাংলাদেশে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান বিশ্বে নির্বাচনই হল সব রাজনৈতিক চেতনার কেন্দ্র বিন্দু। একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে নাগরিকদের মতামত প্রকাশিত হয়। আর এর ফলে সরকার সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করার সুযোগ প্যায়। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও সুন্দরভাবে পারিচালনার জন্য পুরো দেশকে কতকগুলো নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনও নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একাধিক ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভোট দান মানুষের রাজনৈতিক অধিকার এবং এর সঙ্গে জনগনের সামগ্রিক কল্যাণ ও অকল্যাণ জড়িত। ভোটাধিকার বলতে বোঝায় নির্বাচনে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটারের মতামত

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশের অধিকার। নির্বাচনে অংশগ্রহন ও ভোটদান ব্যক্তির রাজনৈতিক সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ। গবেষণা এলাকার কর্মজীবি মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হযেছে। নিম্নের সারনীতে তুলে তা ধরা হলো।

সারনী নং ৩৪: উপার্জনকারী মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহনের ধরণ

নির্বাচনে অংশগ্রহনের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
ভোট দিয়ে অংশগ্রহণ	৬৬	৮৯.১৯
কর্মী হিসেবে অংশগ্রহন	৮	১০.৮১
প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহন	-	০
ভোট দেন নাই	-	০
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারনীর তথ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহন ও ভোট দেয়া সম্পর্কে কর্মজীবি মহিলাদের অধিকাংশ ৮৯.১৯ শতাংশ অর্থাৎ ৬৬ জন মনে করে নির্বাচনে অংশগ্রহন ও ভোট দেয়া তাদের অধিকার ও কর্তব্য। আর ১০.৮১ শতাংশ অর্থাৎ ৮ জন নির্বাচনের কর্মী হিসেবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেছে। যা থেকে নারী ক্ষমতায়ন পথে অগ্রসর হচ্ছে বলা যায়। ভোটার এবং কর্মী হিসেবে মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহনের সংখ্যাগত পরিমাপ রাজনৈতিক সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের ইঙ্গিত দেয়। ১৯৯৭ সালে নতুন স্থানীয় সরকার আইন এবং এই আইনে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত পদে সরাসরি নারীদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়, যা এ দেশে নারীর আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে মাইল ফলক হিসাবে বিবেচিত। ১৯৯৭ সালে থেকে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়ে আসছে। মহিলারা এখন থেকে তাদের পছন্দমত মহিলা প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন। নারীরা এখন পুরুষের মতনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে চিন্তাভাবনা করতে পারবে- এভাবেই নারী ক্ষমতায়নের পথে এগুবে।নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহন তথা ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইউনিয়ন পরিষদে সর্বশেষ সংস্কার এবং নির্বাচনের অনুষ্ঠান মধ্য দিয়ে তৃণমূল

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক নারীকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এমারগাও গ্রামের প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় সব শ্রমজীবি মহিলাই ভোট দিয়ে ও কর্মী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহন করেছে। এমারগাও গ্রাম ও জয়নগর গ্রাম নিয়ে তারা নগর ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নং ওয়ার্ড। ২০০৩ সালের নির্বাচনে জয়নগর গ্রাম থেকে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

পরিবারের চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

স্বাস্থ্য জীবনযাত্রার মান বিচারের একটি অতি প্রয়োজনীয় মনদন্ড। স্বাস্থ্য মানব জীবনের মৌলিক প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের অভাবে মানব জীবনকে উন্নত বলা যায়না। ভগ্নস্বাস্থ্য দরিদ্রকে আর দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয় এবং এই দারিদ্র্য আবার দরিদ্রকে আরও ভগ্নস্বাস্থ্য সম্মুখীন করে। দারিদ্র্যতা আর ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে গ্রামীন দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী নানা রকম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী অজ্ঞতা কুসংস্কার ও অসচেতনার কারনে রোগ- ব্যাধি সম্পর্কে উদাসীন থাকে। আবার আর্থিক সামর্থ না থাকায় চিকিৎসা গ্রহন করতে পারেনা। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ঘরের ভেতর নারী যুগ যুগ ধরে বৈষম্যের শিকার হয়েছেণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। কর্মজীবি হওয়ার পুর্বে তারা ভোগ শিক্ষা এবং চিকিৎসা গ্রহনের বেলায় বৈষম্যের শিকার হতেন। মজুরি কর্ম গ্রহন করার পর চিকিৎসা গ্রহনের বেলায় বৈষম্য কিছুটা দূরীভূত হয়েছে। কেননা সে এখন নিজেই উপার্জনকারী সদস্য এবং ঘরের বাইরে এসে চিকিৎসা গ্রহন করতে পারেন। তাছাড়া মজুরিকর্ম গ্রহণের পর তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অসুস্থ শরীর নিয়ে তাদের দীর্ঘ শ্রম ঘন্টা এবং এক নাগাড়ে মাসের ৩০ দিন কাজ করা কষ্টকর হয়। তাইতারা চিকিৎসা গ্রহনের ব্যাপারে প্রায় এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। নিম্নের সারনীতে তা উপস্থাপন করা হলো।

সারনী নং ৩৫: পরিবারের চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত	সংখ্যা	শতকরা হার
নিজে	৫২	৭০.২৭
স্বামী	১২	১৬.২২
যৌথভাবে	৮	১০.৮১
অন্যান্যরা	২	২.৭০
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপিত সারনীর তথ্যে দেখা যায় অধিকাংশ কর্মজীবি মহিলা ৭০.২৭ শতাংশ অর্থাৎ ৫২ জন নিজে চিকিৎসা সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেন। আর চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্বামী গ্রহন করেন ১৬.২২ শতাংশ অর্থাৎ ১২ জন মহিলার। যৌথভাবে চিকিৎসা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন ১০.৮১ শতাংশ অর্থাৎ ৮ জন। পরিবারের অন্যান্যরা চিকিৎসা সিদ্ধান্ত নেন ২.৭০ শতাংশ অর্থাৎ ২ জনের ক্ষেত্রে। চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় যে তারা চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধাত নেওয়ার ক্ষমতা থেকে প্রতীয়মান হয় তারা চিকিৎসা দারিদ্র্যতা ঘোচাতে সক্ষম হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

পরিবার পরিকল্পনা বলতে একটি পরিকল্পিত পরিবারকে বুঝায়। পরিবারে আর্থিক উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হবে এবং একইভাবে সকলের সুস্বাস্থ্য এবং সুশিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার আধিক্য রয়েছে। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পরিবার পরিকল্পনা শব্দটির সাথে সবই পরিচিত। সাধারনত আমাদের দেশ পরিবার পরিকল্পনা বলতে জন্মনিয়ন্ত্রণকে বোঝানো হয়। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। আমাদের দেশ জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে প্রচন্ড হারে। এ জনসংখ্যা কমিয়ে রাষ্ট্রের আয়ত্তের মধ্যে আনতে হবে। না হলে ম্যালথাসের সূত্র অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে এখানে নিত্যসঙ্গী। দেশের সম্পদের তুলনায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশের উন্নয়নকে ব্যাহত করে, দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং নানাবিধ সামাজিক সমস্যার জন্ম দেয়। সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে জীবন যাত্রার মান নিম্ন হয়। দেখা দেয় বেকারত্ব, দারিদ্র্য। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বাংলাদেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়ছে না। ফলে দেশের আর্থ সামাজিক কাঠামো ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে জনগন দিন দিন দারিদ্র্যতার শিকার হচ্ছে। তাই জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ তথা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের জন্য ব্যাপক প্রচার প্রচারণা এবং কর্মসূচি গ্রহন দেশের জনগনের উপর সার্বিকভাবে প্রভাব ফেলেছে।বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ১.৪৮। সরকার জনসংখ্যা বিস্ফোরনকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং ২০১০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা বার্ষিক ১.৩১ ভাগে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে।

এসব দিক বিবেচনা করে গবেষণা এলাকার পরিবার পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে ভূমিকা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যা নিম্নের সারনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

সারনীর নং ৩৬: উপাজনকারী মহিলা পরিবারে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনের সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী	সংখ্যা	শতকরা হার
নিজে	২৪	৩২.৪৩
স্বামী	৬	৮.৪১
প্রযোজ্য নয়	৪৪	৫৯.৪৬
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারনীর তথ্য বিশেষণ দেখা যায় উত্তরদাতার ৩২.৪৩ শতাংশ অর্থাৎ ২৪ নিজে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনে সিদ্ধান্ত নেয়। আর ৮.৪১ শতাংশ অর্থাৎ ৬ জনের স্বামী সিদ্ধান্ত নেয়। সন্তান জন্মদান থেকে শুরু করে সন্তান লালন পালনের সমস্ত দায়িত্ব মহিলাদের বহন করতে হয়, তাই সংসার ছোট হলে মহিলাদের কাজের চাপ কমে। তাছাড়া ছোট পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকে, দারিদ্র্যতা কমে আসে সরকারের এই নীতিমালার সাথে একাত্ত হয়ে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনে নিজেরাই উপার্জনকারী মহিলা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, তালাকপ্রাপ্ত ও অবিবাহিতদের এই তথ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

উপার্জনকারী মহিলাদের সন্তানের ভবিষৎ সম্পর্কে আশা

শিশুরা দেশের মোট জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেননা শিশুরা হচ্ছে ভবিষৎ নাগরিক। বাংলাদেশের ২০০১ আদমশুমারি অনুযায়ী ৩৫ শতাংশেরও বেশি জনগন ১৫ বয়স সীমার নিচে বাস করছে। এই গোষ্ঠীর উন্নয়নে উপর নির্ভর করে একটি দেশের ভবিষৎ আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন। আর শিশুগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করছে তারা তাদের অধিকারগুলো কতটা ভোগ করতে পারছে তার উপর। সামাজিক মূল্যবোধ সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেদে বিভিন্ন দেশে শিশুর অধিকার কিছুটা ভিন্ন হলেও তাদের মৌলিক অধিকারগুলো সারা বিশ্বের শিশুর জন্য এই রকম। সারা বিশ্বের শিশুর অধিকার সংরক্ষনের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকারের কনভেনশন প্রনয়ণ করে। এই কনভেনশনে অন্তর্ভূক্ত অন্যতম শিশু অধিকারগুলো হচ্ছে। ১.শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার ২.শিশুর মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে তা স্ফুরিত হওয়ার জন্য সব রকম সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার ৩. উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার পাওয়ার অধিকার ৪. ঝুকিপূর্ণ শ্রম, সন্ত্রাস এবং নির্যাতন হতে রক্ষা পাওয়ার অধিকার এবং৬.তাদের নিজেদের ব্যপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় অংশগ্রহণের অধিকার। বাংলাদেশের শিশুগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম, পাচার সন্ত্রাস এবং নির্যাতনের শিকার হয়ে এই মৌলিক অধিকার গুলো হতে বঞ্চিত। বংলাদেশে একটি মূল্যবোধ রয়েছে যে পুত্র পিতাকে সাহায্য করবে এবং কন্যা তার মাতাকে গৃহস্থালী কাজে সাহায্য করবে। এই মূল্যবোধের কারণে পিতা-মাতা তাদের শিশু সন্তানকে পরিশ্রমী কাজে নিয়োজিত করে। এর কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। গৃহভৃত্যের কাজে পোশাক শিল্পে ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু শ্রম নিয়োজনের কারণ হচ্ছে দারিদ্র্যতা। গ্রামের দরিদ্র পরিবারে একজন ছেলে বা মেয়েকে আর্থিক দৈন্যতার দরুণ তাদের অভিভাবকরা স্কুলে পাঠানো চেয়ে উপার্জনমূলক কাজে লাগানোর প্রতি বেশি আগ্রহী। ফলে এসব ছেলে-মেয়েরা শিশুশ্রমে নিয়োজিত হয়ে শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এমারগাও গ্রামের দরিদ্র কর্মজীবি মহিলা যারা দারিদ্র্যতার কারণে গ্রহন করেছে বিভিন্ন অর্থউপার্জনকারী পেশা। এই উপার্জনকারী মহিলারা তাদের সন্তানের শিক্ষা, সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি ভাবছে। সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যা নিম্নের সারনীতে তুলে ধরা হলো।।

সারনী নং ৩৭: উপার্জনকারী মহিলাদের সন্তানের ভবিষৎ সম্পর্কে আশা

সন্তানদের ভবিষৎ সম্পর্কে আশা	সংখ্যা	শতকরা হার
লেখাপড়া শিখবে	৩৫	৪৭.৩০
অল্প পড়ে কাজ করবে	১০	১৩.৫১
অল্প পড়ে ব্যবসা করবে	১৩	১৭.৫৭
উচ্চশিক্ষিত হবে	১৪	১৮.৯২
লেখাপড়া না করে আয় করার	২	২.৭০
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উপস্থাপিত সারনী তথ্য বিশেষণ করে দেখা যায় সর্বাধিক ৪৭.৩০ শতাংশ অর্থ্যাৎ ৩৫ জন সন্তান লেখাপড়া শিখবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। এরপর রয়েছে ১৮.৯২ শতাংশ অর্থাৎ ১৪ জন সন্তান উচ্চশিক্ষিত হবে বলে আশা করেন। আর ১৭.৫৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৩ জন সন্তান কিছু লেখাপড়া শিখে ব্যবসা করবে জানায়। আর ১৩.৫১ শতাংশ অর্থাৎ ১০ জন সন্তান অল্প লেখাপড়া শিখে কাজ করবে। গরিবের আবার লেখাপড়া কি, বড় হয়ে কাজ করবে এরকম মতামত দিয়েছে ২.৭২ শতাংশ অর্থাৎ ২ জন। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় সন্তানের লেখাপড়া করার প্রয়োজনীয়তা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন এবং সন্তান ভবিষ্যতে লেখাপড়া শিখবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন সর্বাধিক সংখ্যক কর্মজীবি, যদিও লেখাপড়ার গুনগত মাত্র ও শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে তাদের ধারনা নাই। কেননা এই কর্মজীবি মহিলারা বেশিভাগ অক্ষরজ্ঞান সম্পূর্ণ নিরক্ষর ও অদক্ষ ফলে তেমন উচুঁ মানের ও সম্মানজনক পেশায় তারা নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেনি। এরপরও সন্তান উচ্চশিক্ষিত হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যেটা দিয়ে তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার ক্ষমতাকে বুঝায় এবং সামাজিক সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই সামাজিক সচেতনতা তাদের দারিদ্র্যমুক্ত করতে সাহায্য করবে।

পারিবারিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন

বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা আজ ভয়াবহ রুপধারন করছে। বর্তমানে এই সহিংসতার ঘটনা পরিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে লক্ষনীয়ভাবে বেড়ে চলছে। পারিবারিক পর্যায়ে পরিবারের সদস্যগণের আচরনে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবামুলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের আচরন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তা কর্মচারীর আচরনে এবং নাগারিকের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রের আচরনে নারী যে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন তাতে মাত্রার তারতম্য থাকলেও একে অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

বাংলাদেশে পারিবারিক নির্যাতন দীর্ঘদিনের সমস্যা। সমাজে নারী পুরুষের মধ্যকার অসমতার কারনে এ ধরনের নির্যাতন হয়। বিশ্বের ৫০ ভাগ নারী নানাভাবে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন। এ ধরনের

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হয়। পারিবারিক নির্যাতন বলতে পরিবারের কোন সদস্যের (শিশু ও অসমর্থ ব্যক্তি ছাড়া) দ্বারা কোন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনকে বোঝানো হয়। উদাহরণ হিসেবে প্রহারের মাধ্যমে আহত করা, স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর শারীরিক সৌন্দর্য নষ্ট হওয়া, মদ্যপান বা অন্যের প্ররোচনায় স্ত্রীকে পেটানো বা আঘাত করা এবং নির্যাতন। যৌন নির্যাতন ক্ষেত্রে পর পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে বাধ্য বা অবৈধ সম্পর্ক গড়তে বাধ্য করা এবং পরিবারের সদস্যদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া। মানসিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে ভীতি প্রদর্শণ, হয়রানি, পর্যাপ্ত পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় দিতে অস্বীকার, পরিবারের কোন সদস্যের দ্বারা মানসিক কোন চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা, যুক্তিসঙ্গত কারন ছাড়া স্ত্রীকে ভিত্তিহীন দোষারোপ করা, স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ তোলা, বাবা-ভাই-বোনসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করা, কন্যা সন্তান জন্ম দেয়- এ অভিযোগ আবারো বিয়ের হুমকি দেওয়া, শিশুদের তাদের বাবা মার বিচ্ছেদ সম্পর্কে অবগত না করা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ করে রাখা ও নির্যাতির ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্ষতিসাধন করা পারিবারিক নির্যাতন হিসেবে গন্য হয়।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪০ থেকে ৮০ ভাগ নারী পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল জরিপ চালিয়ে দেখতে পেয়েছে, নারীরা পরিবারের মধ্যে শারীরিক মানসিক অর্থনৈতিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হন। বিশ্ব জনসংখ্যার প্রতিবেদন ২০০০ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ওপর তার পুরুষ সঙ্গীর নির্যাতনের হার ৪৭ ভাগ যা বিশ্বে দ্বিতীয়। বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির ২০০৩-এর প্রতিবেদনে দেখা গেছে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১ দশমিক ৫ শতাংশ হারে পারিবারিক নির্যাতনের পরিমান বাড়ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর পিছিয়ে থাকা এবং পুরুষের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতার কারনে নারী নির্যাতনের হার বেড়ে চলেছে। এই নির্যাতন প্রতিরোধ করতে নারীকে শিক্ষিত হতে হবে এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। গ্রামীন দরিদ্র পরিবারগুলোতে অশিক্ষা, কুসংস্কার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য স্ত্রীদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। এমারগারও গ্রামের উপার্জনকারী মহিলাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় স্ত্রীদের আয় পরিবারে যথেষ্ট উপকারে আসে। তাই স্ত্রী সাথে খারাপ ব্যবহার করা তারা ঠিক মনে করেন না। কারন কর্মজীবি স্ত্রীরা এখন আর স্বামীদের

উপর নির্ভলশীল নয়। তারা এখন নিজেরাই সংসার পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখে। পরিবারে সদস্য হওয়াতে কর্মজীবি মহিলাদের উপর পারিবারিক নির্যাতনের হার হ্রাস পেয়েছে, যা সারনী নং ৩৮ মাধ্যমে উপস্থাপনব করা হলো।

সারনী নং ৩৮ : উপার্জনকারী হওয়ার পূর্বে ও পরে পারিবারিক নির্যাতনের ধরণ

নির্যাতনের ধরণ	উপার্জনকারী হওয়ার পূর্বে		উপার্জনকারী হওয়ার পরে	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
মৌখিক গালাগালি	১৩	১৭.৫৭	৫	৬.৭৬
মৌখিক গালাগালি ও শারীরিক নির্যাতন	২৫	৩৩.৭৮	৬	৮.১২
মৌখিক গালাগালি, শারীরিক নির্যাতন ও তালাকের হুমকি	১৫	২০.২৭	৭	৯.৪৬
মোটামুটি ভাল ব্যবহার	১৪	১৮.৯২	৩৬	৪৮.৬৫
ভাল ব্যবহার	৭	৯.৪৬	২০	২৭.০৩
মোট	৭৪	১০০	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারনীর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় উপার্জনকারী হওয়ার পরে মহিলাদের ক্ষেত্রে পারিবারিক নির্যাতিত বেলায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। উপার্জনকারী হওয়ার পূর্বে ১৭.৫৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৩ জন এবং উপার্জনকারী হওয়ার পরে ৬.৭৬ শতাংশ অর্থাৎ ৫ জন মৌখিক গালাগালির শিকার হতেন। পূর্বে ৩৩.৭৮ শতাংশ অর্থাৎ ২৫ জন এবং কর্মজীবি হওয়ার পরে ৮.১২ শতাংশ অর্থাৎ ৬ জন মৌখিক গালাগালি ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। পূর্বে ২০.২৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ জন এবং ৯.৪৬ শতাংশ অর্থাৎ ৭ জন মৌখিক গালাগালি, শারীরিক নির্যাতন ও তালাকের হুমকির শিকার হতেন। পূর্বে মোটামুটি ভাল ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

পেতেন ১৮.৯২ শতাংশ অর্থাৎ ১৪ জন এবং পরে ৪৮.৬৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩৬ জন। কর্মজীবি হওয়ার পূর্বে পরিবারের সদস্যদের থেকে ভাল ব্যবহার পেতেন ৯.৪৬ শতাংশ অর্থাৎ ৭ জন এবং পরে ২৭.০৩ শতাংশ অর্থাৎ ২০ জন। পরনিরর্ভরশীলতা কাটিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কারনে কর্মজীবি মহিলাদের ক্ষেত্রে পারিবারিক নির্যাতনের হার কমেছে যা তাদের আর্থসামাজিক উন্নতির নির্দেশ করে।

সামাজিক মর্যাদা

বাংলাদেশে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের সমাজ। এখানে পুরুষকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। পুরুষকে ক্ষমতার আধার হিসেবে ধরা হয়। এই সমাজে নারীর অবস্থান পুরুষের নিচে এবং নারীরা সর্বদাই পুরুষের অধীনে থাকে। পরিবারে ও পরিবারের বাইরে আমাদের দেশের মহিলাদের মান মর্যাদার স্তর খুব কম। তারা একা কোথাও যেতে পরে না। ঘরের মধ্যে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে না। সামাজিক এই অমর্যাদার পিছনে প্রধান কারন হিসেবে ধরা হয় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপর তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। অর্থ উপার্জনকারী কাজে নিয়োজিত হওয়ার পরে তারা এই নির্ভরশীলতা হতে মুক্তি পায়। স্বাবলম্বী হওয়ার পর পরিবারে ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা এই মাপকাঠিতে কর্মজীবি মহিলাদের মর্যাদার মান বিচার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পর পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা ভিন্নতর।এ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের সারনীতে তুলে ধরা হলো।

সারনী নং ৩৯ : উপার্জনকারী মহিলাদের মর্যাদা সম্বন্ধে পরিবার এবং সমাজের ধারনা।

মর্যাদা সম্বন্ধে মতামত	পরিবার		সমাজ	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
মর্যাদা বেড়েছে	৪০	৫৪.০৫	৮	১০.৮১
মর্যাদা মোটামুটি বেড়েছে	২২	২৯.৭৩	১৩	১৭.৫৭
কোন পরিবর্তন হয়নি	১২	১৬.২২	৩০	৪০.৫৪
মর্যাদা কমেছে	০	০	২৩	৩১.০৮
মোট	৭৪	১০০	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপিত সারনীর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৫৪.০৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪০ জন উল্লেখ করেছে পরিবারে তাদের মর্যাদা বেড়েছে আর ১০.৮১ শতাংশ অর্থাৎ ৮ জন উল্লেখ করেছে সমাজে তাদের মর্যাদা বেড়েছে। আর পরিবারে ২৯.৭৩ শতাংশ অর্থাৎ২২ জন এবং ১৭.৫৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৩ জনের মর্যাদা মোটামুটি বেড়েছে সমাজে। আবার পরিবারে মর্যাদার পরিবর্তন হয়নি ১৬.২২ শতাংশ অর্থাৎ ১২ জনের আর সমাজে মর্যাদার পরিবর্তন হয়নি ৪০.৫৪ শতাংশ অর্থাৎ ৩০ জনের। কর্মজীবি মহিলাদের পরিবারে মর্যাদা না কমলেও আত্মীয়-স্বজন, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী ও প্রতিবেশীর ধারনায় মর্যাদা কমেছে ৩১.০৮ শতাংশ অর্থাৎ ২৩ জনের। গবেষণা এলাকা পর্যবেক্ষণ কালে কর্মজীবি মহিলাদের মর্যাদা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহনকালে গৃহস্থালী প্রধানের সাথে আলোচনার কালে জানা গিয়েছে মহিলাদের অর্থউপার্জনমূলক কাজে আত্মনিয়োগকে তারা সমর্থন করেনা। অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থালী প্রধানরা মনে করেন মহিলারা পর্দা না করে বাড়ির বাইরে কাজ করতে গেলে তাতে বাড়ির সম্মান নষ্ট হয়, মর্যাদা ও কমে যায়। আবার দরিদ্র পরিবারের গৃহস্থালী প্রধানরা মনে করেন মহিলারা ঘরে বসে না থেকে আয় রোজগার করে পরিবারকে সাহায্য করার মধ্যে দোষের কিছু নাই, বরং এতে পরিবারের উপকার হয়। আবার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীরাও মেয়েদের পর্দা প্রথার বাইরে গিয়ে কাজকরাকে ভাল চোখে দেখে না। অনেক গ্রামবাসী আবার মহিলাদের কাজকে সমর্থণ করেছেন কেননা এর দ্বারা তারা দারিদ্র্য ঘোচাতে পেরেছে এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পেরেছে। কর্মজীবি মহিলাদের ৫৪.০৫ শতাংশের পরিবারে তাদের মর্যাদা বেড়েছে। এতদসত্ত্বেও গবেষণার এলাকার মহিলারা উপার্জনকারীর সদস্য হয়ে আত্মশক্তি অর্জন করেছেন, সে শক্তিতেই তারা মনের দারিদ্র্য ও পরিবারের দারিদ্র্য ঘোচাতে পেরেছেন।

দারিদ্র্যতা দূর হওয়া সম্পর্কিত মতামত

বাংলাদেশের সমগ্র জনসংখ্যা ৭৫ শতাংশ বাস করে গ্রামে। এদের অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুবিধা বঞ্চিত, সামাজিকভাবে বঞ্চিত এবং ব্যাপক শোষণের শিকার। গ্রামীন সমাজ অশিক্ষা ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা বেকারত্ব ও উমনিয়োজন, দরিদ্র্য, অপুষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য, দূর্গতি, বঞ্চনা ইত্যাদি নানাবিক সমস্যায় জর্জরিত। দারিদ্র্যতা বাংলাদেশের একটি বিশেষ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। সাধারনভাবে জীবনধারনের মৌলিক

Dhaka University Institutional Repository

চাহিদা ও নিম্নতম সুযোগ সুবিধাগুলো নিশ্চিত করার অপারগতাকেই দারিদ্র বলা হয়। দারিদ্র্যতা এমন একটি আর্থ সামাজিক অবস্থাকে বুঝায় যেখানে মানুষ তাদের জীবনধারনের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরনে ব্যর্থ। সামাজিক ভাবে পরনির্ভরশীল ও মর্যাদার দিক থেকে নিম্ন মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে দরিদ্র বলা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী দারিদ্র্য হার গ্রামে ও শহরে যথাক্রমে ৪৪.৯ এবং ৪৩.৩ শতাংশ (বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০১)। বিশ্ব ব্যাংক এর (১৯৯০) এর সমীক্ষা অনুযায়ী বর্তমানে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগনের মধ্যে মহিলা জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বড় অংশ দখল করে আছে। তন্মধ্যে শতকরা ৫১ ভাগ গ্রামের এবং শতকরা ৫৬ ভাগ শহরের অধিবাসী। বাংলাদেশ বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ কারনে নারীরাই দারিদ্র্যের বোঝা বেশি বহন করে। পুষ্টি স্বাস্থ্য শিক্ষা, পেশা প্রভৃতি সহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের তুলনায় সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠী। নারীর এই ব্যাপক দরিদ্র্যতার জন্য দায়ী পুরুষের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও পর্দা প্রথার জন্য মহিলাদের ঘরের বাইরে অর্থউপার্জনকারী কাজ করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। উৎপাদনশীল পরিমন্ডলে নারীকে সবসময় অনুৎপাদনশীল এবং কেবল ভোগকারী মনে করা হয়। মেয়েদের কাজগুলোকে জাতীয় শ্রম শক্তির সংজ্ঞায় গনণা করা হয় না বলে মনে করা হয় যে, মেয়েরা নির্ভরশীল জনসংখ্যার অংশ। নারীকে সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না করার কারণে সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশের দরিদ্রতার সুদূর প্রসারী ব্যাপ্তি, দরিদ্র জনগনের সাংগঠনিক শক্তি হীনতার সংগে নিবিড়ভাবে জড়িত। যদি গরিব এবং সহায়হীন জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা যায় তবে তারা প্রকৃতার্থে বিত্তহীন হলেও ঋণ ও অন্যান্য উপকরণ সংক্রান্ত সুবিধাবলী গ্রহন করতে অধিকতর সুযোগ পেতে পারে। যদি তাদেরকে সংগঠনের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ঋণ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় তাহলে নিজেরাই নিজেদের আয়ের উৎস সৃষ্টি করে নিতে পারে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প স্বনির্ভর কর্মসুচি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থার ফলে মহিলারা বিভিন্ন উৎপাদন কর্মাকান্ডে নিয়োজিত হয়ে অর্থ উপার্জনকারী সদস্য হয়ে পরিবারে দারিদ্র্যতা দুর করতে উদ্যোগী হয়েছেন। আবার রাষ্ট্রীয় খাতে সরকারের গৃহীত মহিলা নিয়োগ নীতি, মহিলাদের জন্য বিশেষ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির প্রচলন এবং পোশাক শিল্পের প্রসার অধিক হারে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করে। এমারগাও গ্রামের ৭৪ জন মহিলা বিভিন্ন অর্থউপার্জনকারী কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। শিক্ষিত না হওয়ার কারনে তারা তেমন উঁচু মানের ও সম্মানজনক পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেনি। কিন্তু তারপরও দেখা গিয়েছে দারিদ্র্যতা দূর করতে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে, স্বামীর দায়িত্বহীনতা, অক্ষমতা বা সন্তানের ভরণপোষন জন্য বেছে নিয়েছে বিভিন্ন কল-কারখানায়, হোটেল চাকুরিও অর্থউপার্জনকারী বিভিন্ন কাজ (ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি কাজ, পশুপালন)। বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে তারা গরু-ছাগল মোটা তাজা করা, গাছের চারা তৈরি করে তা বিক্রি, জাল ও মাদুর বোনেন, পাটজাত দ্রব্য ও ব্যাগ তৈরি করেন মুড়ি, পিঠা, ও শাক-সবজি উৎপাদন ইত্যাদি কৃষি নির্ভর ব্যবসায় মেয়েদেরই অধিপত্য। এছাড়া অনেকে ঘরের মধ্যে আচার চানাচুর হজমি ইত্যাদি তৈরি করেন। কেউবা মুদির দোকান, দর্জির দোকান, পান-সিগারেটের দোকান দিয়ে আয়-রোজগার করেছেন। এই সকল ব্যবসায় সাফল্য আসার ফলে গ্রামের গরিব দুস্থ মহিলারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে সমাজে মাথা উঁচু করে দাড়াতে সক্ষম হয়েছে। এইসব দিকে লক্ষ্য রেখে উপার্জনকারী মহিলাদের দারিদ্র্যতা বিমোচন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যা নিম্নের সারনীতে তুলে ধরা হলো।

সারনী নং ৪০: উপার্জনকারী মহিলাদের দারিদ্র্যতা দূর হওয়া সম্পর্কিত মতামত

দরিদ্র্যতা সম্পর্কিত মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
দারিদ্র্যতা দূর হয়েছে	৫৫	৭৪.৩২
দারিদ্র্যতা মোটামুটি কমেছে	১৯	২৫.৬৮
দারিদ্র্যতা দূর হয় নাই	---	---
মোট	৭৪	১০০

Source : Fieldwork in Amargao

উল্লেখিত সারনীর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় উপার্জনকারী মহিলার ৭৪.৩২ শতাংশ অর্থাৎ ৫৫ জন উল্লেখ করেছে যে তারা উপার্জন করার ফলে তাদের দারিদ্র্যতা দূর হয়েছে। আর ২৫.৬৮ শতাংশ অর্থাৎ ১৯ জন উল্লেখ করেছে যে দারিদ্র্যতা পুরোপুরি দূর না হলেও দারিদ্র্যের মাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বের থেকে কমেছে।

আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত

দারিদ্র্যত তাড়িত হয়ে এমারগাও গ্রামের মহিলারা গ্রহন করেছে বিভিন্ন অর্থউপার্জনকারী পেশা। দরিদ্র ঘরের মহিলারাই বেশি সংখ্যা মজুরি কর্মগ্রহন করেছে। উপার্জনকারী হওয়ার পূর্বে তারা দুবেলা পেটভরে খেতে পেতেন না। অর্থ উপার্জন করার পর তাদের ভোগমান বেড়েছে। সংসারের ভরণপোষণের পর উপার্জিত আয় দ্বারা নিজেদের উন্নতির জন্য খরচ করেছেন। অনেক কর্মজীবি মহিলা তাদের উপার্জিত অর্থের বেশ কিছু অংশ জমি,বাড়ি অথবা ব্যবসায়ে ব্যয় করেছেন। আবার ১৪ জন মহিলা উল্লেখ করেছেন তাদের উপর্জিত অর্থের একটি অংশ ব্যাংকে জমা রাখেন ভবিষৎ নিরাপত্তার জন্য। এ সূত্র ধরেই তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। যা নিম্নের ৪১-নং সারনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো ।

সারনীর নং ৪১: উপার্জনকারীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত।

আর্থিক স্বচ্ছলতা	সংখ্যা	শতকরা হার
স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে	৬৩	৮৫.১৪
স্বচ্ছলতা অল্প বৃদ্ধি পেয়েছে	১১	১৪.৮৬
স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়নি	-	-
মোট	৭৪	১০০

উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৮৫.১৪ শতাংশ অর্থাৎ ৬৩ জন তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মতামত দিয়েছে। আর ১৪.৮৬ শতাংশ অর্থাৎ ১১ জন উল্লেখ করেছেন তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা অল্প বেড়েছে। প্রাপ্ত সারনীর তথ্যে দেখা যায় বেশির ভাগ উত্তর দাতার তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন। যা থেকে তাদের আর্থিক সামাজিক উন্নতি ও দারিদ্র্যতা বিমোচন হওয়াই প্রতীয়মান হয়।

এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষে বলা যায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ও দারিদ্র বিমোচনে নারীর ভূমিকা ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান । দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে সকল কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহন অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবোধের কারনে নারীরাই দারিদ্র্যের বোঝা বেশি বহন করে। পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পেশা প্রভৃতি সহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের তুলনায় সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠী। নারীর এই ব্যাপক দারিদ্র্যতার জন্য দায়ী পুরুষের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। পর্দা প্রথা ও সামাজিক মূল্যবোধ জন্য মহিলাদের ঘরের বাইরে অর্থ উপার্জণকারী কাজ করাকে মর্যাদা হানিকর মনে করা হয়। ঘরের মধ্যে থেকে গৃহস্থালী কাজ করার মধ্যেই মহিলাদের মর্যাদা নিহিত। উৎপাদনশীল পরিমন্ডলে নারীকে সবসময় অনুৎপাদনশীল এবং কেবল ভোগকারী মনে করা হয়। অথচ নারী সমানভাবে ভোগকারী এবং উৎপাদনকারী। উৎপাদনমূলক কাজে নারীর অবদান ব্যাপক। উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে, সেটা অদৃশ্য। গৃহস্থালী কাজ প্রায় এককভাবে নারী সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু কোথাও নারীদের গৃহস্থালী কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হয় না। মেয়েদের কাজগুলোকে জাতীয় শ্রমশক্তির সংজ্ঞায় গনণা করা হয় না বলে মনে করা হয় যে মেয়েরা নির্ভরশীল জনসংখ্যার অংশ। মহিলাদের দারিদ্রতার প্রধান কারন হচ্ছে পুরুষের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। মহিলাদের সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না করার কারণে সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্বের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এসেছে পরিবর্তন। আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর ভুমিকা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। অন্য সব দেশের সাথে বাংলাদেশ ও তাতে সমর্থণ দিয়েছে। সেই সাথে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে এই ভূমিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে সক্রিয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার মধ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক চার বার বিশ্ব নারী সম্মেলন আয়োজন বহুল প্রচারিত। নারীর উন্নয়ন শুধু যে দেশের উন্নয়নের জন্য জরুরি। তা নয়, বরং নারীর উন্নয়নকে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে সমার্থক বলে ধরে নেয়া যায়, যখনই এই উন্নয়ন দেশের উন্নয়নের সুচক হিসেবে উন্নীত করে। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এসব স্বীকৃতির ফলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। পর্দা প্রথা ভেঙ্গে মহিলারা কর্মক্ষেত্র প্রবেশ করেছে গ্রহন করেছে বিভিন্ন অর্থউপার্জনকারী পেশা। উপার্জনকারী হিসেবে পরিবারে মহিলাদের ভূমিকা গুরুত্ব পাচ্ছে। গবেষণা এলাকা এমারগাও গ্রামের মহিলারা ঘরের চারদেয়ালের গন্ডী পেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। দারিদ্র্য তাড়িত হয়ে এই গ্রামের মহিলারা গ্রহন করেছে বিভিন্ন মজুরি কর্ম। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে কৃষিকাজ করেছেন। মহিলারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে গৃহভিত্তিক কৃষি কর্ম যেমন শাক সবজি চাষ, গবাদী পশু, হাঁস-মুরগি পালন, গাছের চারা তৈরি ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। উপার্জনকারী মহিলারা আয়

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জনের সঙ্গে সংযুক্ত নানা রকম কর্মকান্ডে নিয়োজিত আছেন। তারা জাল ও মাদুর বোনেন, পাটজাত দ্রব্য ও ব্যাগ তৈরি করেণ, মুড়ি পিঠা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করেন। অনেক উপার্জনকারী ঘরের মধ্যে বিস্কুট, চানাচুর, আচার, হজমি ও বিভিন্ন হস্তশিল্পের কারখানা গড়ে তুলেছেন। এই সকল ব্যবসায় সাফল্য আসার ফলে গ্রামের গরিব দুস্থ মহিলারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে, সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। বিধবা, তালাক প্রাপ্তা ও স্বামী পরিত্যক্তরা সন্তান ও সংসারকে বাচানোর জন্য গ্রহণ করেছে মজুরি কর্ম। উচ্চ শিক্ষিত না হওয়ার তারা উঁচু মানের ও সন্মান জনক পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেনি। গ্রামীন উপার্জনকারীর মহিলাদের বেশিভাগ বিভিন্ন কল-কারখানায় চাকুরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি কাজ ও পশুপালন করে অর্থ উপার্জন করছে। এইসব গ্রামীন কর্মজীবি মহিলা পরিবারগুলো তাদের সার্বিক ভরন-পোষনের জন্য নারীর অর্থউপার্জনের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক উন্নতি ও দরিদ্র্য বিমোচন নির্ভর করে মূলত অর্থ উপার্জণকারী কাজে নারীর অংশগ্রহনের মধ্যে দিয়ে। নারীর অর্থ উপার্জন গ্রামীন দরিদ্র পরিবারগুলোতে অধিক গুরুত্ব বহন করে। গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে নারী তার উপার্জনের মাধ্যমে পুরুষের সাথে প্রায় সমভাবে পারিবারিক প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করছে। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও তালাকপ্রাপ্ত অর্থাৎ মহিলা কর্তৃত্বাধীন পরিবার গুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা একান্তভাবে নির্ভর করে মহিলা প্রধানের অর্থ উপার্জন ও খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতার উপর। গবেষণা এলাকা এমারগাও গ্রামে লক্ষ্য করা গেছে যে, ৬০.৮১ শতাংশ পরিবার প্রধান হচ্ছেন কর্মজীবি মহিলা। উপার্জনকারী মহিলাদের মধ্যে ৬৪.৮৫ শতাংশ মহিলা নিজ আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে অর্থাৎ তারা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জন করেছে। উপার্জনকারী মহিলাদের মধ্যে ৪৪.৫৯ শতাংশ পরিবারের সার্বিক ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন এবং ৫৮.১১ শতাংশ উপার্জনকারী মহিলা পরিবারের খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং বলা যায় গ্রামীন মহিলা উপার্জনকারী পরিবার গুলোর একটি বিরাট অংশ তাদের খাদ্য ও মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য নারীর অর্থ উপার্জন ও উৎপাদনশীল ক্ষমতার উপর আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এতে করে দেশের সামগ্রিক দারিদ্র পরিস্থিতিতে উত্তরণ না ঘটলেও এই সব উপার্জনকারী মহিলারা তাদের মনের দারিদ্র্য ঘোচাতে পেরেছে। পরিবারকে মুক্ত করতে পেরেছে আর্থিক দৈন্যদশা থেকে। যা তাদের আর্থ সামাজিক উন্নতির নির্দেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

৭.১ উপসংহার

আলোচ্য গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নে মাহিলাদের ভূমিকা বিষয়ে। গবেষিত বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে দারিদ্র্য, উন্নয়ন, গ্রামীন উন্নয়ন। বাংলাদেশের দারিদ্র্যতা, নারীর দারিদ্রতা, নারী উন্নয়ন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দারিদ্রপীড়িত দেশ। যার অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। যে কোন দারিদ্র পরিমাপ সূচকের পরিপ্রেক্ষিতেই এদেশ বিশ্বের অন্যতম দারিদ্র জন অধ্যুষিত দেশে যেখানে দরিদ্র মানুষ গ্রাম ও শহওে বসবাস করে। বাংলাদেশ জাতীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই দারিদ্র্যের হার গ্রামে এবং শহরে যথাক্রমে ৪৪.৯ এবং ৪৩.৩ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১)। বাংলাদেশ মোট জনসংখ্যা ১২,৩১,৫১,২৪৫ জন এর মধ্যে গ্রামে ৯,৪৩,৪২,৭৬৯ জন এবং শহরে ২,৮৮,০৮,৪৭৭ জন বসবাস করে। দেশের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ বাস করে গ্রামে। এদের অধিকাংশই অর্থনৈতিক সুবিধাবঞ্চিত, সামাজিকভাবে বঞ্চিত এবং ব্যাপক শোষণের শিকার। গ্রামীণ সমাজ অশিক্ষা, ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা, বেকারত্ব ও উননিয়োজন, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্গতি, বঞ্চনা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এই সব আর্থ-সামাজিক উপাদান দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ এবং দারিদ্র্যতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভুমিকা পালন করে। দারিদ্র্য ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছে বঞ্চনা থেকে অর্থাৎ দারিদ্র্যকে বলা যেতে পারে একটি বঞ্চনার কাহিণী (সেন ১৯৮১)। বঞ্চনা একটি সামাজিক ধারণা যা কাল এবং স্থানভিত্তিক। উন্নয়নশীল দেশসমূহে দারিদ্র্যকে চরম বঞ্চনার সমার্থক হিসেবে গন্য করা হয় যা জীবন ধারনের ন্যূনতম চাহিদার সাথে সংশ্লিষ্ট। অপর পক্ষে উন্নত বিশ্বে দারিদ্র্য ধারণাটি মূলত: আপেক্ষিক বঞ্চনা নির্দেশক যা একটি গ্রহণযোগ্য এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানদন্ডে নির্ধারিত জীবনযাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থতা নির্দেশ করে। দারিদ্র্যকে একটি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠী হচ্ছে তারাই যারা জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদা মেটাতে অপারগ। এই অক্ষমতা তাদের সীমিত সামর্থের প্রতিফলন। সাধারণত: এই সীমিত সামর্থের বহি:প্রকাশ হিসেবে ধরা হয় মৌলিক চাহিদা পূরণ

Dhaka University Institutional Repository

করতে যে সব দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন তা ক্রয় করার মত ক্রয়ক্ষমতার অভাবকে। দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক ও জটিল বিষয়। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতার জন্য এর নানা উৎস ও বহুমুখী প্রকাশভঙ্গিই দায়ী। কেননা দারিদ্র কখনো আয় বঞ্চনা কিংবা ভোগ ঘাটতিকে বোঝায়। আবার কখনো তা অপুষ্টি, অশিক্ষা কিংবা সম্পদহীনতাকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে অর্থ-সম্পদের অভাব না থাকলেও শিক্ষাহীন কিংবা স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিও দরিদ্র। আবার নিরাপত্তাহীনতাও যে কোন স্বচ্ছল, সবল ও সফল মানুষকে মুহূর্তে পরিণত করে দুর্বল দরিদ্র জনে। মানুষের স্বাভাবিক ও স্বচ্ছল জীবন যাপনের জন্যে ন্যূনতম যে বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা দরকার তার অনুপস্থিতিই দারিদ্র্যের সৃষ্টি করে। মানুষের অভাববোধের পরিবর্তনশীল অনুভূতির সাথে দ্রুতই পরিবর্তিত হচ্ছে দারিদ্র্যের সীমারেখা, গভীরতা এবং ক্ষেত্রসমূহ। তাইতো ক্ষমতাহীনতা ও প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় কথা বলতে না পারাও দারিদ্র্য। চিন্তা ও কাজ ছাড়াও পছন্দ করার ক্ষেত্রে বাধা ও এক ধরণের দারিদ্র্য। স্বাধীনতাহীনতাও তাই দারিদ্র্য। সমাজ ও রাষ্ট্রেও সংকুচিত সুযোগ, পাঁচিলঘেরা নীতি ও প্রতিষ্ঠান, সম্পদ ও ক্ষমতার অসম বন্টন এবং বৈরী সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলে দরিদ্র সাম্প্রদায়।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র্য এক ভীতিপ্রদ সমস্যা। জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী ১০৩ কোটি মানুষ এখন চরম দারিদ্র্যের শিকার। বিশ্বের উপরের দিকে ২০% ধনী মানুষ পৃথিবীর ৮৬ শতাংশ সম্পদ কব্জা করে ফেলেছে। আর নিচের দিকের ২০ শতাংশ মানুষের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মাত্র ১.৩ শতাংশ সম্পদ। এ থেকে বিশ্ব পরিসরে যে বৈষম্য ও দারিদ্র্য বিরাজ করছে তা স্পষ্টই বুঝা যায়। বিশ্বের সমস্ত সম্পদের ৮০ শতাংশ ভোগ করে উন্নত দেশের ২০ শতাংশ মানুষ। অন্যদিকে অনুন্নত দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ ভোগ করে অবশিষ্ট ২০ শতাংশ সম্পদ। আর সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশ সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশের চেয়ে ১৩৫ গুণ বেশি সম্পদশালী। অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়ন উভয় নিরিখে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে বিদ্যমান এই বৈষম্য বেড়ে চলছে এবং সেই সাথে বাড়ছে দারিদ্র্যতা। মানব সমাজে বিদ্যমান এই বৈষম্য ও দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সভ্যতার উষালগ্ন থেকে চলছে নানা ধরণের প্রচেষ্টা। জীবনকে উন্নত করার জন্য এবং ভালভাবে বেঁচে থাকার মানুষ সর্বদা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাই সমকালীন অর্থনীতিতে উন্নয়ন কামনা সার্বজনীন। বিশেষ করে অনুন্নত

Dhaka University Institutional Repository

যা উন্নয়নশীল দেশ সমূহে রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের সাথে উন্নয়ন কামনা প্রধান অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যে রুপায়িত করেছে। উন্নয়নশীল দেশে একথা স্বীকৃতি পেয়েছে যে দেশের সাধারন মানুষের জীবনযাত্রার মান যথাযথ ভাবে উপরে না উঠতে পারলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা মুক্তির সমম্বয়ে রাজনৈতিক মুক্তি সাধারণ মানুষের জীবনে পুরো তাৎপর্য এনে দেয় বলে উন্নয়নতত্ত্বের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিদজ্ঞানীরা। যে পদ্বতির মাধ্যমে দীর্ঘকাল মেয়াদে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্বি পায় তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হয়। উন্নয়ন বলতে মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষমতার দীর্ঘমেয়াদী বা অব্যাহত বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বুঝায়। উন্নয়ন বলতে ইতিবাচক পরিবর্তন বা অগ্রগতিকে বুঝায়। উন্নয়ন হলো বর্তমান অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থার পরিবর্তন। ধরে নেয়া হয় যে বর্তমান অবস্থা হল অনুন্নত, পশ্চাৎপদ স্বল্প প্রবৃদ্ধি ও কাল যুগের সময়কাল। তাই এই সময়কাল অতিক্রম করে পরবর্তী ধাপে পৌছানো যা কিনা বাঞ্চনীয় তাই উন্নয়ন।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মতে ব্যক্তিগত আয় দিয়ে ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও সামাজিক দারিদ্র্য পরিমাপ করা যায় না। তিনি এজন্য সক্ষমতার অভাব কতটা তা দিয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দারিদ্র্য পরিমাপের কথা বলেন। অনুন্নত দেশগুলোতে দরিদ্র জনসাধারনের মৌলিক চাহিদা পূরনের বিষয়টি মূলত নির্ভর করে সত্যিকার ভাবে রাষ্ট্রীয় ছত্রছায়ায় তারা কতটা সুযোগ ভোগ করছে তার ওপর। এই সুযোগের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য সুবিধার প্রাপ্যতা, মৌলিক শিক্ষার সুযোগ, মহামারীমুক্ত পরিবেশ, নিরাপদ জীবন যাপনের উপযোগী সুস্থ পরিবেশ ইত্যাদি। সে জন্য অধ্যাপক সেন বাংলাদেশের মত দারিদ্র দেশসমূহের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষন ও জীবনের মান উন্নয়নের স্বার্থে খাদ্য, স্বাস্থ্যও প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তুকি অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন। উন্নয়ন কৌশলে শুধুমাত্র সরকারি পর্যায়ে খাদ্য বিতরণ, স্বাস্থ্য সুবিধা, ঔষধ ও প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণ সরবরাহই নয়, বিকলাঙ্গদের সামাজিক পুনর্বাসন, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, মহামারীমুক্ত পরিবেশ এবং সর্বোপরি আইনের শাসন নিশ্চিত নিরাপদ জীবন যাপনের উপযোগী মুক্ত পরিবেশ করাও অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। আশির দশকে এসে অর্থনীতিবিদগণ তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরনকেই উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে ধরেছেন। এক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর

Dhaka University Institutional Repository

অনুকূলে শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে ব্যক্তিগত আয় বাড়িয়ে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরন করা যাবে না। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুকূলে বস্তুগত লভ্যতা বাড়িয়ে তাদের জীবনের উৎকর্ষ সাধনকেই উন্নয়ন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান, নূন্যতম প্রয়োজনীয় মাত্রার বস্ত্রের সরবরাহ, স্বাস্থ্য সম্মত বাসস্থান, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদনের অন্যতম উৎপাদনশীল উপকরণ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুবিধাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা বাড়ানোর জন্য তাদের অনুকূলে বস্তুগত লভ্যতা বাড়ানোর জন্য দেশের সার্বিক উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন এবং সে জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন। সুতরাং উন্নয়নের জন্য একদিকে যেমন সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন তেমনি অন্যদিকে এই প্রবৃদ্ধিও সুফল যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর্যুক্ত পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্রিয় থাকে তার প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে দারিদ্র্যতা। আমাদের জাতীয় অভিশাপ হচ্ছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দারিদ্র্যতা। বাংলাদেশের গ্রামে এই দারিদ্র্যের হার ৪৪.৯ শতাংশ। আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক গ্রামবাসী মানবেতর জীবন যাপন করছে। দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অনটন, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় গ্রামবাসী জর্জরিত। গ্রামের ছায়া-সুনিবিড় নীড় আজ দারিদ্র্যতার কারণে শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল উৎস গ্রাম । গ্রামের উন্নয়ন ব্যতীত দেশের সার্বজনীন উন্নয়ন সম্ভব নয়। কৃষি নির্ভর এই দেশে উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়, যদি না গ্রামের উন্নয়ন হয়। গ্রামের উন্নতি মানে দেশের উন্নতি। গ্রামের উন্নয়নের উপর বাংলাদেশের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। বাংলাদেশের দরিদ্র্যতার অবস্থান গ্রামে বেশি হওয়ায় গ্রাম উন্নয়ন বা পল্লী উন্নয়ন বাংলাদেশের বহুল আলোচিত প্রত্যয়। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সফলতার চাবিকাঠি নিহিত গ্রাম বাংলার উন্নয়নে। বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ জন মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রাম বাংলার উন্নয়ন এবং বিশাল কৃষক জনতার মুক্তি ব্যতিরেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। গ্রাম উন্নয়ন বলতে গ্রামের সকল শ্রেণীর বা সকল স্ত রের মানুষের সম-উন্নয়ন বোঝায়। শ্রেণী, বর্ন ও স্তরভেদে গ্রামীন সকল

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের জীবন ধারনের মানে সমান উন্নয়ন ঘটালে তাকেই বলা হয় গ্রাম উন্নয়ন। গ্রামীন সকল মানুষের জীবনে সমভাবে আয় ও জীবনধারনের মান উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন বা পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দেশের অর্থনীতিকে পুর্নগঠনের জন্য পল্লী উন্নয়নের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পল্লী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি সকল ও বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধনের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী ও সমবায় মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশে এ যাবৎকালে গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য হ্রাস করার বিভিন্ন কৌশল গ্রহন করা হয। গ্রামের সকল শ্রেণী ও স্তরের মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনই গ্রামীন উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য। এই মূল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে অন্য যে উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য পল্লী উন্নয়নের কর্মসূচি পরিচালিত হয় তা হলো গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের সমউন্নয়ন নিশ্চিত করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করা, স্থানীয় সম্পদেও যথাযথ সদ্ব্যব্যহারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কৃষি পণ্যের সংরক্ষন ও বাজারজাত করণের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রেসহায়তা প্রদান করা, কৃষি ও অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন করে দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠীকে উপার্জনমূলক কাজে উৎসাহিত করা এবং নারীর কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা, স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় জনগণকে উদ্যোগী ও দক্ষ করে তোলা গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিতে সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ গ্রামে বসবাস করে তাই পল্লী উন্নয়নকে বাংলাদেশের উন্নয়ন বলা হয়ে থাকে। সে প্রেক্ষিতে সকল উন্নয়ন প্রকল্পকে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বলা যায়। সার্বিক কৃষি উন্নয়নের বাজেট, পল্লী বিদ্যুৎ, পল্লী খাতে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠান সরাসরি জড়িত। সকল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম রয়েছে। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে যেমন রাস্তা

বাঁধ, স্লুইচ গেইট, মার্কেট তৈরি, স্কুল বিল্ডিং, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি কার্যক্রম সরকারই পরিচালনা করে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ তেমন একটা করে না। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গ্রামে নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ যেমন ভূমিহীন, মহিলা ও যুবকদের আয় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন রকম সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে গ্রুপ ভিত্তিক ঋন বিতরণ, আয় বৃদ্ধিতে কর্ম নির্বাচন ও ট্রেনিং প্রদান। এনজিওরা গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও চালু করেছে। পল্লী উন্নয়নে সরকারি যে সকল প্রতিষ্ঠান সরাসারি জড়িত সে গুলোহলো কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সমূহ, মৎস্য ও পশুপালন দপ্তর সমূহ, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পানি উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উলেখযেগ্য হলো, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, নিজেরা করি প্রগতি, প্রশিকা, আরডিআরএস, স্বনির্ভর ইত্যাদি। সরকারি দপ্তর সমূহ এবং দেশী বিদেশী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্য পদ্ধতিতে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও উন্নয়নের প্রধান উপকরণ হলো ঋন বিতরণ প্রশিক্ষন এবং প্রযুক্তি জ্ঞান সম্প্রসারণ। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিকে বর্তমানে জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টা পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে বহুবিধ সমস্যা ও বাধা রয়েছে যার কারনে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি পুরোপুরি সফল হতে পারছে না। এসকল সমস্যার মধ্যে রয়েছে পল্লী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের অস্থায়িত্ব অযোগ্য ও দুর্নীতি পরায়ন নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক স্থানীয়সরকারগুলোর অসহযোগিতা, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প থেকে উদ্ভূত সুযোগ সুবিধার অসম বন্টন, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ড ও পরিকল্পনায় উচ্চ শ্রেণীর আধিপত্য এবং অসহায়ক এবং গ্রামীন সমাজ। এই সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দারিদ্র বিমোচনের জন্য পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিকে সচল রাখার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে। গ্রামের উন্নতি ও দেশের উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী দারিদ্র্য মোচনের মাঝেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল কিন্তু অন্যতম দারিদ্র্য-পীড়িত দেশ। যার অধিকাংশ লোক দরিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারছে না। এদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ। একটি সমস্যা হিসেবে দারিদ্র্যের সৃষ্টি মানব জাতির

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের সূচনাতে হলেও বর্তমানে দারিদ্র্যতা বাংলাদেশের একটি বিশেষ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। এ সমস্যা নিজে যেমন একটি সমস্যা অন্যদিকে অনেক সমস্যার উৎপত্তির কারনও বটে। যেমন-পুষ্টিহীনতা, শিক্ষার নিম্নহার, বস্তি এলাকার বৃদ্ধি, ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি। এ সমস্যগুলো ব্যক্তি জীবনকে যেমন পঙ্গু করে দেয়। অনুরুপ জাতীয় জীবনের উন্নতিতেও বাধার সৃষ্টি করে। দারিদ্র্যতা বলতে এমন একটি আর্থ সামাজিক অবস্থাকে বুঝায় যেখানে ব্যক্তি তার জীবনধারনের নূন্যতম প্রয়োজন পূরনে ব্যর্থ। সামাজিকভাবে পরনির্ভরশীল ও মর্যাদার দিক থেকে নিম্ন মর্যাদার অধিকারীকে দরিদ্র বলে। দারিদ্র্যতা কখনো আয়-বঞ্চনা কিংবা ভোগ ঘাটতিকে বুঝায়। আবার কখনোও তা অপুষ্টি, অশিক্ষা, কিংবা সম্পদহীনতাকে নির্দেশ করে। আবার ঝুঁকি অনিশ্চয়তা এবং দুঃস্থতাও ব্যক্তিকে দারিদ্র্য করে তুলে। উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণের মতে অর্থ-সম্পদের অভাব না থাকলেও শিক্ষাহীন কিংবা স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি ও দরিদ্র। নিরাপত্তাহীনতা ও যে কোন স্বচ্ছল, সবল ও সফল মানুষকে মুহূর্তে পরিনত করে দুর্বল দরিদ্র জনে। দারিদ্র্য ধারনাটি উৎপত্তি হয়েছে বঞ্চনা থেকে অর্থাৎ দারিদ্র্যকে বলা যেতে পারে একটি বঞ্চনার কাহিনী (সেন ১৯৮১)। বঞ্চনা এমন একটি সামাজিক ধারনা যা কাল এবং স্থানভিত্তিক। উন্নয়নশীল দেশসমূহে দারিদ্র্যকে চরম বঞ্চনার সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয় যা জীবন ধারনের ন্যূনতম চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দারিদ্র্যকে একটি ন্যূনতম জীবনযাত্রারমান অর্জনে ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠী হচ্ছে তারাই যারা জীবন ধারনের মৌলিক চাহিদা মেটাতে অপারগ। এই অক্ষমতা তাদের সীমিত সামর্থের প্রতিফলন। সাধারণত এই সীমিত সামর্থের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ধরা হয় মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে যে সব দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন তা ক্রয় করার মত ক্রয়ক্ষমতার অভাবকে।

বাংলাদেশ বর্হিবিশ্বে তার দারিদ্র্যের ব্যাপকতার জন্য পরিচিত। মাথাপিছু আয়ের দিক দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে নিচের দেশগুলোর মধ্যে এটি একটি। সেই সাথে দারিদ্র্যের হার এবং দরিদ্র ব্যক্তির মোট সংখ্যা দুটোই বেশি। এখনও এ দেশে প্রায় অর্ধেক পরিবারই দরিদ্র। বাংলাদেশের জনগণ দারিদ্র্যতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেনা। একটি বড় অনুপাতের জনগন বছরের পর বছর, এমনকি কয়েক প্রজন্ম ধরে দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত। বাংলাদেশে ১৩ কোটি ৩৫ লাখ মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৬ কোটি ৩৪ লাখ। আর জাতিসংঘের

জনসংখ্যা তহবিল ইউএনএফপিএ-এর হিসাবে এই দারিদ্র্যের সংখ্যা ৬ কোটি ৮৬ লাখ। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য অস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে এক জটিল রূপ ধারন করছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে জনসংখ্যার শতকরা হারে দারিদ্র্যের সংখ্যা কমলেও দারিদ্র্য নিরসনের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হতে অনেক কম হওয়ায় দেশের মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেনি। উপরন্ত সম্পদ বৈষম্য, আয় বৈষম্য ও সুযোগ বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ।

বাংলাদেশ ৭৫ শতাংশ জনসংখ্যা গ্রামে বসবাস করে এবং দারিদ্র্যতার ব্যাপকতা গ্রামে বেশি লক্ষনীয়। প্রচলিত অর্থে যারা গ্রামে বসবাস করে, যারা ক্রমাগত অর্ধাহারী, অপুষ্টি, রোগাক্রান্ত, সাধারনত অশিক্ষিত অথবা পর্যাপ্তভাবে শিক্ষিত নয়, যাদের বস্ত্রাভাব ও বাসস্থানের অভাব প্রকট, যাদের খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয়-ক্ষমতা সীমিত বিধায় নিয়মিত সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালনে অক্ষম তারাই গ্রামীণ দরিদ্র। অন্যদিকে ভৌগলিক ও সামাজিক দিক দিয়ে গ্রামীন দরিদ্র্যদের চিহ্নিত করা যায়। গ্রামে বসবাসকারী বা পশ্চাৎপদ আদিবাসী, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক গ্রামীন কারিগর, মৎস্যজীবি যাদের সম্পদ বলতে কিছুই অথবা যে সামান্য সম্পদআছে তার উৎপাদন ক্ষমতা নগণ্য এবং যাদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই অথবা যে কর্মসংস্থান রয়েছে তার মজুরি অত্যন্ত কম তাদেরকে গ্রামীণ দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবার সম্পদের অসম বন্টন এবং উন্নত প্রযুক্তি বঞ্চিত গ্রামীন জনগোষ্ঠী কে গ্রামীন দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যারে ব্যুরোর (BBS) প্রকাশিত Houserald Expenditure Sarvey 1995/96 অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলোক্যালরি গ্রহন পরিমাপে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪৭.১ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং দৈনিক ১৮০৫ কিলোক্যালরি গ্রহন পরিমাপের ২৪.৬ শতাংশ ছিল চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে। বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত ২০০০ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহন পরিমাপে ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে অনপেক্ষ দারিদ্র্য এর হার ৪৪.৩৩ শতাংশ, আর গ্রামাঞ্চলে ৪২.২৮ শতাংশ, সেই সাথে চরম দারিদ্র্য এর হার জাতীয় পর্যায়ে ১৯.৯৮ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ১৮.৭২ শতাংশ। মাথাপিছু আয়, জীবন যাত্রার মান কিংবা পর্যাপ্ত ক্যালরি যুক্ত খাদ্য গ্রহনের গড়

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাপের দরিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি দেখা গেলেও চুঁইয়ে পড়া তত্ত্ব অনুযায়ী প্রকৃত দরিদ্রদের কোন উন্নতি হচ্ছে না । এর প্রধান কারন হল দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাওয়ার যে সব উপাদান বা প্রক্রিয়া রয়েছে সেগুলো এ দেশে অত্যন্ত সক্রিয়।তাই দারিদ্র্যসীমা আয়ের বিচারে নিরংকুশ দারিদ্র্যসীমার যে ধারণা পাওয়া যায় প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে আবার এমন দুর্দশাগ্রস্থ লোক রয়েছে যাদের অর্থনীতির ভাষায় চরম দারিদ্র বলা যায়। বাংলাদেশের এ শ্রেনীর দারিদ্র্যদের অধিকাংশের বাস গ্রামে। চরম দরিদ্র পরিবারগুলো দারিদ্রসীমার আয়েরও ৪০ শতাংশ নিচে বাস করছে। সংখ্যার হিসেবে এ ধরণের পরিবারগুলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশ (রহমান, ১৯৯৭) আয়গত শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গেছে গ্রামীন দরিদ্রজনগোষ্ঠী জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচি মাঝারি দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হলেও চরম দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নতির ক্ষেত্রে তা খুব সামান্যই প্রভাব ফেলেছে। চরম দারিদ্র্যের এই হিতব্যবস্থা বাংলাদেশের দারিদ্র পরিস্থিতির অব্যাহত ভয়াবহতাকে স্পষ্ট করে তোলে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত দারিদ্র্যতাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার পথে এখন পর্যন্ত দারিদ্র্যই প্রধান অন্ত রায় হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের বেশি ভাগ মানুষের জীবকে দুর্বিষহ করে তুলোছে দারিদ্র্যতা। দারিদ্র মানুষকে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রনায় রাখে, দারিদ্র্য মানুষকে অজ্ঞ রাখে, অক্ষম রাখে, মানুষের জীবনকে করে কুৎসিত, জান্তব ও হেস্য। দারিদ্র মানুষকে বঞ্চিত করে তার মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা থেকে। তাই যথা শীঘ্র সম্ভব দারিদ্র্য মোচন হল বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলের মূল লক্ষ্য। এদেশের মানুষের যুগযুগের স্বপ্ন দারিদ্র্যমুক্তি। স্বপ্ন উন্নত জীবনের। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র্য ঘোচাতে হবে। দরিদ্ররা যাতে মৌলিক চাহিদা ডপূরন করতে পারে, দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে, মূল্যস্ফীতি যাতে সাধারণ দরিদ্র সীমিত আয়ের মানুষের জীবনকে আরও দুর্বিসহ করে তুলতে না পারে, সেজন্য কার্যকরী কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। আমদের দেশের সাড়ে ছয় কোটি মানুষ আজও বেচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে চলছে। এদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা সাহায্য দিচ্ছে বছরের পর বছর। বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি প্রকট হলেও, একটি আশাব্যঞ্জক দিক হচ্ছে গত দু দশক ধরে

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র বিমোচনের জন্য নতুন ধরনের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দলভিত্তিক ও জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋন, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষার সুযোগ, বিভিন্ন ধরনের ভাতা কর্মসুচি গ্রামীন অবকাঠামো নির্মান, আশ্রয়ের ব্যবস্থা, স্বাস্থসেবা, ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই দক্ষিণ ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল হিসেবে গ্রামীন দারিদ্র্যমোচনের লক্ষ্যে গ্রাম উন্নয়ন নীতি গ্রহন করে এবং বেশ কিছুকাল এই কৌশলের আওতায় 'রুরাল রিকনস্ট্রাকশন' নামে গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। পঞ্চাশের দশকে অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন কৌশল হিসেবে আধুনিকায়ন তত্ত্ব, জনপ্রিয়তা পায় এবং নতুন কৌশল হিসেবে 'সবুজ বিপব' কর্মসূচি ব্যাপকভাবে গৃহীত হতে থাকে। এবং এতে গ্রামীন দারিদ্র্যমোচনের গতি মন্থর বিবেচিত হওয়ায়-চুঁয়ে পড়া তত্ত্ব অনুযায়ী দরিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা গ্রহন করা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে দরিদ্র দেশসমূহের প্রধান সমস্যা হচ্ছে মূলধনের অভাব। সুতরাং পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান নিশ্চিত করতে পারলেই এসব দেশের উন্নতি ঘটবে এবং মূলধনের সামান্য অংশও যদি চুঁয়ে-চুঁয়ে গ্রামীন দরিদ্রদের ওপর পড়ে তাহলেই গ্রামীন দারিদ্রমোচন সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ভি-এইড প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংগঠিতভাবে গ্রামীন দারিদ্র্যমোচনে প্রয়াসের সূচনা হয়। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল হিসেবে প্রবৃদ্ধি ভিত্তিক নীতিমালা গ্রহন করে দারিদ্র্য বিমোচনকে অগ্রাধিকার দিয়ে নানা কর্মসূচি গ্রহন করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অপরিহার্য। এক্ষেত্রে সরকারি কৌশল হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যাতে দারিদ্র্য লাঘব ও টেকসই উন্নয়ন হয় সেজন্য তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সাথে মাথাপিছু আয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহন করা। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি এবং বিভিন্ন সামাজিক খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। এ লক্ষ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদন-অধিকার বৃদ্ধির সাথে তাদের ক্ষমতায়ন ও সচেতায়নের উদ্দেশ্য সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে নিরাপত্তা বেষ্টনী, পল্লী অবকাঠামোগত

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋন ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও সংস্থা, যথা- কৃষি মন্ত্রনালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রনালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়, সমাজকল্যান মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদির দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসুচি রয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রাম উন্নয়ন ও গ্রামীন দারিদ্র বিমোচনে এনজিওর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ন। গ্রামীন দারিদ্র্যমোচনে এনজিওর কর্মকৌশল এবং কার্যক্রম অধিকতর ফলদায়ক ও বাস্তবসম্মত বলে বিবেচিত। এনজিওদের কার্যক্রম স্বাধীনতার আগে থেকেই কিছু কিছু শুরু হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন শরনার্থীদের সেবাও চিকিৎসার জন্য এনজিওরা কাজ শুরু করে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বাংলাদেশে ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে দেশি-বিদেশি এনজিওদের কর্মতৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। আশি দশকের শুরু থেকে 'পার্টিসেপটরী ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচ', নিয়ে টার্গেটগ্রুপ হিসেবে, বিশেষ করে, গ্রামীন দরিদ্র ও বিভিন্ন অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার মাধ্যমে অ-কৃষিখাতে কর্মসংস্থান এবং কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি কর্মসূচিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং কালক্রমে এনজিও কার্যক্রম একটি আকর্ষনীয় পেশায় রূপান্তরিত হয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত যুবকের কর্মসংস্থান দিয়েছে। বাংলাদেশে গ্রামীন দারিদ্রমোচনে কর্মরত এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলত ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক, নারী ও প্রান্তিক কৃষকদের কেন্দ্র করে। এছাড়া ধর্মীয়ভাবে নিম্নবর্ণের মানুষ এবং অবহেলিত আদিবাসীদের মধ্যে এনজিও কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। গ্রামীন দারিদ্রমোচনের লক্ষে বিভিন্ন এনজিওর সাধারন কার্যক্রম হচ্ছে সচেতনতা সৃষ্টি, গ্রুপ-সংগঠন, উৎপাদনের নতুন কৌশলের সঙ্গে খাপখাওয়ানো, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান, গ্রুপ সদস্যদের উচ্চতর মজুরির জন্যে দরকষাকষি, অধিকতর সুবিধাজনক বর্গা-ব্যবস্থালাভ, খাস পুকুর/জমি ওপর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋন সুবিধালাভ, এবং গ্রামীন দরিদ্রদের জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা এবং পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা। এনজিওদের ঋন সহায়তায় এবং ব্যবস্থাপনায় যে সকল কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা হলো, ভূমিহীনদের সেচপ্রকল্প, ঘাস পুকুরে, মৎস্যচাষ, উপকূলবর্তী এলাকার মৎস্য আহরণ, তাঁতশিল্প, ভূমিহীন, বর্গা চাষীদের

জন্য কৃষি উপকরন সরবরাহ, দরিদ্র মহিলাদের জন্য হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল পালন, রেশমচাষ প্রকল্প, মৌমাছি পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ধানভানা, চিড়ামুড়ি তৈরি, কুটিরও হস্তশিল্প- যেমন, বাঁশ-বেত-মাটি ও কাঠের কাজ ইত্যাদি। এনজিওসমূহের এই সব কর্মসূচি গ্রামীন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এনজিওর ঋন সহায়তার ৪০০ সেচ প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে, ১৬ লক্ষ পরিত্যক্ত পুকুর উৎপদানশীল হয়ে উঠেছে। কুটির শিল্প ও হস্তশিল্প থেকে বিক্রয়লব্ধ অর্থ উলেখযোগ্য, একমাত্র পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী করে কয়েক বৎসর যাবৎ বার্ষিক ১০ লক্ষ ডলার আয় হচ্ছে। এনজিওদের সকল প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য দরিদ্র মানুষের নিজেদের চেষ্টার মাধ্যমেই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো। অর্থাৎ সমাজে তাদের ক্ষমতায়নে প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ করে নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। (সিডিএফ) এর হিসেব অনুযায়ী দেড়হাজার এনজিও দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ক্ষুদ্র ঋন প্রদান করছে। এসব এনজিওসমূহের সদস্য সংখ্যা এক কোটির ও বেশি (১১.০৫ মিলিয়ন)। এই এনজিওসমূহে কাজ করছে ১ লাখেরও বেশি কর্মচারী। ঘূর্নায়মান তহবিল ২০০০ কোটি টাকার উপরে আর মোট প্রদত্ত ঋনের পরিমান ক্রমসঞ্চিত হিসেবে ৭৭৩৫ কোটি টাকার ও বেশি।

আলোচ্য গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে দারিদ্র বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা বিষয়ে। গবেষিত বিষয়ের সংশ্লিষ্টতার প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে নারীর দারিদ্র্যতা, নারী উন্নয়নও দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর ভূমিকা নিয়ে। বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়িত করেছে অনুন্নত জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কিত করে। বিশ্বব্যাংকের মতে; অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা ও অজ্ঞতা, উচ্চ শিশু মৃত্যু ও ব্যাপক অপুষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা যে জনসমষ্টির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তারাই দারিদ্র। এই হিসেবে বাংলাদেশের এক ব্যাপক জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের কবলে নিমজ্জিত। আর এ জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই হচ্ছেন এ দেশের পিছিয়ে পড়া নারী সমাজ যারা সব সূচকের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বহুগুনে পিছিয়ে আছেন। বিশ্বব্যাংক এর সমীক্ষা অনুযায়ী বর্তমানে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগনের মধ্যে মহিলা জনগোষ্ঠীই সবচেয়ে বড় অংশ দখল করে আছে। তন্মধ্যে শতকরা ৫১ ভাগ গ্রামের এবং শতকরা ৫৬ ভাগ শহরের অধিবাসী। যখন বিশ্বে সম্পদের সংকট দেখা দেয়, নারী সবচেয়ে ভুক্তভোগী হন কারন নারীরা দরিদ্রেদের মধ্যে দরিদ্রতম। নারী সম্পদের সর্বশেষ অংশ ভোগ করেন তাই দারিদ্র আর

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুধার নারীদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। দারিদ্র্যের এই নারীমুখীকরন মূলত নানামাত্রিক জেন্ডার বৈষম্যরই ফলশ্রুতি। দারিদ্র সুযোগ আর ক্ষমতাহীনতা এর প্রধান কারন। বিশ্বের ১৫৫ কোটি মানুষের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ৭০% নারী। পৃথিবীর গ্রাম অঞ্চলে ৫৫ কোটিরও বেশি নারী দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। এছাড়া বিশ্বে প্রায় ১০কোটি গৃহহীন এবং ২কোটি ৭০ লক্ষ উদ্বাস্তুর ৭৫ থেকে ৮০ ভাগই নারী ও শিশু। বাংলাদেশের দারিদ্রতা প্রকট এবং এর তীব্রতা গ্রামীন এলাকয় সর্বোচ্চ। গ্রামে যাদের কাছে দারিদ্র্য সবচাইতে রূঢ়তম রূপ নিয়ে দেখা দেয়, তারা হলো দরিদ্র মহিলা। দারিদ্র্যের কারনে অধিকাংশ গ্রামীন মহিলা শারীরিক নির্যাতন, পরিত্যাক্তা, তালাক ও মৃত্যুর নির্মম শিকার হয়। ফলে বাংলাদেশের দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠী একটি বড় অংশ স্বামী কর্তৃক নিগৃহীতা, পরিত্যক্তা ও তালাকপ্রাপ্ত। দেশের শতকরা ৪৬ ভাগ দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশই নারী। বাংলাদেশের সমাজে দরিদ্র, বেকার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে নারী। বাংলাদেশে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষকে ক্ষমতার আধার হিসাবে দেখা হয় এবং পুরুষকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এমনকি আইনগত দিক থেকে পুরুষের চেয়ে অনেক নিম্নে অবস্থান করছে।

আমাদের সমাজে নরনারীর অবস্থান দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। সামাজিক কিছু রীতি ও মূল্যবোধ জন্মের পর থেকে পৃথকভাবে শিশুদের সামাজিকীকরণ ব্যবস্থা চালু করে। এই রীতি ও মূল্যবোধ ছেলেদের ক্ষেত্রে একরকম এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে অন্যরকম আচরনের শিক্ষা দিয়ে থাকে। এই রীতি ও মূল্যবোধ সমাজ থেকে সৃষ্টি পুরুষ শ্রেষ্ঠত্ব ও নারীর অধীনস্ততা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অতি প্রাচীন স্বীকৃত বাস্তবতা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এর জন্য দায়ী। এখানকার সমাজকাঠামো নারীর আচরন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কঠোর অনুশাসনের প্রতিষ্ঠানিকীকরণ যার বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। নারী সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে পুরুষরা পরিবারে সম্মান রক্ষার দায়িত্ব নিয়োজিত। আমাদের সমাজে প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতার জন্মদেয়। এদেশে নারীরা যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। সমাজে প্রচলিত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, ধর্মীয় ধ্যান ধারনার ফলশ্রুতি পর্দাপ্রথা,

Dhaka University Institutional Repository

পিতৃতন্ত্র, লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজন, প্রচলিত মূল্যবোধ ও ধ্যানধারনা এবং সর্বোপরি প্রথাগত ঐতিহ্যিক মনোভাব পরিবার ও সমাজে নারীর অধীনস্থ অবস্থানের জন্য দায়ী।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমতার কথা উলেখে থাকলেও সামজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, চাকুরি, বিবাহ, বংশ নির্ধারণ। সম্পদের মালিকানা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের কারনে নারীর দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই বৈষম্যের আলোচনা থেকে নারীর দারিদ্র্যতা ও অধনস্ততা উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। পুরুষদের তুলনায় দেশের নারীর শিক্ষাক্ষেত্রে ১২ শতাংশের ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে পরুষ সাক্ষরতার হার ৪৭.৬ শতাংশ এবং নারী সাক্ষরতার হার ৩৫.৬ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী ৩০ বছরে নারী শিক্ষার অগ্রগতি মাত্র ২৭.৬ শতাংশ। বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষাগ্রহনের ক্ষেত্রে এগিয়ে এলেও যুগের সাথে এগোয়নি দেশের নারী শিক্ষা। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের পিছিয়ে থাকার কারন হিসেবে দারিদ্র্যতা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, অল্প বয়সে বিয়ে-সন্তান ধারন, জেন্ডার পক্ষপাতিত্ব, স্কুলের দুরত্ব ইত্যাদি কারনে নারী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে মেয়েরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের ৭০ নারী পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন। বিশ্ব ব্যাংকের এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের একজন পুরুষ গড়ে প্রতিদিন ২.২৯৯ ক্যালরি গ্রহন করে আর একজন নারী গ্রহন করেন গড়ে ১.৮৪৯ ক্যালরি। বাংলাদেশের একজন গৃহবধু পরিবারে সবার শেষে এবং সর্বশেষ তলানীটুকু আহার হিসেবে গ্রহন করে।

বিয়ের ব্যাপারে ছেলেদের মতামতকে গুরুত্বের চোখে দেখা হলেও মেয়েদের মতামতে কোন মূল্য দেওয়া হয় না, এ ব্যাপারটি গ্রামে বেশি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সমাজে বংশ নির্ধারনের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়। যেহেতু সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে একজন মায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য, অথচ মায়ের সেই ভূমিকাকে গুরুত্ব না দিয়ে সন্তানের উপর পিতার অধিকারকেই বড় করে দেখা হয়। বাংলাদেশে বংশনির্ধারনের ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য একচেটিয়াভাবে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি সন্তানের নামও বাবার নামানুসারে হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীরা জন্ম লগ্ন থেকেই অসমতার শিকার। পুত্র সন্তানের

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাশা তার সবচেয়ে বড় প্রমান। কন্যাসন্তানকে অর্থনৈতিক বোঝা বলে মনে করাা হয়। এভাবে পিতৃতান্ত্রিক মতার্দশ নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতার জন্যদেয়। পরিবার ও সমাজে নারীর অধীনস্ত অবস্থানের জন্য আরও যে কারনটি দায়ী তাহলো সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। এই ব্যবস্থায় ছোট থেকেই ছেলে ও মেয়েদের আলাদাভাবে বেড়ে ওঠার মানসিকতা গড়ে তোলা হয়। ছেলেদের যেখানে চঞ্চলতা, উচ্ছলতা, খেলাধুলা প্রভৃতে উৎসাহিত করা হয়, সেখানে মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হয় ধীরতা, স্থিরতা এবং ঘরের কাজে মনোনিবেশের আদর্শে। শিশুকাল থেকেই শুরু হয় মেয়েদের অধস্তনতার প্রক্রিয়া। ধর্মীয় ধ্যানধারণার ফলশ্রুতি পর্দাপ্রথা মেয়েদের বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে রাখে। প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মনে করা হয় যে মেয়েরা নিজেদের রক্ষণাবেক্ষনে অক্ষম। আর তাই তাদের আচরন ও চলাফেরা নিয়ন্ত্রন করার উদ্দেশ্য তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় পর্দা প্রথা। এই পর্দা প্রথার কারনে মেয়েরা ঘরের চার দেয়ালের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের গতিশীলতা হয় ব্যাহত। পর্দা প্রথার দমনমূলক বৈশিষ্ট্য মেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়।

সমাজে বিদ্যমান প্রথাগত লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজনও সমাজে নারী ও পুরুষের পৃথক পৃথক অবস্থানের জন্য দায়ী। শ্রমবিভাজন অনুযায়ী সাধারনত পুরুষেরা পরিবারে অন্নসংস্থানকারীর ভূমিকা পালন করে। ফলে পুরুষরা হয় পরিবারের কর্তা আর পুরুষদের উপর র্নিভরশীল বলে সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও মহিলারা তাদের অধীনে নিম্ন মর্যাদার জীবন যাপন করে। প্রচলিত জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষদের উৎপাদনশীরতা যেখানে প্রায় ৯৮ শতাংশ হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীদের উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ গননা করা হয়। গৃহস্থালীর কাজ প্রায় এককভাবে নারী সম্পন্ন করেন। কিন্তু কোথাও নারীদের গৃহস্থালী কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হয় না। তাই বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীদের এই অদৃশ্য অবদান স্বরুপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায় যা পরিমাপ করা হয় না। (রহমান, ১৯৯৮)। শুধু ঘরের আঙ্গিনায় নারী যে শ্রম দিচ্ছে তা একজন পুরুষ শ্রমিকের গড় শ্রমের তুলনায় অনেক বেশি। আই-এলও-র এক সমীক্ষায় প্রকাশ, নারীর মোট গৃহস্থালী শ্রম যোগ করলে তা অনেক দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেক হবে। বাংলাদেশের বর্তমানে ৪৬% নারী শ্রম শক্তির অন্তর্ভূক্ত। এর মধ্যে মোট ৭৩.৬% নারী কৃষিকাজে যুক্ত এবং মজুরিবিহীন গৃহ

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমের নারীর অংশগ্রহন ৭১%। বাংলাদেশে পারিবারিক কাজে সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োজিত শ্রমশক্তি হচ্ছে মোট শ্রমশক্তির ৪৫.৮%। এর মধ্যে পুরুষ হচ্ছেণ ১৯.৮% এবং নারী ৮২.৫%। একটি গ্রামীন নারী কর্মকান্ড সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গ্রামে নারীরা দৈনিক ৮ থেকে ১২ ঘন্টা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদনশীল কর্মে ব্যয় করে থাকে। এই কর্ম না করলে পরিবারটিকে এই কর্মের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হতো। অপরদিকে গ্রামীন পুরুষরা দৈনিক ৫ থেকে ৮ ঘন্টা উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োজিত থাকে। বিআইডিএস-এর এক গবেষণায় রহমান দেখিয়েছেন যে, নারীরা সপ্তাহে পুরুষের তুলনায় ২১ ঘন্টার বেশি সময় কাজ করে থাকেন। পোশাক শিল্পে ১৩ লাখ লোকের মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে, যার প্রায় ৮০ শতাংশ হচ্ছে নারী। মহিলারা বিভিন্ন কুটির শিল্প যেযমন- ধানভানা, মাদুর শিল্পে, বাঁশি ও বেত শিল্প, তাঁত শিল্প এবং মৃৎশিল্পে-এ নিয়োজিত আছেন। নিজের শ্রমের বিনিময়ে আত্মর্নিভরশীল হওয়ার জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায়ও নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি অংশগ্রহন করছে। যেমন- ফিলিং ষ্টেশনের মিটারম্যান, বিচারপতি, সাংবাদিকতা, সেনাবাহিনীর ইউমেন কোর। ট্রাফিক পুলিশ, নিরাপত্তা প্রহরী, ড্রাইভিং, শিপিং ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি। উৎপাদনমূলক কাজে নারীর অবদান ব্যাপক। তবে, জাতীয় আয়ে নারীর এই অবদানকে বিচেনায় আনা হয় না। উৎপাদনশীল পরিমন্ডলে নারীকে সবসময়ই অনুৎপাদনশীল এবং কেবল ভোগকারী হিসেবে মনে করা বলেই নারী আজও সুবিধাবঞ্চিত একটি গোষ্ঠী। মহিলাদের কাজসমূহকে জাতীয় শ্রমশক্তির সংজ্ঞায় গননা করা হয় না বলে মনে করা হয় যে, মহিলারা র্নিভরশীল জনসংখ্যার অংশ। মহিলাদের দারিদ্র্যতার প্রধান কারন হচ্ছে পুরুষের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। পর্দা প্রথা ও সামাজিক মূল্যবোধের জন্য মহিলাদের ঘরের বাইরে অর্থ উপার্জনকারী কাজ করাকে মর্যাদা হানিকর মনে করা হয়। ঘরের মধ্যে থেকে গৃহস্থালী কাজ করা মধ্যেই মহিলাদের মর্যাদা নিহিত। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান এইসব বৈষম্যের কারনে নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

পুরুষ শ্রেষ্ঠত্ব ও নারী অধীনততা আমাদের সমাজব্যবস্থায় অতি প্রাচীন ও স্বীকৃত বাস্তবতা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা জন্মলগ্ন থেকেই অসমতার শিকার। পুরুষশাষিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার কুপমন্ডুকতা ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীকে করে

Dhaka University Institutional Repository

রাখা হয়েছে অবদমিত। এইসব কারনে বেড়ে চলেছে নারীর দারিদ্র্যতা। বাংলাদেশের নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে যা নারীর দারিদ্র্যতারই পরিচয় দেয়। নারীর মেধা ও শ্রমশক্তিকে শুধুমাত্র সাংসারিক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। সমাজ ও দেশ গঠনের কাজে নারীকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। সংসারের পরিসরে নারীর শ্রমবিনিয়োগের কোন মাপকাঠি এখনও উদ্ভাবন করা যায়নি। চাকুরি ও স্ব-কর্মসংস্থান উভয়ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারী পিছিয়ে আছে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহন ব্যতীত জাতীয় সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের নারী সমাজকে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনেতিক শোষণ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সমতার ভিত্তিতে সম্পৃক্ত করতে না পারলে প্রত্যাশিত অগ্রগতি সম্ভব নয়। নারী উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে যখন নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীণ, স্বর্নিভর, সামাজিক সকল প্রকার শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদালাভে সক্ষম করে তুলতে হবে। নারী উন্নয়ন হলো এমন একটি পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে নারীদের জন্য জীবনের আবশ্যকীয় প্রয়োজনগুলো যেমন- খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পরিবেশ ও ব্যবস্থা থাকে এবং দেশের নীতি নির্ধারনে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নারীদের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে অবদান রাখার সুযোগ থাকে। নারী উন্নয়ন তখনই পুরোপুরি সম্ভব যখন এদেশের নারীরা আর্থিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হবে, নারী-পুরুষ উভয়েই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে, মেয়েদের ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে এবং এ দেশের মানুষের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে।

১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরীর একটি সেলাই কারখানায় কিছু সংখ্যক মহিলা শ্রমিক তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে দুনিয়াব্যাপী নারী জাগরনের যে সূত্রপাত ঘটিয়েছেন তারই ধারাবাহিকতায় এই উপমহাদেশে নারী সমাজের ভেতরও একটা বৈপ্ল-বিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নারী মুক্তি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। এই আন্দোলনে ক্রমান্বয়ে বিশ্বের নারীরা জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছেন। ১৯৪৫

Dhaka University Institutional Repository

সালে জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। এ সনদে বলা হয়, জাতি ধর্ম বর্ণ-ভাষা-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জনের চেষ্টা করা জরুরি ১৯৪৮ সালে গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনায় এ মানবাধিকার সংক্রান্ত ধারনাকে আরো প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ঘোষণায় ৩০ টি অনুচ্ছেদের প্রতিটিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অধিকারে বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে সমতা দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘ পাচার দমন এবং বেশ্যাবৃত্তি থেকে মুনাফা অর্জনের বিরুদ্ধে গৃহীত কনভেনশনে বেশ্যাবৃত্তি প্রনোদিত করার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা নারী ও পুরুষের সমান মজুরি চুক্তি অনুমোদন করে। ১৯৫২ সালে নারীর অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি হয়, তাতে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে নারী- পুরুষের সমঅধিকার দেওয়া হয়।

১৯৬০ সালে জাতিসংঘ সব মানুষের শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি করে। ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদ প্রনীত হয়, যা ১৯৭৬ সালে কার্যকর হয়। ১৯৭৯ সালে গৃহীত নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদে নারীর প্রতি বৈষম্যরোধের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। জাতিসংঘ কর্তৃক এ সনদটি ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়, যা জাতিসংঘের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র মেনে চলতে বাধ্য। বাংলাদেশসহ অনেক রাষ্ট্র এ সনদের ধারাই এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলেনি। ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার সনদেও নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ১৯৬৮ সালে তেহরানে মানবাধিকার সম্মেলনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরনের ঘোষনা দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম নারী সম্মেলনে সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়। কোপেনহেগেনে ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে এবং ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার বিষয়ক সম্মেলনের ঘোষনায় নারী ও মেয়ে শিশুর অধিকার মানবাধিকরের অবিচ্ছেদ্য এবং অখন্ড অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯৪ সালের বিশ্ব জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনে নারী ক্ষমতায়নের ব্যাপারটি স্বীকৃতি পায়। নারীর সমঅধিকার অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মাইলফলক সম্মেলন হচ্ছে ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ নারী সম্মেলন। ২০০০ সালে জেন্ডার, সমতা, উন্নয়ন ও

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি শীর্ষক বেইজিং +৫ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

বিংশ শতাব্দীর ৬০ এর শেষ ও ৭০ এর দশকের প্রারম্ভে একদল উন্নয়ন বিশারদের আবির্ভাব ঘটে যারা গবেষনার ভিত্তিতে দেখেছেন যে তৃতীয় বিশ্বে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছিল তাতে নারীরা অন্তভূক্ত হতে পারে নি এবং যতক্ষন না নারীরা এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করবেন, ততক্ষণ সেই সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে না। এ ধারনাকে Women in Development (WID) নামে সম্বোধন করা হয় যা উন্নয়ন চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধারা সৃষ্টি করে। এর প্রভাবে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ঘোষনা করে এবং ১৯৭৬-৮৫ সময়কে আন্তর্জাতিক নারীদশক ঘোষনা করে । দীর্ঘ তিন শতকের উপলব্ধিকে সামনে রেখে, জাতিসংঘের নানাবিধ পদেক্ষেপের পরেও ফললাভের কেন্দ্রে আশানুরূপ সাফল্য লাভে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীবর্ষ ঘোষানর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল জাতিষংঘ। তাছাড়া ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ সব ধরনের নারী বৈষম্য দূরীকরণ সনদ Convention Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) অনুমোদন করে। জাতিসংঘের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় চারটি বিশ্ব নারী সম্মেলন। নারী দশক, নারী বর্ষ ও বিশ্ব নারী সম্মেলন বিশ্বব্যাপী নারীদের সচেতনতা এবং অধিকার আদায়ে ভূমিকা পালন করে আসছে। নারী সম্পর্কিত সকল আন্তজার্তিক ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশে জাতীয় উন্নয়ন নীতি রয়েছে, জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ রয়েছে তবুও সামাজিক পশ্চাৎপদতা এবং আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগের অভাবে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ নারী নির্যাতন বন্ধ করা যাচ্ছে না । সামাজিকও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্তি ও নারীর অধস্তন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন প্রকৃত রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও বিশ্ব নারী সম্মেলন গৃহীত নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

নারীর অগ্রগতির এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জনে বাংলাদেশে সরকার উদ্যোগ গ্রহন করেছে। বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) নারী ইস্যু এসেছে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের পুর্নবাসনের ক্ষেত্রে। ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক বিভাগ নামে একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের মহিলা মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরবর্তীতে মহিলা ও

Dhaka University Institutional Repository

ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে রুপান্তরিত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) নারী উন্নয়নের বিষয়টি স্থান পায় এবং বিশেষ ও পৃথক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) প্রথমবারের মত মূলধারা এবং লিঙ্গ এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়, এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ধারায় নারীদের নিয়ে আসা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে গৃহীত হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করা। সরকার নারী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেছে এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের যেমন, স্বরাষ্ট্র ও আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়, তথ্য মন্ত্রনালয়, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীন ব্যাংক, গনসাহায্যসংস্থা, আরডিআরএস, কারিতাস, বিএনপিএস, আইডিএস, গনস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং আরো কিছু বেসরকারি সংস্থা নারীদের উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্তরনের বিভিন্ন কসর্মসূচি গ্রহন করে। এনজিও তাদের কর্মসূচির অংশ হিসেবে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং নিজেদের অবস্থানের উন্নয়নের জন্য নারীর নিজস্ব কর্মপ্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

নারী-পুরুষের সমতাকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য কাঠামোগত সংস্কারের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। বিভিন্ন কর্মসূচি অনুসরন করে জেন্ডার বিষয়ে বাংলাদেশে প্রায় তিন শতাধিক এনজিও কাজ করছে। এ সকল এনজিওর ক্ষেত্রে উন্নয়নের মূল টার্গেট হচ্ছে নারী। গ্রামীন দরিদ্র নারীদের সহজশর্তে ঋন প্রদান করে তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করাই এনজিওর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। নারীর দারিদ্র্যতা দুর কারর জন্য এনজিওসমূহ গ্রহণ করেছে বিভিন্ন প্রকার ঋনদান কর্মসূচি। প্রথম দিকে পরিবারে প্রধান পুরুষকেই ক্ষুদ্র ঋন দেয়া হত। তবে আদায়ের হার ছিল দু:খজনক। ৮০ দশকের শুরুতে মহিলাদের পরিবার প্রধান বিবেচনা করে এনজিওদের ক্ষদ্র ঋন বিস্তার ঘটিতে থাকে। ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে এখন তা সারাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। গত তিন দশকে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋনের সঠিক ব্যবহার এবং ঋনের কিস্তি

Dhaka University Institutional Repository

ফেরত দানের ক্ষেত্রে শতকরা ৯৫ ভাগ সাফল্যে মহিলারা অন্যান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এনজিওসমূহের নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে কার্যরত এনজিওসমূহ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহনের জন্য পাঁচটি পথ গ্রহন করেছেন যার মাধ্যমে নারীকে দারিদ্র্যমুক্ত করা যাবে। এগুলো হলো; Welfare Approach, Equity Approach, Ant-poverty Approach, Efficiency Approach এবং Empowerment Approach। এনজিওসমূহ এসব এপ্রোচের আলোকে নারীর জন্য কল্যানকর পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্র ঋনদানের মাধ্যমে আয় সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এনজিওদের সকল প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য দরিদ্র মানুষের নিজেদের চেষ্টার মাধ্যমেই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো। অর্থাৎ সমাজে তাদের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা; বিশেষ করে নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

গ্রামীনদারিদ্র্য বিমোচনের মহিলাদের ভূমিকা নিরূপন করার জন্য আলোচ্য গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে উপজেলার অন্তর্গত এমারগাও গ্রামে। এমারগাঁও গ্রাম কেরানীগঞ্জ উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে তারানগর ইউনিয়ন পরিষদের অন্ত র্গত। গুলিস্থান থেকে বুড়িগঙ্গা ব্রিজের উপর দিয়ে কেরানীগঞ্জে উপজেলা হয়ে সড়কপথে এমারগাও গ্রামে যাওয়া যায়। কেরানীগঞ্জ উপজেলার নামকরা আটির বাজার এমারগাঁও গ্রামের দক্ষিনে অবস্থিত। এমারগাও গ্রামের অধিবাসীরা তাদের বাজার হাট, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিত্যপ্রয়োজনী সব কাজ কর্ম আটি বাজারে এসে সম্পন্ন করে। গ্রাম সংলগ্ন আটি বাজারের প্রধান সড়কের পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গার নদীর একটি শাখা বয়ে গিয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদীর এই শাখা নদীটি বাঁকা হয়ে এমারগাওগ্রামে প্রবেশ করে গ্রামটিকে পূর্ব এমারগাও ও পশ্চিম এমারগাও এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এমারগাও গ্রামে মোট জনসংখ্যা ৯১৩ জন। তার মধ্যে পূর্ব এমারগাও-এ পুরুষ ২৭৭ জন এবং মহিলা ২৬০ জন। পশ্চিম এমারগাও পুরুষ ১৭২ জন এবং মহিলা ২০৪ জন। জনসংখ্যার প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় পূর্ব এমারগাও-এ জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। এমারগাও গ্রামের অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় পূর্বে এমারগাও গ্রামের অধিবাসীরা প্রধানত কৃষিকাজ করতে। বিভিন্ন ধরনের শষ্য আবাদ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। কৃষি চাষযোগ্য জমি ছিল গ্রামবাসীর জীবিকার অন্যতম মাধ্যম। তবে কৃষি পন্যের নিম্নমূল্য, স্বল্প উৎপাদন,

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি জমির স্বল্পতা এবং ক্রমান্বয়ে ভূমিহীনতা গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আর্থিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। এই প্রেক্ষিতে গ্রামবাসীর আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যবসা ও চাকুরি ইত্যাদি পেশার প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষিকাজের পাশাপাশি অকৃষি পেশার বিস্তার ঘটেছে। এমারগাঁও গ্রাম আটি বাজার সংলগ্ন হওয়াতে এবং ঢাকা ও কেরানীগঞ্জ উপজেলার সাথে সরাসরি সড়ক যোগযোগ থাকাতে চাষযোগ্য জমির দাম অনেক বেড়ে যায়। ফলে গ্রামবাসীরার অনেকে জমি বিক্রি করে বাজার অর্থনীতির উপর র্নিভরশীল হয়ে পড়েছে। গ্রামবাসীরা আজ কৃষি বহির্ভূত আয় যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি তথা বেতনের উপর নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও গ্রামবাসীর সর্বোচ্চ সংখ্যক অধিবাসী কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এখানে প্রচুর পরিমানে ইরি, বোরো ও আমন ধানের চাষ হয়। কৃষি ফসলের মধ্যে সবজি এখানকার অন্যতম কৃষিপণ্য। সবজি চাষ করে এখানকার অধিবাসীরা জীবিকা নির্বাহ করে। এমারগাও গ্রামে পেশা সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গিয়েছে সর্বাধিক ২৩.২৪ শতাংশ কৃষিকাজ করে। আর ব্যবসা ও চাকুরির ক্ষেত্রে নিয়োজিত আছে যথাক্রমে ১৯.৭৪ শতাংশ ও ১৩.৬০। এই গ্রামে কৃষিকাজের পাশাপাশি অকৃষি পেশা ব্যবসার প্রসার ঘটেছে।

এমারগাঁও গ্রামে বাসস্থানের ধরনের তথ্যে দেখা যায় এমারগাঁও গ্রামে সর্বাধিক ৭২.৪৩ শতাংশ সেমিপাকা বাড়ি। এই গ্রামের পরিবারের ধরন সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায় একক পরিবার আছে ৯০.২৭ শতাংশ আর যৌথ পরিবার আছে ৯.৭৩ শতাংশ। পরিবারের সদস্যসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যে ২ থেকে ১০ পর্যন্ত সদস্য সংখ্যার মধ্যে ৪ জন সদস্যের পরিবার রয়েছে সর্বাধিক ৪১.০৮ শতাংশ আর ৫ জন সদস্যের পরিবার রয়েছে ২৪.৩৩ শতাংশ। এমারগাও গ্রামে যৌথ পরিবারগুলোতে ৮, ৯ ও ১০ জন করে পারিবারিক সদস্য রয়েছে। যার শতাংশ যথাক্রমে ১.৬২ শতাংশ, ২.৭০ শতাংশ এবং ৫.৪১ শতাংশ। যৌথ পরিবার তার পূর্বেকার গুরুত্ব হারিয়ে বিভিন্ন আর্থসামাজিক কারনে ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং একক পরিবার হচ্ছে পরিবারের সার্বজনীন রূপ। গবেষণা এলাকার পরিবারে ধরন ও পরিবারে সদস্য সংখ্যা তাই প্রমান করে।

এমারগাও গ্রামে বিয়ে ব্যবস্থা সাধারনত অভিভাবক কর্তৃক আয়োজিত হয়। বিয়ের ব্যাপারে পারিবারিক বংশ মর্যাদা, চেহারা, বয়স, আর্থসামাজিক অবস্থা ও শিক্ষাগত মান ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। এই গ্রামে বিয়ের ব্যাপরে বংশ মর্যাদাকে গুরুত্ব দিলেও ধনীও

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত পাত্রের কাছে কন্যা বিয়ে দিতে ধনী ব্যক্তিরা বেশি আগ্রহী। পাত্র পাত্রীর শিক্ষা অর্থসম্পদ ও শারীরিক সৌন্দর্য এই বিশেষ বিশেষ গুন ছাড়া এই গ্রামে সমমান বিয়ে ব্যবস্থা বেশি লক্ষ্য করা যায়। বিবাহের ধরন সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায় ৪৯.৬৬ শতাংশ সমমান বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরপর রয়েছে অনুলোপ বিবাহ ১৪.২৯ শতাংশ এবং প্রেমঘটিত বিবাহ ১০.২০ শতাংশ।

আমাদের জাতীয় জীবনে সকল সমস্যা, সংকট ও দুর্দশার মুল উৎস শিক্ষার অভাব। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জনসাধারনকে মুক্তকরা গেলে জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষি, স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা সমাজ উন্নয়ন ইত্যাদি জাতিগঠমূলক সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হতো। দরিদ্র পরিবারের অভিভাবক আর্থিক দৈন্যতার দরুন তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর চেয়ে উৎপার্জনমূলক কাজে লাগানোর প্রতি বেশি আগ্রহী। ফলে দরিদ্র পরিবারে সন্তানরা শিশু শ্রমে নিয়োজিত হয়ে শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এমারগাঁও গ্রামে ৩২৫ জন পুরুষ সদস্যর শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় সর্বোচ্চ ৪৪.৬২ শতাংশ স্বাক্ষর করতে জানে আর ২৩.৩৮ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এসএসসি ও এইচএসসি পাশ যথাক্রমে ১০.৭৭ শতাংশ ও ৫.২৩ শতাংশ। এমারগাও গ্রামে ২১৮ জন মহিলার শিক্ষালাভের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ৩৭.৬১ শতাংশ মহিলা স্বাক্ষর করতে জানে এবং প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহনকারী মহিলার হার ২৪.৭৭ শতাংশ। মহিলাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার হার যথাক্রমে ১২.৩৯ শতাংশ এবং ৩.৬৭ শতাংশ। মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষর ২১.৫৬ শতাংশ। এই গ্রামের মহিলাদের স্বাক্ষরতার হার বাংলাদেমের নারী শিক্ষার হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ ব্যবধান বিদ্যমান, প্রাপ্ত তথ্য তাই প্রমান করে।

এমারগাও গ্রামের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত বিষয় পর্যবেক্ষন করা হয়েছে। পুষ্টিহীনতাকে দারিদ্র্যের একটি চরম প্রকাশ হিসেবে ধরা হয়। পুষ্টিহীনতা দারিদ্র্যের একটি চরম রূপ। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে ২১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহন পরিমাপে গ্রাম অঞ্চলে ৪৭.১ শতাংশ দারিদ্র সীমার নিচে এবং দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালরি গ্রহন পরিমাপে ২৪.৬ শতাংশ ছিল চরম দারিদ্র্যসীসমার নিচে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিখাতে ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্য বর্তমান। বাংলাদেশের ৭০% নারী পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২০,০০০ হাজার

Dhaka University Institutional Repository

নারী প্রসবকালীন জটিলতায় মারা যায়। প্রতি বছর ৬,০০,০০০ জটিল ডেলিভারী কেসের মধ্যে ৯০% পরিচালিত হয় অপ্রশিক্ষিত ধাত্রীর হাতে। প্রতিবছর প্রায় ৪ মিলিয়ন নারী সন্তান জন্মদেন, এদের মাঝে ৬০% রক্তশূন্যতা এবং অপুষ্টিতে ভোগেন। দেশের ৭০% নারীনিরাপদ মাতৃত্ব ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে পানি দূষণ এক মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। দেশের ৫২টি জেলার টিউবয়েলের পানিতে আর্সেনিকের পরিমান গ্রহনযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি। জীবনযাত্রার মানউন্নয়নের ও দারিদ্র্য বিমোচনে জন স্বাস্থ্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা সুস্বাস্থ্যের জন্য একটি অন্যতম শর্ত। জনস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশ উন্নয়নে স্যানিটেশনের গুরুত্ব সকলের মাঝে তুলে ধরার অঙ্গীকার নিয়ে জাতিসংঘ ২০০৮ সালকে স্যানিটেশন বর্ষ, হিসেবে পালন করার ঘোষণা দিয়েছে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশে সরকার ২০১০ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যট্রিন ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছে। মৌলিক সেবা ও সুবিধা বঞ্চিত হওয়ার কারনে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন। দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের জন্য শারীরিক সক্ষমতার উপর নির্ভরশীল দরিদ্রদের ক্ষেত্রে অসুস্থতার কারনে আয় এবং উৎপাদন হ্রাস পায় কাজেই সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা যথাযথভাবে গড়ে তোলা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের শতকরা ৯৫ ভাগ শিশু এখন ভিটামিন এ কার্যক্রমের আওতায় এসেছে। শতকরা ৭৮ শতাংশ পরিবারের সদস্যরা এখন আয়োডিনযুক্ত লবন খান। শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ এখন কলের পানি পান করেন। ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত ৮৪.৭৩ ভাগ পরিবারকে স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। একশ ভাগ শিশু পোলিও টিকা খেয়ে থাকে। ৬১% মানুষ ডায়রিয়া হলে খাবার সেলাইন পান করেন। স্বাস্থ্য পুষ্টি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও এখন বিপুল সংখ্যক মানুষ মানব উন্নয়নের এসব সূচক বিচারে এখনও অবহেলিত ও বঞ্চিত রয়ে গেছে।

এমারগাঁও গ্রামের অধিবাসীরা তিন বেলা ভাত খান। কিন্তু ধনী পরিবারগুলো যারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন তারা সকালে নাস্তা রুটি খান। দরিদ্র পরিবারগুলো আটার দাম চাউলের দামের চেয়ে একটু কম বলে একবেলা রুটি খান। এলাকাবাসীর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ভাত-ডাল,

Dhaka University Institutional Repository

শাক, মাছ, মাংস ও সবজি অন্তর্ভূক্ত। ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো পুষ্টি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহন করে থাকে। তারা নিয়মিতভাবে মাছ, মাংশ, ডিম দুধ ইত্যাদি খাদ্য গ্রহন করে থাকে। দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান বজায় রাখতে পারে না। তাদের খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংশ, ডিম, দুধ থাকে না, এবং তারা প্রায়ই একবেলা অথবা অর্ধবেলা অধাপেটা খেয়ে থাকেন। আবার গ্রামবাসী মহিলারা পুষ্টি-স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতিক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী। গ্রামবাসী গৃহকর্ত্রী পরিবারে সবার শেষে এবং সর্বশেষ তলানীটুকু আহার হিসেবে গ্রহন করে। ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে মহিলাদের খাদ্য গ্রহন কিছুটা সঠিক থাকলেও দরিদ্র পরিবারের মহিলারা মারাত্মক অপুষ্টির শিকার হয়ে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। এই গ্রামের ডেলিভারি কেসের মধ্যে ৯০% পরিচালিত হয় অপ্রশিক্ষিত ধাত্রীর হাতে। ধনী পরিবারের মহিলারা প্রসবের সময় হাসপাতালে বা ক্লিনিকে যায়। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারে প্রসবের সময় হাসপাতালে যাওয়াকে বাড়তি ঝামেলা মনে করে। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম এবং এনজিওরা নারীদের স্বাস্থ্যের যত্নের উপর বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে। এর ফলে গ্রামবাসী মহিলারা এখন টিটেনাসের টিকা গ্রহন করেন। প্রতিটি পরিবারের শিশুরা এখন ৬টি মারাত্মক রোগের টিকা গ্রহন করে এবং ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ান। গ্রামবাসীরা কেরানীগঞ্জ উপজেলা হাসপাতাল, আটি বাজারস্থ ডাক্তারখানা, ক্লিনিক এবং ঢাকার এসে চিকিৎসা গ্রহন করেন। গ্রামবাসীর একাংশ এখনও বিশ্বাস করে ঝাড়-ফুক দিয়ে অসুখ ভাল হয় তাই তারা রোগ-ব্যাধিতে ফকির দরবেশের দ্বারস্থ হন। চরম দরিদ্র পরিবার ছাড়া এই গ্রামে পরিবার প্রতি একটি করে টিউবয়েল আছে। অধিকাংশ গ্রামবাসী খাওয়া, গোসল, কাপড়কাচা, রান্না ও থাল-বাসন ধোয়ার কাজে টিউবয়েলের পানি ব্যবহার। এই গ্রামে ১৪১টি টিউবয়েলে ৯টি পুকুর এবং অন্যান্য ব্যবস্থা আছে ৩৫টি। এমারগাও গ্রামের মাটি বেলে তাই মাটির পানিধারণ ক্ষমতা কম এবং শুস্ক মৌসুমে পুকুরে অল্প পানি থাকে। তাছাড়া টিউবয়েল প্রসারের কারনে পুকুরের গুরুত্ব কমে গিয়েছে। এই গ্রামে স্যানিটারী ল্যাট্রিন আছে ১৫৮ টি এবং কাঁচা ও অন্যান্য ব্যবস্থা রয়েছে ২৭টি। বৈদ্যুতিক সুবিধা আছে ১৭৩টি পরিবারে এবং ১২টি পরিবারে বৈদ্যুতিক সুবিধা নাই।

Dhaka University Institutional Repository

এমারগাও গ্রামে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহকালে দেখা গিয়েছে বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ইউনিয়ন। ইউনিয়ন হচ্ছে কতিপয় গ্রাম এর সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় সরকারি সংস্থা। স্থানীয় সরকার হচ্ছে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের অন্যতম প্রধান একটি বিষয়। তৃনমূলে বা দেশের স্থানীয় পর্যায়ে মানব উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যের অবসানে প্রয়োজন শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। কেরানীগঞ্জ উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে এমাগাও গ্রাম তারানগর ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে। তারানগর ইউনয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে এমারগাও ও জয়নগর গ্রাম। । একজন চেয়ারম্যান ৯ জন সাধারন সদস্য ও সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্য নিয়ে তারানগর ইউনিয়ন পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত। ২০০৩ সালে সর্বশেষ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান চেয়ারম্যানের বাড়ি চন্ডীপুরা গ্রামে। তারানগর ইউনিয়ন পরিষদের ৩ জন মহিলা সদস্যের বাড়ি যথাক্রমে জয়নগর গ্রামে, কাঁঠালতলী গ্রামে ও নীমতলি গ্রামে। এমারগাঁও গ্রাম হচ্ছে আটি বাজারসংলগ্ন এবং আটি বাজার থেকে ৫০০ গজ দূরে তারানগর ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয় অবস্থিত। এই গ্রামে বিভিন্ন সময় গ্রামবাসীরা জমির সীমানা, জমির আইল, ফসল কাটা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, যৌতুক প্রদান ইত্যাদি নিয়ে ঝগড়া- বিবাদে লিপ্ত হয়। চেয়ারম্যান ও তার অধীনে নির্বাচিত সদস্যরা মিলে এসব গোলযোগ মীমাংসা করেন। গ্রামে জমি জমা সংক্রান্ত গোলযোগ বেশি দেখা যায়। ইউনিয়ন পরিষদ সালিশ ডেকে গ্রামের বিভিন্ন দলের মধ্যে বিদ্যমান সংঘাত মিটায়। বিবাহ অনুষ্ঠান, বিবাহ-বিচ্ছেদ, যৌতুক লেনদেনের ব্যাপারে চেয়ারম্যান যুক্তিসিদ্ধ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের শুরু ও বাস্তবায়ন করে এই গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদ। পূর্ব এমারগাও গ্রামে ১ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে ব্রিজ সংলগ্ন আধা কিলোমিটর রাস্তায় ইট বিছিয়েছেন তারানগর ইউনিয়ন পরিষদ। সরকারি পূর্ত কর্মসূচিসমূহ এই সংগঠনের মাধ্যমেই সম্পূর্ন হয়। গ্রামীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক নিরপত্তাহীনতা, স্বাস্থ্য-সুবিধার অপ্রতুলতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় সারা দেশে প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫ জন মহিলা ৫ জন পুরুষ বয়স্ককে মাসিক ১০০ টাকা করে বয়স্ক ভাতা স্থানীয় ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। গ্রাম অঞ্চলের বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের দারিদ্র ও অসহায়ত্তের কথা

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনা করে তাদের দু:খ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য ১৯৯৮ সালে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের ৫ জন বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের জন্য বিধবা ও পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতার প্রবর্তন করেন। এ কর্মসূচির প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত কমিটি ভাতাপ্রার্থী বাছাই করে। তারানগর ইউনিয়ন এমারগাও ও জয়নগর গ্রাম থেকে ৫ জন পুরুষ ও মহিলাকে বয়স্ক ভাতা এবং ৫ জন মহিলাকে দুস্থ মহিলা ভাতার জন্য নির্বাচিত করেন। এরা এখন নিয়মিত বয়স্ক ভাতা ও বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা পাচ্ছেন।

১৯৯৭ সালের সরকার নতুন স্থানীয় সরকার আইন প্রণয়ন করে এবং এই আইনে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত পদে সরাসরি নালীদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়, যা এ দেশে নারীর আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের সমাজের নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় অধ:স্তন। এ ধরনের একটি সামাজিক অবকাঠামোয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহন নারীদের কাছে অনেক বড় একটি প্রত্যাশার বাস্ত বায়ন। এখন প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নারী প্রার্থীরা সকলের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যাগুলো জেনে নেন। ১৯৯৭ সালে ৪,২৭৪ টি ইউনিয়ন এর জন্য নির্বাচিত নারী সদস্য হলেন ১২,৮২২ জন নারী। ১৯৯৭ সালে এমারগাঁও গ্রাম থেকে আসমা বেগম ইউপি সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৩ সালে এই গ্রাম থেকে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। ৯সং ওয়ার্ডের অন্তর্গত জয়নগর গ্রাম থেকে ২০০৩ সালে মহিলা ইউপি সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৩ সালে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনমূলক দ্বিতীয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৯৭ সালে তুলনায় ২০০৩ সালের নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহন কিছুটা কম হলেও সামগ্রিক, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীরা যুক্ত হয়েছেন এটা নারীর অর্জন এবং এই পথ ধরেই ধরেই প্রতিষ্ঠিত হবে নারীর ক্ষমতায়ন।

অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষন পদ্ধতিতে এমারগাঁও গ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষন কালে দেখা যায় দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এমারগাঁও গ্রামে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি রয়েছে। কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন গ্রাম সমূহে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বেসরকারি সংস্থাসমূহ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে তাদের ব্রাঞ্চ অফিসের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। দরিদ্রদের

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, আয়-বৃদ্ধির জন্য সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও সংস্থাসমূহ হলো, বাংলদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ইত্যাদি। বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে আছে ব্র্যাক, গ্রামীন ব্যাংক, আশা, প্রশিকা ও সাজেদা ফাউন্ডেশন ইত্যাদি। বেসরকারি সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো গরীব ও সহায়হীন জনগোষ্ঠীকে যদি সংগঠিত করা যায় এবং সংগঠনের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ঋন গ্রহনের সুযোগ সুবিধা দেয়া হলে তারা নিজেরাই নিজেদের আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে পারে। দরিদ্র মানুসের জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মাত্রার বস্ত্রের সরবরাহ, স্বাস্থ্য সম্মত বাসস্থান, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদনের অন্যতম উৎপাদনশীল উপাদান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সার্বজনীন প্রথামিক শিক্ষা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এভাবে দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরনের জন্য একদিকে দেশের সার্বিক উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন অন্যদিকে এই উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল যাতে দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরনে সক্রিয় থাকে তার প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন । গ্রামের সকল শ্রেণী বা সকল স্তরের মানুষের জীবধরনের মানে সমান উন্নয়ন তথা গ্রাম উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যে কার্যক্রম পরিচালিত করে তা হলো- গ্রামের সকল শ্রেনী ও মানুষের সমউন্নয়ন নিশ্চিত করা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। স্থানীয় সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কৃষিপন্যের সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান। কৃষি ও অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত কর। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন করে দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠীকে উপার্জনমূলক কাজে উৎসাহি করা এবং নারীর কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা। এইসব কর্মসূচিকে সঠিকভাবে রূপদান করা সম্ভব হলে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার দ্রুত হ্রাস পাবে। এমার গাও গ্রাম কৃষক সমিতি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড থেকে ঋন গ্রহন করে বোরো ধান আবাদ করেছে। এমারগাও গ্রামের বিত্তহীন মহিলা উন্নয়ন সমিতি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

বোর্ড থেকে ঋন নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শাক-সবজির চাষ করছে। এমারগাঁও গ্রামের ভূমিহীন দুঃস্থ মহিলা সমিতি আশা থেকে ঋন গ্রহন করে গরু ছাগল পালন, সবজিচাষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা করছে। গ্রামীন ব্যাংক থেকে এমার গাও গ্রামের ভূমিহীন সমিতি আয় বর্দ্ধক কর্মসূচির জন্য ঋন গ্রহন করেছে। এছাড়া এমাগাও গ্রামে প্রশিকার ও একটি সমিতি রয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কার্যক্রম থাকলেও গ্রামীন দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে বেসরকারি সংস্থাগুলোার তৎপরতা বেশি এমারগাও গ্রামে এই সকল বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঋন গ্রহন করে অনেক মহিলা স্বাবলম্বী হয়েছে তাদের আর্থিক উন্নতি হয়েছে এবং আয়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম মহিলারা ব্যাপকহারে অংশগ্রহন করে দারিদ্র্য বিমোচনে তৎপর হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহন প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের মহিলারা যুগযুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার ও বৈষম্যর বেড়াজালে নারীকে করে রাখা হয়েছে অবদমিত। নারীর মেধা ও শ্রমশক্তিতে শুধুমাত্র সাংসারিক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। দেশও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নারীকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। প্রচলিত জাতীয় পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষদের উৎপাদনশীলতা যেখানে প্রায় ৯৮ শতাংশ হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীদের উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ গননা করা হয়। উৎপাদনশীল পরিমন্ডলে নারীকে সবসময়ই অনুৎপাদনশীল এবং কেবল ভোগকারী হিসেবে মনে করা হয়। অথচ নারী সমানভাবে ভোগকারী এবং উৎপাদনকারী। সভ্যতার আদিকাল থেকে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে মহিলা জনগোষ্ঠী পুরুষের কর্তৃত্বাধীন এবং সমাজে ব্যাপক অবহেলিত অংশ। সভ্যতার অগ্রগতিতে নারী সমাজের উলেখযোগ্য অবদান রয়েছে, কিন্তু তা যথেষ্টভাবে স্বীকৃত নয়। জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সর্বস্তরে তারা গৌন মর্যাদা ভোগ করে। পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পেশা প্রভৃতিসহ প্রায় সবক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের তুলনায় সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠী।

দেশের শতকরা ৪৬ ভাগ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ হচ্ছে নারী। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহন ব্যতীত জাতীয় সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের নারী সমাজকে বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক শোষন থেকে মুক্ত করা লক্ষ্যে এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ বিভিন্ন কর্মসুচি। গ্রামীন দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দূর করার জন্য পঞ্চাশের দশক থেকে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করেছে। এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে উন্নত পদ্ধতির চাষাবাদ, কৃষিপন্যের সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা। কৃষি ও অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন করে দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠীকে উপার্জনমূলক কাজে উৎসাহিত করা এবং নারীর কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা। দারিদ্র্য বিমোচনের উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহকে সামনে রেখে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন টাকার অংকে বা পরিমানে ঋন প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে এনজিওদের বেশিরভাগ কার্যক্রম পরিচালিত হয় দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্রঋনের লেনদেনর মাধ্যমে ৮০ দশকের শুরুতে মহিলাদের পরিবারের প্রধান বিবেচনা করে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋনের বিস্তার ঘটতে থাকে। ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে এখন তা সারাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। এনজিও থেকে ঋন গ্রহনকারী ৯০ ভাগই মহিলা। এনজিওদের ক্ষুদ্রঋন কার্যক্রম দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। পূর্বে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতে কোন মুলধন থাকত না, ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কর্মদ্যোগী হওয়ার সাহস পেত না। ক্ষুদ্রঋন এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মদ্যোগী হতে সাহস যুগিয়েছে এবং স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে। এমারগাও গ্রামের দরিদ্র মহিলারা বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋন নিয়ে গাভী পালছে, সবজি চাষ করছে, হাঁস-মুরগি পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। এমারগাঁও গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারের মহিলারা পুর্বে যারা পর্দার অন্তরালে ছিল ব্যাপক হারে তারা এখন বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছে। ঘরের চার দেওয়ালের গন্ডী পেরিয়ে জীবনও জীবিকার তাগিদে বেছে নিয়েছে অর্থ উপার্জনের পথ। এই গ্রামের মহিলারা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য। দারিদ্র্যতা দূর কারর জন্য এবং আর্থিক স্বাচ্ছলতা আনয়নের জন্য বেরিয়ে এসেছে জীবিকার সন্ধানে। এই গ্রামে ৭৪ জন উপাজর্নকারী মহিলার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যারা বিভিন্ন অর্থ উপার্জনকারী পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করে দারিদ্র ও বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নে অবদান রাখছে।

Dhaka University Institutional Repository

এইসব উপার্জনকারী মহিলাদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই তথ্যসমূহ বিশেষণ ও আলোচনা করে অর্থউপার্জনকারী কাজে মহিলাদের অংশগ্রহন এবং দরিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা সংশ্লিষ্ট বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকার উপার্জনারী মহিলাদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষিত মহিলাদের বয়স কাঠামো সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় কর্মজীবি মহিলাদের সর্বোচ্চ ৩৫.১৪ শতাংশ ২৫-২১ এই বয়স সীমার অন্তর্ভূক্ত। ৩০-৩৪ এই বয়স সীমার কর্মজীবি মহিলা রয়েছে ১৬.২২ শতাংশ। কর্মজীবি মহিলার পরিবারের সদস্য সংখ্যার প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় সর্বাধিক ৩৩.৭৮ শতাংশ হচ্ছে ৪ সদস্যের পরিবার। আর ২৮.৩৮ শতাংশ আছে ৩ সদস্যের পরিবার এবং ৫ সদসস্যের পরিবার রয়েছে ১৮.৯২ শতাংশ। গবেষিত মহিলাদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা পরিকল্পিত পরিবারের সাথে সামঞ্জস্যতা রয়েছে। এনারগাঁও গ্রামের উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবারে পুরুষ সদ্যসংখ্যার প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় সর্বাধিক ৪১.৯০ শতাংশ পরিবারে ২ জন পুরুষণ সদস্য রয়েছে। ৩ জন ও ১ জন করে পুরুষ সদস্য রয়েছে ২২.৯৭ শতাংশ ও ২০.২৭ শতাংশ। বাংলাদেশে পিতৃতান্ত্রিক সামজে পরিবারে পুরুষ সদস্যের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন বলে পুরুষ সদস্য সংখ্যার তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। গ্রামীন বাংলাদেশের সমাজ তথা পরিবারে মহিলাদেরকে অনুৎপাদনশীল ও পরিবারের বোঝা হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু বর্তমানের নারী সমাজ এই প্রচলিত মূল্যবোধকে ভেঙ্গে দিয়ে বেছে নিয়েছে অর্থ উপার্জনের পথ। সাধারণ গ্রামীন মহিলারা জীবন ও জীবিকার তাগিতে বেছে নিয়েছে অর্থউপার্জনকারী কাজ। অর্থ উপার্জনকারী এইসব মহিলারা একদিকে যেমন পরিবারের বাড়তি আয়ের উৎস অন্যদিকে চরম দারিদ্র্য পরিবারে মহিলার পুরুষদের সাথে সমানতালে বিভিন্ন পরিশ্রমী কাজে অংশগ্রহন করে জীবিকা নির্বাহ করছে ও পরিবার প্রতিপালন করছে। ফলে পরিবারে মহিলা সদস্যের গুরুত্ব বাড়ছে। গবেষণাধীন কর্মজীবি পরিবারের মহিলা সদস্য সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় সর্বোচ্চ ৩৭.৮৪ শতাংশ পরিবারে ২ জন করে মহিলা এবং ৩৬.৪৯ শতাংশ পরিবারে ৩ জন করে মহিলা সদস্য আছে।

মানব সমাজে পরিবারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবার একদিকে যেমন উৎপাদনের একক অন্যদিকে তা আবার ভোগের ও একক। কর্মজীবি মহিলাদের পরিবারের ধরন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়

সর্বাধিক ৯৫.৭৫ শতাংশ একক পরিবার আর ৪.০৫ শতাংশ যৌথ পরিবার রয়েছে। অর্থ উপার্জনকারী পরিবার গুলোর প্রাপ্ত তথ্যে একক পরিবারই সংখ্যাগরিষ্ট। উপার্জনকারী মহিলা সদস্যের বৈবাহিক অবস্থান সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ৪০.৫৪ শতাংশ বিবাহিত। বিধবা রয়েছে ২১.৬২ শতাংশ তালাক প্রাপ্ত রয়েছে ২০.27 শতাংশ স্বামী পরিত্যাক্ত রয়েছে ১০.৮১ শতাংশ। আর অবিবাহিত আছে ৬.৭৬ শতাংশ, যারা লেখাপড়া শিখে ঘরে বসে না থেকে কাজ করাকে অধিকতর শ্রেয় মনে করে গ্রহন করেছে অর্থ উপার্জনকারী, পেশা।

গবেষণা এলাকার অর্থউপার্জনকারী মহিলাদের পেশার ধরন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পেশা মানুষের বেচে থাকার একমাত্র উপায়। পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে অর্থকরী শ্রম হতে বিচ্ছিন্ন করে আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে রাখা হয়। ফলে নারী হয়ে পড়ে পুরুষের শ্রমের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা। এই কারনে নারী পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবধান বিদ্যমান যার কারনে নারীকে মনে করা হয় অধ:তন ও পরর্নির্ভরশীল জনসংখ্যা। আজ সারা বিশ্বে উন্নয়ন কর্মকান্ড নারীর অংশগ্রহনকে উৎসাহিত করছে। পৃথিবীর অর্ধেক জনশক্তিকে ঘরে বসিয়ে রাখলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাই নারীরা কৃষিকাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় পুরুষের পাশাপশি অবস্থান করছেন। গবেষনা এলকার মহিলারা সমাজের প্রচলিত প্রথার বেড়াজাল ভেঙে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন বিভিন্ন অর্থউপার্জনকারী কাজে এবং গ্রহন করেছেন বিভিন্ন ধরনের পেশা। পেশা সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় উপার্জনকারী মহিলাদের সর্বোচ্চ ৩৭.৮৪ শতাংশ ক্ষুদ্রব্যবসা করছে। ২১.৬২ শতাংশ চাকুরি করছে, ১৬.১২ শতাংশ হাস-মুরগি ও পশু পালন করছে, কৃষিকাজে নিয়োজিত আছেন ১২.৯৬ শতাংশ, দর্জির কাজ করেন ৮.১১ শতাংশ এবং শাড়ি বিক্রি করে ৪.০৫ শতাংশ মহিলা উপার্জনকারী মহিলাদের বিচিত্র ধরনের পেশার প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রমানিত হয় যে তারা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে যা তাদের দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হয়েছে। উপার্জনকারী মহিলার বিভিন্ন ধরনের পেশা গ্রহন করার ফরে তারা সবাই মাসিক হারে টাকা উপার্জন করছেন। মাসিক আয়ের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় সর্বাধিক ৩৩.৭৮ শতাংশের মাসিক আয় ২৫০২-৩৪০২ টাকার মধ্যে। আবার ২৮.৩৯ শতাংশের মাসিক আয় ৩৪০৩-৪৩০৩ টাকার মধ্যে। কর্মজীবি মহিলারা তাদের মাসিক

Dhaka University Institutional Repository

আয় যারা কেউবা মৌলিক প্রয়োজন মিটাচ্ছেন, কেউবা সন্তানের লেখাপড়ার ব্যয় করছেন, কেউবা সম্পত্তি ক্রয় করছেন। নির্দিষ্ট পরিমান মাসিক আয় উপার্জনকারী মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নতির পরিচয় দেয়।

গবেষণা এলাকার কর্মজীবি মহিলা পরিবারের খাবারের তালিকা অর্থাৎ প্রতিদিন তারা কি কি খাদ্য গ্রহন করে তার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। খাদ্য জীবনধারনের জন্য অপরিহার্য। খাদ্য শরীরের ক্ষয় পুরণ করে শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে। পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহন না করলে দেহ দুর্বল হয়ে যায় ও কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহনকে দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারন হিসেবে ধরা হয় এবং খাদ্য গ্রহন দিয়ে দারিদ্র্যতা চিহ্নিত করা যায়। দৈনন্দিন খাদ্য গ্রহনের প্রাপ্ত তথ্যে ৩৬.৪৯ শতাংশ প্রতিদিন ভাত-রুটি ডাল মাছ শাক-সবজি গ্রহন করে। আর ৩৩.৭৮ শতাংশ ভাত, রুটি, ডাল, শাক-সবিজ, ও মাঝে মাছ গ্রহন করে। আবার ১৪.৮৬ শতাংশ ভাত-রুটি, ডাল-শাক-দুধ ও সাপ্তাহে ২ দিন মাছ গ্রহন করে। যে সব দরিদ্র পরিবার পূর্বে অর্ধাহারে থাকত তারা বর্তমানে তিনবেলা পেটভরে খাদ্যগ্রহন করে। অর্থাৎ তাদের ভোগমান পূর্বের তুলনায় বেড়েছে যা তাদের দারিদ্রতা লাঘব হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

গবেষণা এলাকার বাসস্থান ধরন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় সর্বাধিক ৩৪.১৪ শতাংশ পরিবারে ২টি করে সেমিপাকা ঘর রয়েছে। আর ৩১.৩৮ শতাংশ রয়েছে ১টি সেমিপাকা ও ১টি টিনের ঘর। আর ২৮.৩৮ শতাংশ রয়েছে টিনের ঘর। বাসস্থান মানুষের বেচের থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শক্ত সামর্থ একটি গৃহ তার অধিবাসীদের রোদ, বৃষ্টি ঝড় ও বন্যার মতো নানা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করে। একটি ভালো বাড়ি পরিবারের সদস্যদের সুস্থ শরীরেরর অঙ্গীকার। তাদের উৎপাদনক্ষম রাখার প্রতিশ্রুতি। এমারগাও গ্রামে সর্বাধিক সংখ্যক সেমিপাকা বাসস্থান কর্মজীবি মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক ভূমিকার প্রতিনিধিত্ব করে।

এমারগাও গ্রামের উপার্জনকারী মহিলাদের ঋন গ্রহন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রামীন দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দূর করার জন্য পঞ্চাশের দশক থেকে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করেছে। এইসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল দরিদ্র নারী, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের সহজশর্তে ঋন সহায়তা প্রদান করা। কৃষি ও অকৃষিখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পস্থাপন করে দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠীকে উপার্জনমূলক কাজে উৎসাহিত করা এবং নারীর কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা। দারিদ্র্য বিমোচনের উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহকে সামনে রেখে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ দরিদ্র জনগোষ্টীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন টাকার অংকে বা পরিমানে ঋনদান কর্মসূচি গ্রহন করে। গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে একটি বড় সমস্যা হলো মূলধনের স্বল্পতা বা যথাযথ মূলধন যোগানো সমস্যা। সরকারি পর্যায়ে মূলধন বা ঋন ব্যবস্থা থাকলেও তা অত্যন্ত সীমিত রয়েছে। এ কারনে এনজিওসমূহ নানা ধরনের ঋনদান কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এনজিওদের বেশি ভাগ কার্যক্রম পরিচালিত হয় দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্রঋন প্রদান। ৮০ দশকের শুরুতে মহিলাদের পরিবার প্রধান বিবেচনা করে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋনের বিস্তার ঘটতে থাকে। ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে এখন তা সারা দেশে বিস্তার লাভ করছে। এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋন কার্যক্রম দেশে বিদেশ ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছৈ। ক্ষুদ্র ঋনে সঠিক ব্যবহার এবং ঋনের কিস্তি ফেরত দানের ক্ষেত্রে শতকরা ৯৫ ভাগ সাফল্যে মহিলারা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এমারগাও গ্রামের ঋন গ্রহন সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় সর্বোচ্চ ৬২.৩৬ শতাংশ ঋন গ্রহন করেছে আর ৩৭.৮৪ শতাংশ ঋন গ্রহন করে নাই। ঋন গ্রহন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণের পর ঋনদানকারী সংস্থাসমূহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ঋনদানকী সংস্থা সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩২.৬১ শতাংশ আশা থেকে ঋন গ্রহন করেচে। আর প্রশিকা ও বিআইডিএস থেকে ২১.৭৪ শতাংশ ঋন গ্রহন করেছে। গ্রামীন ব্যাংক ও যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ১০.৮৭ শাতংশ ঋন গ্রহন করেছে। সাজেদা ফাউন্ডেশন থেকে ঋন গ্রহন করেছে ২.১৭ শতাংশ। ঋনদান প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে এনজিওদের সংখ্যা বেশি। পূর্বে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতে কোন মুলধন থাকত না, ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কর্মদ্যোগী হওয়ার সাহস পেত না। ক্ষুদ্র ঋন এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মউদ্যোগী হতে সাহস যুগিয়েছে এবং স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে। এমারগাও গ্রামের দরিদ্র মহিলারা বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋন নিয়ে হাঁস-মুরগি, গাভী পালছে, সবজি চাষ করছে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা করছে। গবেষণা এলাকার উপার্জনকারী মহিলারা এখন আর পরমুখাপেক্ষী নয় বরং ক্ষুদ্র ঋন গ্রহন করে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে এখন সমাজ ও পরিবারের স্বাবলম্বী সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আত্মপরিচয়ে বড় হওয়ার শিক্ষা দেয়। শিক্ষা যে কোন জনগোষ্ঠীকে দক্ষ, সচেতন ও কর্মপোযোগী করে তুলতে সাহায্য করে। বাংলদেশে পুরুষদের তুলনায় দেশের নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে ১২ শতাংশের ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশে নারী স্বাক্ষরতার হার ৪০.৮ শতাংশ এবং পুরুষ স্বাক্ষরতার হার ৫৩.৯ শতাংশ। সরকারি ও বেসরারি পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারেব জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়ার ফলে এবং নারীরা বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার ফলে গ্রামীন এলাকায় নারী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা দূর হয়েছে। নিরক্ষরতা থেকে জনসাধারনকে মুক্ত করা গেলে জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষি, স্বাস্থ্য, সমাজউন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি জাতিগঠনমূলক সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টাই সাফল্যমন্ডিত হতো। গবেষনা এলাকার মহিলাদের শিক্ষা গ্রহন সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় সর্বাধিক ৪০.৫৪ শতাংশ নাম স্বাক্ষর করতে জানে। আর ৩২.৪৩ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছে। গবেষণা এলাকার মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যের সাথে বাংলাদেশের নারী শিক্ষার হার এর সাথে সামঞ্জস্য আছে।

গবেষণা এলাকায় চিকিৎসা গ্রহন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহকালে পর্যবেক্ষন করা গিয়েছে যে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অসচেতনতার কারনে রোগ, ব্যাধি সম্পর্কে উদাসীন থাকে এবং সঠিক চিকিৎসা গ্রহন করে না। ফলে তারা নানা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সুস্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারনে তাদের শ্রমশক্তির অপচয় হয়। স্বাস্থ্যের উপর মজুরি শ্রমের প্রভাব বহুদুর প্রসারী। এমারগাও গ্রামের চিকিৎসা গ্রহনের ধরন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে সর্বোচ্চ ২৮.৩৮ শতাংশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সএ চিকিৎসা গ্রহন করে। আর ২৭.০৩ শতাংশ স্থানীয় এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রহন করে এবং ২৪.৩২ শতাংশ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহন করে। গবেষণার এলাকার সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা জনসাধারনর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কেননা এখানে জুরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয় নামমাত্র মূল্যে তাছাড়া গরিব মানুষের বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনের সামর্থ নেই।

একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের সঙ্গে সঞ্চয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কেনান সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মধ্যে দিয়ে মূলধন গঠনে সহায়তা করে। এ মূল উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বিদ্যমান ব্যাপক দারিদ্র্যের কারনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক স্বচ্ছলতা নাই, ফলে সঞ্চয়ের হার কম। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দারিদ্র মোচনের বিভিন্ন উদ্যোগ ও ঋন সরবরাহের কারনে গ্রামীন মহিলারা বিভিন্ন অর্থ উপার্জনকারী কাজে নিয়োজিত হয়ে অর্থ উপার্জন করছেন। এতে পরিবারের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীন দরিদ্র কর্মজীবি মহিলাদের জীবন ব্যয় নির্বাহ করা কষ্টকর হলেও সন্তানের ভবিষৎ, সামাজিক প্রতিপত্তি, রোগ ব্যাধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য তারা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয় সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ৩৫.১৪ শতাংশের সঞ্চয় আছে আর ৬৪.৮৬ শতাংশের কোন সঞ্চয় নাই। গ্রামীন মহিলার উপার্জনকারী কাজে নিয়োজিত হওয়ার ফলে পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যা তাদের সঞ্চয়ের প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয়। এই সঞ্চয়ের প্রাপ্ত শতকরা হার তাদের আর্থিক উন্নতির ইঙ্গিতে দেয়। আবার অনেকে সংসারের ভরনপোষনের জন্য সঞ্চয় করতে পারে না অর্থাৎ মহিলা প্রধান পরিবার প্রতীয়মান হচ্ছে। সঞ্চয় মানুষকে দুর্দিনে সাহায্য করে। উন্নত জীবনযাপনের নিশ্চয়েতা দেয় সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্যের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত তথ্য হচ্ছে সঞ্চয়ের স্থান সম্পর্কিত ত্য । সঞ্চয়ের স্থান সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য সর্বোচ্চ ১৮.৯২ শতাংশ ব্যাংকে সঞ্চয় জমা রাখেন, যা তাদের সামাজিক সচেতনার পরিচয় দেয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক অবস্থা প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের মহিলাদের দারিদ্র্যতার প্রধান কারন হচ্ছে পুরুষের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না করার কারনে সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্বের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এসেছে পরিবর্তন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর ভূমিকা আন্ত র্জাতিক ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। নারীর উন্নয়নকে সমাজ ও দেশের উন্নয়নের সমার্থক বলে ধরে নেয়া যায়। যখন এই উন্নয়ন দেশের উন্নয়নের সূচকে উন্নীত করে। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়ার ফলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন। প্রচলিত সামাজিক প্রথা ভেঙ্গে মহিলারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে, গ্রহন করেছে বিভিন্ন অর্থ উপার্জনকারী পেশা। গবেষণা এলাকার মহিলার ঘরের চার দেওয়ালের গন্ডী পেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। দরিদ্র তাড়িত হয়ে মহিলারা গ্রহন করেছে বিভিন্ন মজুরি কর্ম। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে ক্ষুদ্র ঋন গ্রহন করে ব্যবসা

Dhaka University Institutional Repository

করছেন গৃহভিত্তিক কৃষিকর্ম যেমন- হাঁস-মুরগি, পশু পালন করছে, শাক সবজির চাষ, গাছের চারা তৈরি ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত হয়েছে। এই সকল অর্থউপার্জনকারী কাজে সাফল্য আসার ফলে গ্রামীন মহিলারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, সমাজে মাথা উঁচু করে দাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রামীন মহিলা উপার্জন কারী পরিবার গুলোর একটি বিরাট অংশ খাদ্য ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মিটানোর জন্য নারীর অর্থ উপার্জন ও উৎপাদনশীল ক্ষমতার উপর আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। গ্রামীন দরিদ্র জনগোণষ্ঠীর মাঝে নারী তার উপার্জনের ম্যাধমে পুরুষের সাথে প্রায় সমভাবে পরিবারিক প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করছে। এর ফলে গ্রামীন উপার্জনকারী মহিলাদের আর্থ-সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে তা গবেষণার প্রাপ্ততথ্যে প্রতীয়মান হয়েছে।

উপার্জনকারী মহিলা পরিবারে পরিবার প্রধানের প্রাপ্ত তথ্যে ৬০.৮১ শতাংশ উপার্জনকারী নিজে পরিবার প্রধান আর ৩২.৪৩ শতাংশ স্বামী পরিবার প্রধান। বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজে পরিবার প্রধান অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, পরিবারের অত্যাবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ পরিবার প্রধানকেই গ্রহন করতে হয়। উপাজর্নকারী সদস্য হিসেবে মহিলারা পরিবার প্রধান বিবেচিত হওয়ার তাদের সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন হয়েছে এবং এরা পরিবার ও সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনে অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশের নারীরা তাদের কর্মসমূহের একটা বৃহৎঅংশ গৃহকর্মে ব্যয় করেন। গৃহস্থালী কাজ প্রায় এককভাবে নারী সম্পূর্ণ কারণ, কিন্তু কোথাও নারীদের গৃহস্থালী কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হয় না। গৃহস্থালী কাজে আবদ্ধ রেখে নারীর মেধা ও শ্রমকে করা হয়েছে অবদমিত। কর্মজীবি মহিলাদের কর্মজীবি হওয়ার পূর্বে ও পরে গৃহস্থালী কাজের ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় কর্মজীবি হওয়ার পূর্বে নিজে একা ঘরের কাজ করতেন ৮৬.৪৯ শতাংশ আর কর্মজীবি হওয়ার পরে ৫৬.৭৬ শতাংশ নিজে একা করেন বলেন প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। আবার কর্মজীবি হওয়ার পূর্বে গৃহস্থালী কাজ অন্যান্যরা করতেন ৪.০৫ শতাংশ আর কর্মজীবি হওয়ার পরে গৃহস্থালী কাজ পরিবারের অন্যান্যরা করেন ৯.৪৬ শতাংশ। পরিবাবারের উপার্জনকারী সদস্য হওয়ায় সনাতন গৃহস্থালী কাজের ক্ষেত্রে নারীরা ভূমিকার পরিবর্তন এসেছে যা তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা অর্জন করার প্রধান শর্তহচ্ছে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করা। বর্তমানে মহিলারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও দেখা যায় তার আয়ের উপর তার নিয়ন্ত্রন নাই। এই আর্থ-সামাজিক ক্ষমতাহীনতা বাংলাদেশের মহিলাদের ব্যাপক দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার জন্য বহুলাংশে দায়ী। এমারগাও গ্রামের উপার্জনকারী মহিলাদের ৬৪.৮৬ শতাংশ নিজ আয়ের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। আর ১৭.৫৭ শতাংশ মহিলাদের স্বামী উপার্জিত অর্থ নিয়ন্ত্রন করে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় উপার্জনকারী মহিলারা নিজ উপার্জিত অর্থের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে অর্থাৎ নিজের উপার্জিত অর্থ নিজেই খরচ করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন। মজুরিকর্ম মহিলাদের ক্ষমতায়নে সফল হয়েছে।

বাংলাদেশে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের সমাজ নারীকে অর্থকরী শ্রম হতে বিচ্ছিন্ন করে তার আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ারে পথে বাধা সৃষ্টি করে। পরনির্ভরশীতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তারা ঘরের বার হলেন এবং পুরুষের মত অর্থকর্ম গ্রহন করলেন। অর্থকর্ম গ্রহন করা পরও কি তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল, সেটি নির্ধারন করার জন্য মহিলাদের উপার্জিত অর্থ পরিবারে কোন খাতে ব্যয়িত হয় সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে ৪৪.৫৯ শতাংশ মহিলা পরিবারের সার্বিক ভরন-পোষনে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করেন। আর পরিবারের সদস্যদের কাপড় অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে খরচ করেন ১৭.৫৭ শতাংশ এবং সন্তানের শিক্ষার জন্য খরচ করেন ১৬.২২ শতাংশ। উপার্জনকারী মহিলাদের সর্বোচ্চ সংখ্যা পরিবারের সার্বিক ভরনপোষনের দায়িত্ব পালন করেন। এক্ষেত্রে তারা সংসারের অন্নসংস্থানকারীর ভূমিকা প্যালন করে পরিবারে প্রধান উপার্জনকারী সদস্য বিবেচিত হয়েছে। এসব পরিবারকে মহিলা প্রধান পরিবার বলা যায় যেখানে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে খাদ্যের প্রয়োজনকে সবার আগে পূরন করার চেষ্টা করা হয়। অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহন দারিদ্র্যতার একটা প্রধান লক্ষণ। পরিবারের খাদ্য ক্রয় ও খাদ্য গ্রহন সাধারণত পরিবারের সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কিত। গবেষণা এলাকার পরিবারের খাদ্য ক্রয় সম্পর্কিত তথ্য বিশেষণ করে দেখা যায় উপার্জনকারী হওয়ার পর তাদের ভোগমান পূর্বের তুলনায় বেড়েছে এবং খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্তে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। পরিবারের খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত কে নেয় এ

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় সর্বোচ্চ ৫৮.১১ শতাংশ উপার্জনকারী নিজে আর ২২.৯৭ শতাংশ স্বামী খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। আবার যৌথভাবে (স্বামী-স্ত্রী) সিদ্ধান্ত নেয় ১৩.৫১ শতাংশ। উল্লেখিত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায় কর্মজীবি মহিলারা পরিবারের প্রধান বিষয়ের সিদ্ধাত গ্রহনকারী। এ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পরিবারে তাদের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিবারের দারিদ্র্য দূর করতে তারা সক্ষম হয়েছে। পরিবারে বিবাহের খরচের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহনকারীর প্রাপ্ত তথ্যে ৬০.৮১ শতাংশ উপার্জনকারী নিজে সিদ্ধান্ত নেয় আর ২৯.৭৩ শতাংশ স্বামী সিদ্ধান্ত নেয়। বিবাহে নানা ধরনের সামাজিক আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় এবং আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে পরিবারকে একটা বড় অংকের টাকা খরচ করতে হয়। প্রাপ্ত তথ্যে বিবাহের খরচের ক্ষেত্রে উপার্জনকারী মহিলার ভূমিকাই প্রাধান্য পেয়েছে। বিবাহের খরচের সিদ্ধাত গ্রহনের সাথে ক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি জড়িত।

গবেষণা এলাকার যৌতুক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশে যৌতুক দাবি ও যৌতুক লেনদেন দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসলেও সাম্প্রতিককালে যৌতুক একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখাদিয়েছে এবং ২৪/২৫ বছরে যৌতুক সমস্যা প্রকট আকার ধারন করেছে। যৌতুকের দাবি মেটাতে অনেক পরিবার সর্বশান্ত হয়ে পথে বসেছে, অনেক মহিলাকে প্রান দিতে হয়েছে, অনেক পরিবার ভেঙ্গে গিয়েছে। গবেষনা এলাকার ধনী পরিবার গুলো যৌতুক লেনদেন এর জন্য প্রস্তুত থাকলেও দরিদ্র পরিবাগুলো যৌতুকের করালগ্রাসে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। বর্তমানে শিক্ষার প্রসার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি প্রচার মাধ্যমের প্রসারের ফলে যৌতুক প্রথাকে তারা অসামাজিক প্রথা বলে স্বীকার করেছেন। যৌতুক দেয়া সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে ৮৩.৭৮ শতাংশ যৌতুক লেনদেন উচিত নয় বলেছেন। আর ৯.৪৬ শতাংশ যৌতুক প্রথা সম্পর্কে কোন মতামত প্রদান করেন নাই। যৌতুক দেয়া সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় যৌতুক দেয়া সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব উপার্জনকারী মহিলাদের সামাজিক সচেতনতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নারী সমাজের এই সচেতনতাই তাদের পরনির্ভরশীলতা ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে সহায়তা করবে।

নির্বাচন হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের একটি অন্যতম মাধ্যম। বাংলাদেশে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য স্থানীয় ও জাতীয়

পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান বিশ্বে নির্বাচনই হল সব রাজনৈতিক চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নাগরিকদের মতামত প্রাকশিত হয়। নির্বাচনে অংশ্রগহন ও ভোটদান ব্যক্তির রাজনৈতিক সচেতনতার বহি:প্রকাশ। গবেষনা এলাকার উপার্জনকারী মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহন সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায় সর্বাধিক ৮৯.১৯ শতাংশ নির্বাচনে ভোট দিয়ে অংশ গ্রহন করে আর ১০.৮১ শতাংশ কর্মী হিসেবে অংশগ্রহন করে। প্রার্থী বা ভোট দেন নেই এমন কোন ব্যক্তি নাই। মহিলাদের ভোটার এবং কর্মী হিসেবে নির্বাচন অংশগ্রহনের সংখ্যাগত পরিমাপ রাজনৈতিক সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের আশাব্যঞ্জক দিক। ১৯৯৭ সালে নতুন স্থানীয় সরকার আইন এবং এই আইনে ইউনিয়ন পরিষদে এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত পদে সরাসরি নারীদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়, যা এ দেশে নারীর আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। ১৯৯৭ সাল থেকে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়ে আসছে। এমারগাও ও জয়নগর গ্রাম নিয়ে তারানগর ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নং ওয়ার্ড। ২০০৩ সালের নিবার্চনে জয়নগর গ্রাম থেকে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন।

গবেষনা এলাকার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহকালে গবেষক পর্যবেক্ষন করেন যে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অসচেতনতার কারনে রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে উদাসীন থাকে। আবার আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় চিকিৎসা গ্রহন করতে পারে না। বংলাদেশের মহিলারা যুগ যুগ ধরে ঘরের ভেতর থেকে ভোগ, শিক্ষা ও চিকিৎসা গ্রহনের বেলায় বৈষম্যের শিকার হতেন। উপার্জনকারী হওয়ার পর চিকিৎসা ক্ষেত্রে বৈষম্য কিছুটা দূরীভূত হয়েছে। কেননা সে এখন নিজেই উপার্জনকারী সদস্য এবং ঘরের বাইরে এসে চিকিৎসা গ্রহন করতে পরে। তাছাড়া কর্মজীবি হওয়ার পর তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অসুস্থ শরীর নিয়ে দীর্ঘ শ্রম ঘন্টা কাজ করা কষ্টকর হয়। তাই তারা চিকিৎসা গ্রহনের ব্যাপারে প্রায় এককভাবে সিদ্বান্ত নেয়। চিকিৎসা গ্রহন সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য সর্বাধিক ৭০.২৭ শতাংশ নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। আর ১৬.২২ শতাংশ স্বামী সিদ্ধান্ত গ্রহন করে, আর যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহন করে ১০.৮১ শতাংশ এবং অন্যান্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহন করে ২.৭০ শতাংশ। চিকিৎসা গ্রহন সংক্রান্ত সিদ্বান্তের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে বলা যায় উপার্জনকারী মহিলারা তাদের চিকিৎসা দারিদ্র্যতা ঘোচাতে সক্ষম

হয়েছে। উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনের সিদ্ধান্তের তথ্যে দেখা যায় ৩২.৪৩ শতাংশ নিজেই পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহনে সিদ্ধান্ত নেয় আর স্বামী সিদ্ধান্ত নেয় ৮.৪১ শতাংশ। আবার ৫৯.৪৬ শতাংশ (বিধবা স্বামীর পরিত্যক্ত অবিবাহিত) এই তথ্যে অন্ত র্ভূক্ত করা হয়নি। সন্তান জন্মদান থেকে শুরু করে সন্তান লালন-পালন সমস্ত দায়িত্ব মহিলাদের বহন করতে হয়, তাই সংসার ছোট হলে মহিলাদের কাজের চাপ কমে। তাছাড়া ছোট পরিবরে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকে দারিদ্র্যতা কমে আসে, সরকারের এই নীতিমালার সাথে একাত্ম হয়ে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা থেকে তাদের সামাজিক সচেতনতা প্রতীয়মান হয়। জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে দেশের আর্থ সামাজিক কাঠামো ক্রমান্বয়ে দূর্বল হয়ে পড়ছে এবং উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে জনগন দিন দিন দারিদ্র্যতার শিকার হচ্ছে। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তথা পরিবর পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনের জন্য ব্যাপক প্রচার এবং কর্মসূচি গ্রহন দেশের জনগনের উপর সার্বিকভাবে প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৮ সরকার জনসংখ্যা বিস্ফোরনকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং ২০১০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা বার্ষিক ১.৩১ ভাগে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে।

গবেষেণা এলাকার উপার্জনকারী মহিলা যারা দারিদ্র্যের কারণে গ্রহন করেছে মজুরি কর্ম, নিজেকে নিয়োজিত করেছেন বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থান মূলক কর্মকান্ডে। তারা তাদের সন্তানের ভবিষৎ, সন্তানের শিক্ষা সম্পর্কে কি ভাবছে সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। শিশুরা হচ্ছে দেশের ভবিষৎনাগরিক। শিশুর সার্বিক উন্নয়নের উপর নির্ভর করে একটি দেশের ভবিষ্যতের আর্থ সামাজিকও রাজনৈতিক উন্নয়ন। বাংলাদেশের শিশুগোষ্ঠী একটি বিরাট অংশ ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম, সন্ত্রাস, পাচার এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। দারিদ্র্যতার জন্য বাংলাদেশে গৃহভৃত্যের কাজে, পোশাক শিল্পে ও অন্যান্য ঝুকিপূর্ণ কাজে শিশু শ্রম নিয়োজিত হচ্ছে। গ্রামের দরিদ্র পরিবারে একজন ছেলে বা মেয়েকে আর্থিক দৈন্যতার দরুন তাদের অভিভাবকরা স্কুলে পাঠানো চেয়ে উপার্জনকারী কাজে লাগানোর প্রতি বেশি আগ্রহী। ফলে এসব ছেলেমেয়েরা শিশুশ্রমে নিয়োজিত হয়ে শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এমারগাও গ্রামের দরিদ্র উপার্জনকারী মহিলারা তাদের সন্তানের ভবিষৎ সম্পর্কে ৪৭.৩০ শতাংশ সন্তান লেখাপড়া শিখবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। আর সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত বানানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ১৮.৯২ শতাংশ, আর সন্তান অল্প পড়ে ব্যবসা করবে বলেছেন ৭.৫৭ শতাংশ। আর সন্তান লেখাপড়া না শিখে আয় করবে বলে মতামত দিয়েছেন ২.৭০ শতাংশ। প্রাপ্ত তথ্যে সর্বাধিক সংখ্যক সন্তানের লেখাপড়া শিখার প্রয়োজনীয়তার উপর মতামত দিয়েছে এবং উলেল্লখযোগ্য সংখ্যক সন্তান উচ্চশিক্ষিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। গ্রামের নিরক্ষর,স্বাক্ষর ও প্রাথমিক শিক্ষালাভ উপার্জনকারী মহিলারা শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। যা তাদের সামাজিক সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ এবং এই সামাজিক সচেতনতার তাদের দারিদ্র্যমুক্ত করতে সাহায্য করবে।

গবেষণা চলাকালে পারিবারিক নির্যাতন পর্যবেক্ষণ কালে জানা গেছে যে এমারগাও গ্রামে পারিবারিক নির্যাতন দীর্ঘ দিনের সমস্যা। সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যকার অসমতার কারনে এ ধরনের নির্যাতন হয়। পারিবারিক নির্যাতন বলতে পরিবারের কোন সদস্যের যারা কোন ধরনের শারীরিকও মানসিক নির্যাতনকে বোঝানো হয়। নারীরা পরিবারের মধ্যে শারীরিক, মানসিক অর্থনৈতিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার। বাংলাদেশের প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর ওপর তার পুরুষ সঙ্গীর নির্যাতনের হার ৪৭ ভাগ যা বিশ্বে দ্বিতীয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর পিছিয়ে থাকা এবং পুরুষের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতার কারনে নারী নির্যাতনের হার বেড়ে চলছে। এমারগাও গ্রামের উপার্জন কারী মহিলারা এখন আর স্বামীদের আয়েরউপর নির্ভরশীল নয়। তারা এখন নিজেরাই সংসার উপার্জনকারী সদস্য হওয়াতে কর্মজীবি মহিলাদের উপর পারিবারিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে পরিববর্তনের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় উপার্জন কারী হওয়ার পূর্বে ১৭.৫৭ শতাংশ ও উপার্জনকারী হওয়ার পরে ৬.৭৬ শতাংশ মৌলিক গালাগালির শিকার হন। উপার্জনকারী হওয়ার পূর্বে ৩৩.৭৮ শতাংশ ও পরে ৮.১২ শতাংশ মৌলিক গালাগালি ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতেন। উপার্জনকারী হওয়ার ১৮.৯২ শতাংশ এবং পরে ৪৮.৬৫ শতাংশ মোটামুটি ভাল ব্যবহার পান। প্রাপ্ত তথ্যে উপার্জনকারী হওয়ার পূর্বে ৯.৪৬ শতাংশ আর পরে ২৭.০৩ শতাংশ ভাল ব্যবহার পান। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক বলা যায় উপার্জনকারী হওয়ার পরে মহিলাদের পারিববিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কারনে কর্মজীবি মহিলাদের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে পারিবারিক নির্যাতনের হার কমেছে যা তাদের আর্থ সামাজিক উন্নতির নির্দেশ করে।

গবেষণা এলাকার মহিলাদের সামাজিক মযার্দা পর্যবেক্ষণকালে ও তথ্য সংগ্রহ কালে দেখা গিয়েছে এমারগাও গ্রামে নারীর অবস্থান পুরুষের নিচে। পরিবারে ও পরিবারের বাইরে মহিলাদের মান মর্যাদার স্তর খুব কম। তারা একা কোথাও যেতে পারে না, ঘরের মধ্যে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারেনা। সামাজিক এই অমর্যাদার পিছনে প্রধান কারণ হিসেবে ধরা হয় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপর তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। অর্থউপার্জনকারী কাজে নিয়োজিত হওয়ার পর তারা এই নির্ভরশীলতা হতে মুক্তি পায়। এই নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পাওয়ায় পরিবারে ও সমাজে তাদের মর্যাদা সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ৫৪.০৫ শতাংশ পরিবারে আর ১০.৮১ শতাংশ সমাজে মযার্দা বেড়েছে। মযার্দা মোটামুটি বেড়েছে ২৯.৭৩ শতাংশ পরিবারের আর ১৭.৫৭ শতাংশ সমাজে। মযার্দার কোন পরিবর্তন হয়নি ১৬.২২ শতাংশ পরিবারে আর ৪০.৫৪ শতাংশ সমাজে। উপার্জন-কারীদের মযার্দা পরিবারে না কমলেও সমাজে কমেছে ৩১.০৮ শতাংশ। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লে-ষণ করে বলা যায় অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পরে পরিবার ও সমাজে তাদের মযার্দা ভিন্নতর। উপার্জনকারী মহিলাদের পরিবারে মর্যাদা না কমলেও আত্মীয়-স্বজন, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও প্রতিবেশীর ধারনায় মর্যাদা কমেছে। গবেষণা এলাকা পর্যবেক্ষণকালে ও আলোচনাকালে অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থালী প্রধানরা মনে করেন মহিলারা বাড়ির বাইরে কাজ করতে বের হলে বাড়ির সম্মান নষ্ট হয়ে, মযার্দাও কমে যায়। আবার দরিদ্র পরিবারের গৃহস্থালী প্রধানরা মহিলাদের ঘরে বসে না থেকে আয় রোজগার করাকে সমর্থন করেছেন কারণ এতে পরিবারের উপকার হয়। উপার্জনকারী মহিলারা তাদের আয় রোজগার দিয়ে দারিদ্র্যতা দূর করতে পেরেছে, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পেরেছেন। উপার্জনকারী মহিলাদের ৫৪.০৫ শতাংশ পরিবারে তাদের মর্যাদা বেড়েছে। পরিবারের উপার্জনকারীর সদস্য হয়ে মহিলারা আত্মশক্তি অর্জন করেছে সে শক্তিতেই তারা মনের দারিদ্র্য ও পরিবারের দারিদ্র্য দুর করতে সক্ষম হয়েছে যা তাদের আর্থসামাজিক উন্নতির নির্দেশক।

গবেষণা এলাকার মহিলা উপার্জনকারী পরিবারে দারিদ্র্যতা দূর হওয়া সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ কালে ও পর্যবেক্ষন কালে দেখা যায়, দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগনের মধ্যে মহিলা জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বড়

Dhaka University Institutional Repository

অংশ দখল করে আছে। গ্রামের শতকরা ৫১ ভাগ মহিলা দরিদ্র। গ্রামীন মহিলারাই দারিদ্র্যের বোঝ বেশি বহন করে। মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচনে নারী উন্নয়নে জন্য সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচি। কারণ মহিলাদের সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পৃক্ত না করার কারণে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। নারী উন্নয়নেকে সমাজ ও দেশের উন্নয়নের সমার্থক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি সংস্থার দরিদ্র্য বিমোচন ও নারী উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসুচি প্রভাব পড়েছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে। পর্দা প্রথা ভেঙ্গে মহিলারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। গবেষণা এলাকা এমারগাও গ্রামের মহিলারা ঘরের চার দেয়ালের গন্ডী পেড়িয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে । দারিদ্র্যতাড়িত হয়ে এই গ্রামের মহিলারা গ্রহন করেছে বিভিন্ন মজুরি কর্ম (কল-কারখানায়, হোটেলে চাকুরি)। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহন করে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছেন, গৃহভিত্তিক কৃষিকর্ম করছেন, হস্ত ও কুটির শিল্প পরিচালনা করছেন। কেউবা মুদির, দর্জির, এবং চা-এর দোকান পরিচালনা করেছেন। এই সকল ব্যবসায় সাফল্য আসার ফলে গ্রামের গরিব দুস্থ মহিলারা তাদের অবস্থার পরিবর্তণ ঘটিয়েছেন। দারিদ্র্যতা দুর করতে সক্ষম হয়েছেন, তাদের মযার্দা বৃদ্ধি পেয়েছে, সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। উপার্জনকারী মহিলাদের দারিদ্র্যতা দুর হওয়া সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে ৭৪.৩২ শতাংশ দারিদ্র্যতা দুর হয়েছে বলে জানিয়েছে আর ২৫.৬৮ শতাংশ দারিদ্র্যতা মোটমুটি কমেছে বলে মতামত দিয়েছে। দারিদ্র্যতা দূর না হওয়া সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় নাই।

গবেষণা এলাকার উপার্জনকারী মহিলাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ ও আলাপআলোচনা কালে জানা গিয়েছে দারিদ্র্যতাড়িত হয়ে এমারগাও গ্রামের মহিলারা গ্রহন করেছে বিভিন্ন অর্থউপার্জনকারী পেশা। উপার্জনকারী হওয়ার পূর্বে তারা দুবেলা পেটভরে খেতে পেতেন না। অর্থ উপার্জন করার পর তাদের ভোগমান বেড়েছে। সংসারের ভরণ পোষণের পর উপার্জিত আয় দ্বারা নিজেদের উন্নতির জন্য খরচকরছেন। অনেক কর্মজীবি মহিলা তাদের উপার্জিত অর্থের বেশ কিছু অংশ জমি, বাড়ি, অথবা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছে। আবার ১৪ জন মহিলা উল্লেখ করেছেন তাদের উপার্জিত অর্থের একটি অংশ ব্যাংকে জমা রাখেন ভবিষৎ নিরাপত্তার জন্য। এ সূত্র ধরেই

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে ৮৫.১৪ শতাংশ আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছে আর ১৪.৮৬ শতাংশ আর্থিক স্বচ্ছলতা অল্প বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি না পাওয়ার কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত তথ্যে সর্বোচ্চ ৮৫.১৪ শতাংশ আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন। যা থেকে তাদের আর্থিক-সামাজিক উন্নতি ও দারিদ্র্যতা বিমোচন হওয়াই প্রতীয়ামান হয়।

আলোচ্য গবেষণার শেষাংশে বলা যায় বাংলাদেশের শতকরা ৪৬ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী মধ্যে দুই- তৃতীয়াংশ নারী। বাংলাদেশের সমাজে দারিদ্র্য, বেকার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগনের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে নারী। পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পেশা প্রভৃতি সহ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের তুলনায় সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠী। নারীর এই ব্যাপক দারিদ্র্যতা জন্য দায়ী করা পুরুষের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাকে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে অর্থকরী শ্রম হতে বিচ্ছিন্ন করে আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টির করে রাখা হয়।ফলে নারী হয়ে পড়ে পুরুষের শ্রমের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার। এই কারণে নারী পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবধান বিদ্যমান। এই ব্যবধানের কারনে নারীকে মনে করা হয় অধঃস্তন ও পরনির্ভরশীল জনসংখ্যা ।আজ সারা বিশ্ব উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহনকে উৎসাহিত করছে। পৃথিবীর অর্ধেক জনশক্তিকে ঘরে বসিয়ে রাখলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। আন্তজার্তিক, সরকারি ও বেসরকরি পর্যায়ে নারী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়ার ফলে ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে গবেষণা এলাকা এমারগাও গ্রামের মহিলাদের উপর। এমারগাও গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারের মহিলারা যারা আগে পর্দার অন্তরালে থাকত, তারা এখন পোশাক শিল্প, কল-কারখানায় ও হোটেলে চাকুরি নিয়ে উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছে। দারিদ্র্য তাড়িত হয়ে এই গ্রামের মহিলারা গ্রহন করেছে বিভিন্ন মজুরি কর্ম। গবেষণা এলাকার ২১.৬২ শতাংশ কর্মজীবি মহিলা আছেন এবং মহিলারা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত আছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ব্যবসা, গৃহভিত্তিক কৃষিকর্ম, হস্ত-কুটির শিল্প পরিচালনা করেছেন ,কেউবা মুদি, দর্জি, এবং চা এর দোকান পরিচালনা করেছেন। এই সকল ব্যবসায় সাফল্য আসার ফলে গ্রামের গরিব দুস্থ মহিলারা

Dhaka University Institutional Repository

তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, দরিদ্র্যতা দুর করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামীন মহিলা উপার্জনকারী পরিবারগুলির একটি বিরাট অংশ খাদ্য ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য নারীর অর্থউপার্জন ও উৎপাদনশীল ক্ষমতার উপর আংশিক বা সম্পূর্নভাবে নির্ভরশীল। গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী মাঝে নারী তার উপার্জনের মাধ্যমে পুরুষের সাথে প্রায় সমভাবে পারিবারিক প্রতিপালনে দায়িত্ব পালন করছে। বিধবা স্বামী পরিত্যক্ত ও তালাকপ্রাপ্ত অর্থাৎ মহিলা কর্তৃত্বাধীন পরিবারগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা একান্তভাবে নির্ভর করে মহিলা উপার্যনকারী অর্থউপার্জন ও খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতার উপর। গবেষণা এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যে ৬০.৮১ শতাংশ পরিবার প্রধান হচ্ছে উপার্জনকারী নিজে। উপার্জনকারী ৬৪.৮৫ শতাংশ নিজ আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। উপার্জনকারী মহিলাদের ৪৪.৫৯ শতাংশ পরিবারের সার্বিক ভরন পোষনের দায়িত্ব পালন করে আর ৫৮-১১ শতাংশ পরিবারের খাদ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। দারিদ্র্যতা দূর হয়েছে বলে তামত দিয়েছে ৭২.৩২ শতাংশ আর স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মতামত দিয়েছে ৮৫.১৪ শতাংশ

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নতি ও দারিদ্র বিমোচন নির্ভর করে মূলত অর্থউপার্জনকারী কাজে নারীর অংশগ্রহনের মধ্যে দিয়ে। সঠিক নির্দেশনা পেলে তারা নিজেরাই নিজেদের আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমান সমাজে নারীর ভূমিকা স্থবির নয় গতিশীল। গবেষনা এলাকার মহিলারা সমাজের প্রচলিত প্রথার বেড়াজাল ভেঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন বিভিন্ন র্অথউপার্জনকারী কাজে এবং গ্রহন করেছেন বিভিন্ন ধরনের পেশা। বর্তমানে নারীরা কৃষিকাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় পুরুষের পাশাপাশি অবস্থান করছেন। আজকে নারী বিশ্বাসী হয়েছেন উঠেছেন তার নিজস্ব যোগ্যতায়, নির্ভর করছেন নিজের ক্ষমতার উপর। এই আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতাই দুর করবে নারীর দারিদ্র্যতা, সূচিত করবে গ্রাম উন্নয়নের অগ্রযাত্রা।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। দারিদ্র্যতার জন্য বাংলাদেশকে একসময় বলা হত দুর্ভিক্ষের আর দূর্যোগের দেশ। বিদেশীদের ওপর নির্ভরশীল দু:শাসনের দেশ। পৃথিবীর দরিদ্রতম তিনটি দেশের একটি ছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অভ্যূদয় হয়েছিল বিশ্বের একটি হতদরিদ্র দেশ হিসেবে। দারিদ্রতার জন্য এদেশটির টিকে থাকার

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভাবনা নিয়ে সন্দিহান ছিল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। তবে ইদানিংকালে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ধীরে ধীরে হলেও পরিবর্তিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দারিদ্র নিরসন বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মানুষের আয় রোজগার বেড়েছে। গড়ে মাথাপিছু ৩.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ও শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সামাজিক খাতে সম্পদ প্রবাহ, অসংখ্য অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের গ্রুপভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ড নারীর অধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহু সংগঠনের উদ্যোগ, পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের সাফল্য, দুর্ভিক্ষ এড়িয়ে চলার মত খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রভৃতির সাফল্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা ধীরে হলেও কমতে শুরু করেছে। তবে দারিদ্র কমার হার খুবই মন্থর। এখনও বিরাট সংখ্যক মানুষ দারিদ্রের কষাখাতে জর্জরিত। প্রবৃদ্ধির হার মোটামুটি ভালো হওয়া সত্বেও দারিদ্র্যের হাড় দ্রুত কমেনি। স্বাধীনতাত্তের কালে জনসংখ্যার শতকরা হারে দারিদ্র্যের সংখ্যা কমলেও, দারিদ্র্য নিরসনের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হতে অনেক কম হওয়ায় দেশের মোট দারিদ্র্য মানুষের সংখ্যা কমেনি। বাংলাদেশ মাথাপিছু প্রবৃদ্ধি অর্জনে সাফল্য অর্জন করলে ও অর্থনৈতিক বৈষম্যর কারনে ৬ কোটি মানুষ দরিদ্র। উপরন্তু সম্পদ বৈষম্য, আয় বৈষম্য ও সুযোগ বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুন। বেড়েছে শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য, ভারসাম্যহীন আঞ্চলিক উন্নয়ন ও অসুবিধাগ্রস্ত, জনগোষ্ঠীর অসহায়ত্ব। গবেষনা এলাকায় পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও তথ্যসংগ্রহকালে দেখা গিয়েছে উপার্জনকারী মহিলা পরিবার গুলিতে দারিদ্র্যতা লাঘব হলেও গ্রামের দরিদ্র, হতদরিদ্র, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সামগ্রিক অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। আলোচ্য গবেষণায় দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রাম উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কিত সার্বিক এই উপস্থাপনায় পর্যবেক্ষনকৃত, অনুসন্ধানকৃত ও বিশ্লেষনকৃত তথ্যের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ আলোচনা করা হলো।

১. দারিদ্র্য দূর করার মূলভিত্তি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের কর্মে নিয়োগ করতে হবে। আধুনিক জ্ঞান প্রযুক্তি ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমৈ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর কর্মের নিশ্চয়তা

Dhaka University Institutional Repository

বিধান করতে হবে। বৃদ্ধি- শিল্প- গ্রাম-শহর এর মধ্যে সমন্বয় থাকলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

২. দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দরিদ্র ও অতিদরিদ্রদের সঠিক অবস্থা চিহ্নিত করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা। সর্বোপরি উৎপাদনশীলতায় দরিদ্রদের যথার্থভাবে যুক্ত করার মাধ্যমেই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

৩. সকল পর্যায়ে ব্যক্তি মানুষের উদ্যমকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনশীলতায় গতি সঞ্চার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শহর -গ্রাম-সর্বত্র, কৃষি-শিল্প-, ব্যবসা-বানিজ্য সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল একটি অবস্থার সৃষ্টি করতে পারলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। উদ্যমী ও পরিশ্রমী যুবক ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের প্রচেষ্টায় ঋন সহায়তা দেওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনই বিভিন্ন সেক্টরে , বিশেষ করে গ্রাম এলাকার স্বল্পবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদে অনুপ্রানীত করা আবশ্যক। সহজশর্তে ঋন এবং কারিগরি সহায়তা দিয়া তাদের উদ্যোগকে ফলবন্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বহুবিচিত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব।

৪. দারিদ্রদের যাতে দ্রুত হারে আয় বৃদ্ধি পায়- এ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দরিদ্রদের এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনকে মূল লক্ষ্য হিসাবে ধরে নিতে হবে। তেমনি আয় বৈষম্য কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

৫. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে দরিদ্রদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যের সাথে সে আয়কে কিভাবে স্থায়িত্ব দেয়া যায় সেটার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এরজন্য নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে এমন সংকট সম্ভাবনার উৎসগুলো চিহ্নিত করে তার অবদমনের প্রয়াস চালাতে হবে এবং ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে সংকট মোকাবেলার ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

৬. দারিদ্র্য মোচনের লক্ষ্যে উচ্চহারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং প্রবৃদ্ধির প্রকৃতির এমন পরিবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

সাধন করতে হবে যাতে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থা প্রসারিত হয় যার ফলে দরিদ্র শ্রেণী বেশি উপকৃত হবে।

৭. যে সব দেশে দারিদ্র্যের হার অত্যাধিক এবং উচ্চাহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে দুর্জেয় বাঁধা রয়েছে, সে সব দেশে ব্যস্ট্রিক হস্তক্ষেপের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে ।

৮. দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টায় কেবল ভূমিহীনদের ওপরই দৃষ্টিপাত করা হয়। দরিদ্র ও হতদরিদ্র্য ছাড়াও গ্রামে একদল ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক আছে যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই নড়বড়ে। এরা আগামীদিনের দরিদ্র। তাই দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টায় শুধু ভূমিহীনদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে তাকে আরও প্রসারিত করা উচিত এবং প্রান্তিক জমির মালিকদেরকেও টার্গেট গ্রুপের আওতায় আনা সঙ্গত। এই উদ্দেশ্যে ছোট খামারের জন্য বিশেষ ঋন কর্মসূচি চালু করা যায়। এই ঋন শুধু উৎপাদনে সহায়তা দেবার জন্য নয় বরং ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা যায়- যার মাধ্যমে দরিদ্ররা বাজার অর্থনীতিতে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় ও উন্নত করতে পারে।

৯. দারিদ্র্যের মাত্রার মধ্যে ব্যাপক অঞ্চলগত ও ঋতুগত পার্থক্য বিদ্যমান। দারিদ্রতার মধ্যে আবার অঞ্চলভেদে ও মৌসুভেদে পার্থক্য দেখা যায়। তাই দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে অঞ্চলভেদে ও ঋতুভেদে দারিদ্র্যের তীব্রতা হ্রাসে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন করা দরকার।

১০. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে দেশের ও বহিবির্শ্বের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহারিক তথা প্রযুক্তিগত শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার একটা ইতিবাচক ভূমিকা থাকলেও মাধ্যমিক স্তরে যে ধরনের শিক্ষা এখন বিদ্যমান তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বেশ কঠিন। এটা শ্রমের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষার সম্পর্কহীনতাকে প্রকাশ করে। শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সঙ্গতি বৃদ্ধি করা জরুরী। শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র্য পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে হলে শুধু অবকাঠামো তৈরি দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে বলবে না, বরং পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতির আধুনিকায়নের প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

১১. মানব উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, নারী ও শিশুর বিষয়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় রাখতে হবে। পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মানউন্নয়ন, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহের দিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে।

১২. দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে স্থায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য জোর দিতে হবে। এর জন্য জোর দেওয়া দরকার বস্তুগত অবকাঠামো নির্মান কাজে। বিশেষত: সেচ, পল্লী বিদ্যুতায়ন ও উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নাই। সেচ ব্যবস্থা কৃষিপণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে চরম দারিদ্রের সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে। পল্লী বিদ্যুতায়ন সেচের খরচ কমায় ও পাশাপাশি গ্রামে অকৃষি খাতের বিকাশে সহায়তা করে। পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ দ্বারা সাধারন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিশেষ গতি লাভ করে এবং দেখা গেছে এই ব্যবস্থা দরিদ্র পরিবার সমূহের আয়ের বৃদ্ধি ঘটায়।

১৩. জাতীয়ভাবে একটি স্থায়ী প্রবৃদ্ধির জণ্য গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার যথাযথ উন্নতি সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, গ্রামীন বিকাশ বাধাগ্রস্ত হলে তা শেষ পর্যন্ত জনসংখ্যার শহরে আগমনকে উৎসাহ যোগাবে এবং নগর কেন্দ্রসমূহের উদীয়মান প্রবৃদ্ধির শক্তিকে বিপর্যস্ত করবে। এ ক্ষেত্রে নগরায়নের বিকেন্দ্রিকরণ অপরিহার্য। আর এ কাজে থানা স্তরে নির্মিত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ভালভাবে কাজে লাগানো যায়।

১৪. স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সামাজিক খাতে ক্রমাগত বেশি পরিমান বিনিয়োগ অর্জন দরিদ্র শ্রেণীর মানব সম্পদ উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

১৫. অসহায়, দু:স্থ, বিধবা নারীদের ভাতা কর্মসূচি সম্প্রসারনের পাশাপাশি বিশেষ করে যারা শারীরিকভাবেক্সশ কিন্তু আর্থিকভাবে অক্ষম তাদেরকে সরকারি ও এনজিওর সহায়তার সহজশর্তে ঋন প্রদান করলে, তারা বিভিন্নন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে জড়িত হয়ে নিজেরাই আত্মনির্ভরশীল হতে পারেন।

১৬. সামাজিক নিরাপত্তাকে প্রধান কর্মসূচি হিসেবে গ্রহন করে খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদার

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে। এতে পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন ফলপ্রসু হবে।

১৭. গরিবদের সংগঠন গড়ার প্রক্রিয়ার ওপর জোর দিতে হবে। গরিবরা সংগঠিত হলে তাদের উৎপন্ন পন্য ও সেবার ক্রেতা ও তাদের কেনা পন্যের বিক্রেতার সঙ্গে তাদের পছন্দ মত Negatiation করতে পারবে। তাদের সগঠন শক্তিশালী হলে তারা স্থানীয় পর্যায়ে শাসন ব্যবস্থাতেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও তাদের ন্যায্য হিস্যা চাইতে পারবে।

১৮. জাতীয় পর্যায় থেকে যে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় তা সব সময় গরিব মানুষের পক্ষে থাকে না। দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার উন্মুক্ত আচরনের কারনে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা দরিদ্র জনগোষ্টীর কাছে পরিপূর্ণভাবে পৌছায় না। স্থানীয় সরকারে প্রচলিত যে কাঠামো রয়েছে তাতে গরিব মানুসের কার্যকরী অংশগ্রহন সব সময় হয়ে ওঠে না। জাতীয় সরকারে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্থানীয় সরকারগুলোকে আরো মানবিক ও গরিবমুখী করার কৌশল খুঁজে বের করতে হবে।

১৯. দরিদ্রদের সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ করতে হবে ।

২০. আমাদের দেশে দারিদ্র্য না কমার কারন হলো সুশাসনের অভাব। দারিদ্র নিরসনকে সুশাসনের অপর পিঠ বলা যায়। দু:শাসন ও দুর্নীতি থাকলে দারিদ্র্যদূর করা সম্ভব না। সংসদকে সকল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত করা। কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের অফিস ও সংসদের সরকারি হিসাব কমিটি শক্তিশালী করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করা, ন্যায়পাল নিয়োগ দেওয়া, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা, জন প্রশাসনের সংস্কার আনা ইত্যাদির মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ম না মানার সংস্কৃতি থাকলে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে না। তাই সুশাসনের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বিদ্যমান দারিদ্র্য পরিস্থিতির সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হন নারীরা। গড়ে দেখা গেছে পুরুষের পুষ্টি লাভের হারকে যদি ১০০ শতাংশ ধরা যায় তবে নারীর ক্ষেত্রে এই হার হলো মাত্র ৮৮ শতাংশ এবং মজুরির ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর এইহার মাত্র ৪৬%। পুরুষদের সাক্ষরতা যেখানে ৪৫%, নারীদের সাক্ষরতা সেখানে মাত্র ২৯%। চরম দরিদ্র পরিবারে পরিবার প্রধান হিসাবে নারীর সংখ্যা বেশি। গবেষণা এলাকায় তথ্য অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষন, আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহরের মাধ্যমে দেখা গিয়েছে উপার্জনকারী হিসেবে পরিবারে মহিলাদের ভূমিকা গুরুত্ব পাচ্ছে, অতিরিক্ত স্বচ্ছলতা আসছে, ভোগমান বেড়েছে। তবে সামগ্রিক বিবেচনা থেকে দেখা যায় যে, গ্রামীন পরিবারসমূহের মধ্যে নারী প্রধান পরিবারগুলোই সমাজে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত ও অক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষিতে নারীর দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়নের সুপারিশসমূহে উল্লেখ করা হলো।

১. বাংলাদেশের দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহন অত্যাবশ্যক। পিতৃতন্ত্র, প্রচলিত মূল্যবোধ ও ধ্যান ধারনা, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, প্রথাগত ঐতিহ্যিক মনোভাবের কারনে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজন নিরুৎসাহিত করা হয়। নারীর দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্তে নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে।

২. কৃষিকাজ, শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা তথা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহন সরকারি তথ্যে অস্বীকৃত হলেও বাস্তবে তা ব্যাপক এবং ক্রমবর্ধমান। গ্রামীন পরিবারগুলির একটি বিরাট অংশ তাদের খাদ্য ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য নারীর উৎপাদনশীল এবং অর্থোপার্জনশীল ক্ষমতার উপর আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। যা থেকে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহনের অপরিহার্যতা অনুধাবন করা যায়।

৩. মহিলাদের দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভোগমান ও খাদ্য নিরাপপত্তা জন্য কৃষি ও অকৃষি খাতে মহিলাদের সম্পৃক্ততা আরো জোরালো ও সম্প্রসারিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. আমাদের দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হচ্ছে গ্রামীন নারী। তারা কৃষি উৎপাদন ও শষ্য প্রক্রিয়াজাতকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ব্যবসা করে, শিল্প কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করে, কুটির শিল্প , চা শিল্প, মৎস্য শিল্প প্রভৃতি খাতে নারী শ্রমিকের উপস্থিতি দেখা যায়। উৎপাদনমূলক কাজে নারীর অবদান ব্যাপক। তবে, জাতীয় আয়ে নারীর এই অবদানকে বিচেনার আনা হয় না। নারীর উন্নয়নে তথ্য দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীর শ্রমশক্তির প্রকৃত মূল্যায়ন ও শ্রমশক্তিতে নারীর আরো ব্যাপক হারে অংশগ্রহন অপরিহার্য।

৫. আমাদের দেশের সংবিধানে জীবনের সবক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রায় সবক্ষেত্রেই নারীদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীপুরুষের বৈষম্য সৃষ্টির মূলে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারনে নারী অর্থকরী শ্রম হতে বিচ্ছিন্ন হযে নারী হয়ে উঠে পুরুষের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। নারীকে অধিকহারে অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজন করে আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে দূর হবে নারীর দারিদ্রতা, হ্রাস পাবে নারী-পুরুষ বৈষম্য।

৬. অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারী সম্পৃক্ত থাকার কারনে কৃষি, পশুপালন, মৎস্যপালনে অংশগ্রহন করলেও তাদের অবদান অস্বীকৃত রয়ে গেছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারী অংশগ্রহনকে সরকারি হিসেবে সঠিকভাবে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা নাই। উৎপাদনশীলতায় নারী অবদান জাতীয়ভাবে মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক।

৭. নারীর গৃহস্থালী কাজকর্মকে বাধ্যতামূলক সেবা হিসেবেই দেখা হয়। নারীরা অধিকাংশই বিনা পারিশ্রমিকে পারিবারিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। শিল্পক্ষেত্রে নারী শ্রমিকরা অধিকাংশই অদক্ষ বা আধাদক্ষ শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত, তারা মজুরি পান কম। নারীরা বর্তমানে নতুন প্রযুক্তির কারনে প্রথাগত কাজ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। কারন, নতুন প্রযুক্তি পুরুষের স্বপক্ষে কাজ করে। নারীর শিক্ষাও অপ্রতুল যা তার দক্ষতা ও প্রশিক্ষণে বাধারূপে বিরাজমান। অর্থকরী কাজে নারীর মজুরি বৈষম্য কমাতে হলে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু নীতিমালা ও মনিটরিং ব্যবস্থা দরকার। সরকারি পর্যায়ে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮. নারী উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষা, দক্ষতাও কর্মসংস্থানের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

৯. নারীর অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি না হলে এবং সামাজিকভাবে স্বীকৃত আইন প্রতিষ্ঠিত না হলে অসমতার উপাদানগুলো নারীদের সব সময়ের মতো বঞ্চিত করবে। অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহন করলেও নারীরা তার ফলভোগ করতে প্যারে কি না সে নিশ্চয়তা সমাজ কাঠামোতে থাকতে হবে। অর্থনৈতিক কাজের কিছু সুযোগ নারীদের জন্য তৈরি করলেও রক্ষনশীল সামাজিক শক্তিসমূহের আধিপত্য দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহন না করলে নারী উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

১০. অশিক্ষা ও দারিদ্র্যতা যেমন, নারীর দুর্দশা বৃদ্ধি করে তেমনি রাষ্ট্রের অগনতান্ত্রিক ও পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা নারীর অধস্তনতা বৃদ্ধি করে। নারী উন্নয়ন দেশের সুষ্ঠু শাসন প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্টানিক নীতির মাধ্যমে নারীকে যে অধিকার বা সুযোগ প্রদান করা হয় তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নারীর উন্নয়ন নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রীয় নীতি, সামাজিক ও ধর্মীয় আইন অনুযায়ী যেমন নারীকে কম অধিকার দেওয়া হয়েছে তেমনি পারিবারিক কাঠামো ও সামাজিক গঠন প্রক্রিয়ায় পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের কারনে নারীর অধস্তনতা বিরাজ করছে। তদুপরি অশিক্ষা, সম্পদের অসম বন্টন, মানব অধিকার লংঘন ও আইনের অনুশাসনের কারনে নারীর দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি পায়।

১১. বৈষম্যমূলক আচরন থেকে মুক্ত হতে হলে নারীকে যোগ্য ও দক্ষ হয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। বৈরী সামাজিক অবস্থানকে শক্ত হাতে মোকবেলা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষ ও যোগ্য প্রমান করতে হবে।

১২. এনজিওসমূহ নারীর অর্থনৈতি কাজকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতামুক্ত করে ঋনদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ৮০ দশকের শুরুতে মহিলাদের পরিবার প্রধান বিচেনা করে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋনের বিস্তার ঘটতে থাকে। ক্রমাগত প্রচেষ্টার

Dhaka University Institutional Repository

ফলে এখন তা সারাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। কারন, নারীর গতানুগতিক কাজ যেমন- গরু, হাঁস-মুরগি পালন, ধানভানা, হস্ত শিল্প ইত্যাদি কাজে ক্ষুদ্র ঋনের সুযোগ বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি করে নারী উন্নয়নের পথ সুগম করা হয়। নারীর দারিদ্রতা দূর করার জন্য ক্ষুদ্রঋন আরও সহজ ও কার্যকর করা আবশ্যক।

১৩. দরিদ্র্যের আয় বৃদ্ধি, সম্পদ অর্জন ও মজুরি বর্ধনে ক্ষুদ্রঋনের বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। ক্ষুদ্রঋনের ক্রমবর্ধমান মাত্রার সাথে সাথে ক্ষুদ্রঋনদানকারী প্রতিষ্ঠাসমূহকে তাদের আর্থিক টেকসহিতা ক্ষুন্ন না করে সার্ভিস চার্জের হার কমাতে হবে যাতে করে তাদের বর্ধিত ব্যয় সাশ্রয়ীতার সর্বোচ্চ সুফল ক্ষুদ্রঋন গ্রহীতারা পেতে পারে।

১৪. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুদ্রঋন কর্মসূচি আরো সম্প্রসারিত করতে হবে। সেই সাথে দরিদ্র নারীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার পাশাপাশি শ্রমের জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. নিজের অধিকার সমন্ধে নারী গোষ্ঠীর যে ব্যাপক অজ্ঞতা রয়েছে, সেই কারনেও নারী উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। সনাতনী প্রথা ভেঙ্গে যারা অর্থ উপার্জনকারী কাজে নিয়োজিত হয়েছে, তারাও নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ। নারীর দারিদ্র্যতা দূরীকরণে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্যোগ নিতে হবে। সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধির জণ্য বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে।

১৬. মহিলাদের নিজ অবস্থান সমন্ধে অসচেতনতার কারন নিম্ন শিক্ষাস্তর। এ অবস্থার উন্নতির করার উপায় হচ্ছে মহিলাদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধি করা। মহিলাদের শিক্ষার হার পুরুষের সমান করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ গ্রহন প্রয়োজন। এখানে পারিবারিক পর্যায়ে উদ্যোগ জরুরী। একই পরিবারে নারীও পুরুষ শিশুকে একই হারে স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হয়েও নারীরা রাজনীতির ক্ষেত্রে অবহেলিত। এই অবস্থার উন্নতির জন্যে মহিলাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার সুযোগ সমাজ ও

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র উভয়কেই করে দিতে হবে অথবা উদ্যোগ নিতে হবে। রাষ্ট্রের শাসন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হলেও সরকারে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি বা উদ্যোগ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যথেষ্ট নয়। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যতা যেমন নারীর দুর্দশা বৃদ্ধি করে তেমনি রাষ্ট্রের অগনতান্ত্রিক ও পুরুষশাসিত শাসন ব্যবস্থাও নারীর অধস্তনতা বৃদ্ধি করে। মানুষের অধিকারও মর্যাদার পক্ষে সামাজিক সংস্কৃতি সচেতনতা সৃষ্টির কাজে রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষানীতি নারীনীতিতে সুস্পষ্টভাবে যুক্ত করে বাস্তবায়ন করতে হবে। সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রচলিত পদ্ধতি বাতিলের জণ্য বিভিন্ন নারীসংগঠনসমূহে যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তার সফল বাস্ত বায়ন হলে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে।

১৮. বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা আজ ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। পারিবারিক পর্যায়ে পরিবারের সদস্যগনের আচরনে, সামাজিক প্রষ্ঠিান হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের আচরনে, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারী

১৯. দের আচরনে এবং নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রতন্ত্রের আচরনে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। নারীরা বিয়ের আগে পিতা-মাতার সংসারে নানা অনুশাসন, বিধি,নিষেধ, নিকটাত্মীয় কৃর্তক যৌন হয়রানি, ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে। বাল্য বিবাহ। স্বামী কর্তৃক শারীরিক নির্যাতন, যৌতুকের জন্য নানা ধরনের নির্যাতন। আত্মীয়-স্বজনকে সন্তুষ্ট রাখতে ব্যর্থ হলে গঞ্জনায় শিকার ইত্যাদি বিভিন্নভাবে নারীর সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন। নারী ক্ষমতাহীনতা, ও পুরুষের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষপাতিমূলক সমর্থন যোগায়। নারীর প্রতি সহিংসতার অবসান ঘটাতে প্রয়োজন পারিবারিক কাঠামো থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সকল নারীর পক্ষে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন এবং নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন।

২০. বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা উলেখ থাকলেও কার্যত বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের অধিকার ও উত্তরাধিকারের ব্যাপারে রয়েছে বৈষম্যমূলক আইন। যা নারীর অধিকার ও আর্থ-সামাজিক উন্নতিকে বিঘ্নিত করেছে। তাই নারীর মর্যাদা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আইন পরিবর্তন, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরন আইনের কঠোর বাস্ত বায়ন। নর ও নারীর সমতার আদর্শ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, ছেলে ও মেয়ে শিশু অভিন্ন সামাজিকীকরণ। নারীর কর্মকান্ডের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি দান।

২১. বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী। তাই দেশের সামগ্রীক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হবে নারীদের সমতার ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে। সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্যও সামাজিক ও এবং অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহন নিশ্চিত করা প্রযোজন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন নারী শিক্ষার প্রসার। পরিবার, সমাজে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতাবিধান এবং নারীর ক্ষমতায়ন। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মানবাধিকার রক্ষায় জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি ও নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারী-পুরুষের অসমতা দূরীকরন সম্ভব। নারী পুরুষের সমতাই সামগ্রিকভাবে জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র দূর করতে পারে।

সুতরাং সামগ্রিক অর্থে দারিদ্র্য বিমোচনে ও গ্রাম উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কিত উল্লেখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করে তার যথাযথ বাস্তবায়ন করলে দারিদ্র্য বিমোচনও গ্রাম উন্নয়নে অবদান রাখতে মহিলারা সক্ষম হবে।

অতএব সবশেষে সার্বিক এই উপস্থাপনার আলোকে একথা বলা যায় যে সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের নারীরা। যোগ্যতা অর্জন ব্যতীত সম-অধিকার ও ক্ষমতায়নের অগ্রযাত্রা সফল হয় না। যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীরা সর্বক্ষেত্রেই তাদের ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরি করেছে। প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কর্মকান্ডে রয়েছে নারীর সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহন। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায়ও নারীরা পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

বৈষম্যমূলক আচরন থেকে নারীকে মুক্তি দিতে হলে প্রথমেই যোগ্য ও দক্ষ হয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। বৈরী সামাজিক অবস্থানকে শক্ত হাতে মোকাবেলা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষ ও যোগ্য প্রমান করতে হবে। নারীর সততা, নিষ্ঠা ও কাজের প্রতি একাগ্রতা এসবই আমাদের নারীদের সামনের দিকে এনে দিয়েছে। আজকের নারী বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন তার নিজস্ব যোগ্যতায়, নির্ভর করছেন নিজের ক্ষমতার ওপর। সমাজ উন্নয়নের ধারায় নারীর ভূমিকা যেখানে যতটুকু বদলেছে সেটুকুকে শক্তি হিসেবে গণ্য করে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই শক্তিতে বলীয়ান হয়েই দূর হবে নারীর দারিদ্রতা সূচিত হবে গ্রাম উন্নয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল্লাহ, আবু (১৩৯৮): বাংলাদেশের জন্য উপযোগী উন্নয়ন কৌশল, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৯ম খন্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা

অমর্ত্য সেন (২০০৪) : উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা, অনু: অরবিন্দ রায়, আনন্দ পাবলিকেশন, কলকাতা।

আরেন্স ইয়োনেকা ও ইওসফান ব্যুরদেন (১৯৮০): ঝগড়াপুর: গ্রাম বাংলার গৃহস্থ ও নারী, অনু: নিলুফার মতিন, গণ প্রকাশনী, ঢাকা

আরেফিন, হেলালউদ্দিন খান (১৯৯৪): শিমুলিয়া: বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল কৃষিকাঠামো, অনু: খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন ও মাহবুবা বেগম, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আরেফিন, ড. মোঃ ছাদেকুল (২০০৭): ক্ষমতায়ন ও গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ব্র্যাক কার্যক্রমের অবদান, এ,এইচ ডেভেলপ মেন্ট, পাবলিশিং হাউজ

আলমগীর, মহিউদ্দিন খান (১৯৭৬): উন্নয়ন অর্থনীতি: সমস্যা ও সমাধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আলম, এ.এইচ.এম মাহবুবুল (১৯৯২): অর্থনৈতিক উন্নয়নও পরিকল্পনা, রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা।

আলম, মোঃ খুরশিদ (১৯৮১): উন্নয়নমূলক সমাজবিজ্ঞান, আজিমপুর, ঢাকা।

আলম, এস.এম. নুরুল (১৯৯৯): উন্নয়ন থেকে উন্নয়ন: প্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা, সমাজ নিরীক্ষণ, ৭১, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আহমেদ, বশির (২০০২): নারী: এনজিও টার্গেট গ্রুপ, বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ,

Dhaka University Institutional Repository

সম্পা, আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, দি ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড।

আহমেদ, সালমা (২০০২): গভর্ন্যান্স ও নারী,বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, সম্পা, আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, দি ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড।

উন্নয়ন পদক্ষেপ ১৯৯৭: ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ।

কবির, লায়লা (১৯৮৯): অধস্তনতা ও সংগ্রাম: বাংলাদেশের নারী, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।

কর, পরিমল ভূষন (১৯৯৬): সমাজতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

কেলি, রিটা মে ও বুটিলিয়ার মেরী (১৯৯১): রাজনৈতিক নারীর অভ্যূদয়, অনু. নূরুল ইসলাম খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কাশেম, ড. মো: আবুল (২০০৫): বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীন অর্থনীতি, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।

খান, ড. আখতার হামিদ (১৯৭৭): পল্লী উন্নয়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

খান মো: শামসুল কবির (১৯৯৬): বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

গুলব্রেথ, জনকেনেথ (১৯৮১): গণ-দারিদ্র্যের প্রকৃতি, অনু. ড. আবদুল্লাহ ফারুক, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

গুহঠাকুরতা, মেঘনা (২০০০): আমার বাংলাদেশ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গুহঠাকুরতা, মেঘনা ও বেগম সুরাইয়া (সম্পা). (১৯৯): নারী: রাষ্ট্র উন্নয়ন ও মতাদর্শ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, আনোয়ারউল্লাহ (১৯৮৩): বাংলাদেশের একটি গ্রাম: সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি সমীক্ষা, এসোসিয়েটেড বুক কোম্পানী, ঢাকা।

চৌধুরী, আনোয়ারউল্লাহ ও রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুর (১৯৯৯): সমাজবিজ্ঞান, আশরাফিয়া বইঘর, ঢাকা।

ও রশিদ সাইফুর (১৯৯৫): নৃবিজ্ঞান উদ্ভব বিকাশ ও গবেষণা পদ্ধতি বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চৌধুরী, ওমর হায়দার (১৯৯৭): পুষ্টি, দৈহিক বিকাশ ও দারিদ্র্য, দারিদ্র্য ও উন্নয়ন: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, সম্পা. রুশিদান ইসলাম রহমান, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান,ঢাকা।

চৌধুরী, ফারাহ দীবা (২০০২): বিশ্ব নারী সম্মেলন ও বাংলাদেশের নারী, বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, সম্পা, আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, দি ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড।

জাহান, সেলিম (১৯৮৯): প্রসঙ্গ: উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(১৯৮৬): গ্রাম বাংলায় দারিদ্র্য প্রবণতা ও পরিমান, সমাজ নিরীক্ষা ২৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

দাশপুরকায়স্থ, ড. নিবেদিতা (১৯৯৯): মুক্তি মঞ্চে নারী, প্রিপট্রাষ্ট, ঢাকা।

নাথ, নারায়ন চন্দ্র (১৪০১): দারিদ্র্যের প্রত্যয়গত ধারনা এবং পরিমানগত সমস্যা, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, দ্বাদশ খন্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

নাহার, আইনুর (২০০২): উন্নয়ন ও গ্রামীন নারী এবং মৌলবাদ, বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, সম্পা, আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, দি ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড।

Dhaka University Institutional Repository

পাল-মজুমদার, প্রতিমা (১৯৯৭): শ্রমজীবী মহিলাদের দারিদ্র্যের বিভিন্ন মাত্রা, দারিদ্র্য ও উন্নয়ন: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, সম্পা, রুশিদান ইসলাম রহমান, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

পাল-মজুমদার, প্রতিমা, বেগম, শরীফা, (১৪০৮): বাংলাদেশে গ্রামীন চরম দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, উনবিংশ খন্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

ফারুক আবদুল্লাহ (১৯৭৪): বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ফাসফেল্ড, ড্যানিয়েল (১৯৯১): অর্থনীতিবিদদের যুগ, অনু:ড, আবদুল্লাহ ফারুক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০০১): অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনু বিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০০৩): অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনু বিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার।

বেগম, সুরাইয়া (১৯৮৮): বাংলাদেশ ও নারী অধস্তনতা মতাদর্শের বিভিন্ন দিক, সমাজ নিরীক্ষণ ৩০, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বনিক, গৌর সুন্দর(১৯৯৩): বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন কৌশল, উন্নয়ন অর্থনীতি: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, সম্পা, নাসির উদ্দিন আহমেদ ও ড. তারেক আহমেদ, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

বেসরকারী দৃষ্টিভঙ্গি, নারী উন্নয়নের: (১৯৮৬): নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

ভট্টাচার্য, দেবপ্রিয় ও আহমেদ সাঈদ (২০০৬): বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি): মূল প্রতিপাদ্য ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, ঢাকা।

মঈন, জুলিয়া (১৯৯৮): গ্রামীন কর্মজীবী মহিলাদের ভূমিকা, মর্যাদা ও পরিবর্তনের ধারা: একটি গ্রাম পর্যায় সমীক্ষা, সমাজ নিরীক্ষন ৬৮, সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মুজেরী, মোস্তফা কামাল (১৯৯৭): দারিদ্র্যের পরিমাপ পদ্ধতি বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রবণতা, দারিদ্র্য ও উন্নয়ন, প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, সম্পা, রুশিদান ইসলাম রহমান, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

মাহমুদ, আনু (১৯৯৭): বাজেট: পরিকল্পনা, দারিদ্র্য বিমোচন, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা।

..... (১৯৯৭): বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজ ও অর্থনীতি, মীরা প্রকাশনী, ঢাকা।

মাহমুদ, ড. আবু (১৯৯৫): উন্নয়ন উচ্ছাস ও তৃতীয় বিশ্ব, পাইনিয়ার প্রকাশনী, ঢাকা।

মাহমুদ, সিমীন (১৩৯৬): কৃষিতে নারীর ভূমিকা, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, সপ্তম খন্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

রহমান, আতিউর (১৩৯৮): গৃহায়ন ও উন্নয়ন: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, নবম খন্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

রহমান, আতিউর ও রহমান, আরিফুর (১৪০৮): দারিদ্র্য বিমোচন: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, উনবিংশ খন্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

রহমান, রুশিদান ইসলাম (১৪০২): কর্মজগতে নারী এবং বর্হিজগত ও অন্তঃপুর এর বিরোধ: এ যুগের বিমলাদের নতুনতর অন্তর্দ্বন্দ্ব, নারীমুক্তি ও রবীন্দ্রসাহিত্য, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ত্রয়োদশ খন্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

রহমান, রুশিদান ইসলাম (১৪০৯): শিক্ষা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব, বাংলাদেশে উন্নয়ন সমীক্ষা, বিংশতিতম খন্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

রহমান, শাহীন (১৯৯৮): জেন্ডার প্রসঙ্গ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভলপমেন্ট।

রহমন, হোসেন জিল্লুর (১৯৯৭): গ্রামীন দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা: কিছু পুর্নভাবনা, দারিদ্র্য ও উন্নয়ন: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, সম্পা: রুশিদান ইসলাম রহমান, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

(সম্পা: (১৯৯৪): মাঠ গবেষণা ও গ্রামীন দারিদ্র্য পদ্ধতি বিষয়ে কতিপয় সংলাপ, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা।

লস্কর, এস.আই (১৪০২): মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ত্রয়োদশ খন্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

শিকদার, জহিরুল ইসলাম (১৯৯০): কৃষি অর্থনীতি, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ঢাকা।

শফিক, মাহমুদ (২০০২): দারিদ্র্য ও উন্নয়ন, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।

সিদ্দিকী, কামাল (১৯৯২): বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যের রাজনৈতিক আর্থনীতি, অনু. চন্দন সরকার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সিদ্দিকী, কামাল (১৯৮৫): বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্য স্বরূপ ও সমাধান, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সামাদ, ড. মুহাম্মদ (১৯৯৪): বাংলাদেশে গ্রামীন দারিদ্র্যমোচনে এনজিওর ভূমিকা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

সিদ্দিকি, আবুবকর (১৯৯৩): বাংলাদেশের পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসন কৌশল,উন্নয়ন অর্থনীতি: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, সম্পা, নাসিরউদ্দিন আহমেদ ও ড. মোহাম্মদ তারেক বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সুম্পিডটার, জোসেফ, এ, (১৯৭৩): অর্থনৈতিক উন্নয়ন মতবাদ, অনু. তোফাজ্জল হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সালাউদ্দিন, খালেদা (১৯৯০): আধুনিক সমাজ ও বাংলাদেশেল নারী, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।

সুলতানা, পারভীন, (১৪০৮): কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহিলাদের অংশগ্রহণ: একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, উনবিংশ খন্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

হাই, হাসনাত আবদুল (১৯৯০): পল্লী উন্নয়ন, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা।

হক, মো: জিয়াউল (১৯৭৭): উন্নয়ন অর্থনীতি ও পরিকল্পনা, বুক সোসাইটি, ঢাকা।

হোসেন, আমজাদ (১৯৯৫): বাংলাদেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরনে রাজনৈতিক অর্থনীতি, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

হোসেন, মাহবুব (১৯৮৬): বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সমস্যা ও সম্ভাবনা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

হাসান, মো: কামরুল (১৯৯৮): মানব উন্নয়ন ধারনার বিকাশ, সমাজ নিরীক্ষন ৬৭, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

— (১৯৯৬): দারিদ্র্য বিমোচন নীতি: ধ্রুপদী মতামত ও এর বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা, সমাজ নিরীক্ষণ ৬১, সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ঢাবি, ঢাকা।

হার্শমান, মিতু (২০০৪): নারী ও উন্নয়ন: একটি সমালোচনা, সমাজ নিরীক্ষণ ৮৯, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

হাসানউজ্জামান, আল মাহমুদ (সম্পা. ২০০২): বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

Abdullah, A.A. and Murshid K.A.S (1986): Interdistricts changes and Variations in Landlessness in Bangladesh, Bangladesh Development studies, 14.

Abdullah, T. (1974): Village Women As. I saw Them, Ford Foundation Dhaka, 1990.

— and Zeidenstein S.A.(1982): Village Women of Bangladesh: projects for change, Pergamon Press, Oxford.

Adnan, S. (1989): Birds in a cage, Institutional change and Women Position in Bangladesh OSLO, 1988.

Ahmed, Badarduddin (1983): Rural Women programme: Comilla Experience, Rural Development, Academy, Bagra.

Ahmed, Mohiuddin (1983): Working women in Rural Bangladesh, A case study, community Development Library, Dhaka.

Ahmad, Parveen, (1997): Income Earning as Related to the changing status of village women in Bangladesh, Women for women, Dhaka.

Ahluwalia, Montek, S. (1977): Rural Poverty and Agricultural Performance in India, Journal of Development Studies.

Alamgir, M.K (1979): Bangladesh: A case of Below Poverty Level, Equilibrium Trap, Bangladesh institute of Development studies (BIDS), Dhaka.

Alamgir, M.K (1998): Conteivution of Grameen Bank to Gross Domestic Product of Bangladesh Preliminary Estimates, Program for Research on Poverty Alleviation, Grameen Trust, Dhaka.

Americana of Encyclopedia(1982): Volume-22, Grolier Incorporated. (1983).

Dhaka University Institutional Repository

Booth, Charles(1989-1902): Life and Labour of the people of London, Macmillan London.

— (1902): Poverty: a study of town life, 4th ed. Macmillan London.

Begum, Nazmir Noor (1987) Pay or Purdah: Women and Income Earning in Rural Bangladesh. Bangladesh Agricultural Research council, Dhaka.

BBS (2004): Bangladesh Bareau of statistics, Report of the poverty Monitoring Survey 2004, Govt. of Bangladesh, Dhaka.

— (2003): Population census 2001, National report (provisional), planning Division, Ministry of planning Govt. of Bangladesh, Dhaka.

— (2002): Statistical Pocket book of Bangladesh 2001, Ministry Bangladesh Bareau of Statistics Govt. of Bangladesh, Dhaka.

BBS (2000): Statistical Year Book of Bangladesh, Bangladesh Bareau of Statistics, Govt. of Bangladesh, Dhaka.

BIDS (1992): Re-Thinking Rural poverty: A case for Bangladesh, Raman , H.Z. and M. Hossain (eds), Analysis of poverty Trend Progect, BIDS, Dhaka.

Britannica of Encyclopedias (1943-1973), Volume -14, William Benton publisher if planning.

Chambers, Robert (1993): Rural Development, Unite states with John Wiley and sons Inc, New York.

Chatterjee, A. Shoma (1988): The Indian Womens Search for an Identity, Vikas Publishing House , New Delhi.

Chaudhury, Rofiqul Huda and Ahmed, Nilufar Raihan (1982): Female Status in Bangladesh, Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka.

CPD (2006): CPD-IRBD Databac, Dhaka: Centre for policy Dialogue.

Desai, G.M. elal (1976) Rural Development for Rural poor, Dharampur Project Report 11 MA Ahmabahad..

Dhaka University Institutional Repository

Dandeker, V.M. and Rath, N. (1971): Poverty in India. EPW, 9 Issues.

DHEW (1966): Nutrition survey of East Pakistan 1962-64 "U.S Development of Health, Education and Welfare, Office of International Research, National Institute of Health, Bethesde, Maryland.

Finance Division (2005): Bangladesh Economics Survey 2005, government of Bangladesh, Dhaka.

Haq, Nuraul (1993): Village Development in Bangladesh, The star press, Dhaka.

Haq, Jahanara, Begum Hamida A. Salahuddin Khaleda and Qadir, S. Roshan, eds. (1983): Women in Bangladesh: Some social Economics Issues, Women for Women, Dhaka.

Harriss, John (1982): Rural Development Theories a peasant Economy and Agrarians Change, Hatahinloon and company, London.

Hossain, M, (1986): A Note on the Trend in Landlessness in Bangladesh, The Bangladesh Development Studies 14, Dhaka.

— and R. Afsar (1992): Urbanization and Urban poor in Bangladesh, Issues, Trends and challenges, Bangladesh Institute of Development studies, Dhaka.

Islam, Rafiqul (1990): Human Resource Development in Rural Development in Bangladesh, National Institute of Local Government, Dhaka.

Islam, R. (1986): Rural Unemployment and Underemployment: A Review in Islam, R. and M. Muqtada (eds): Bangladesh selected issues in Employment and Development ILO-ARTEP, New Delhi.

Jackson, Dadley (1972): Poverty, Macmillian, Delhi.

Jahangir, B.K (1979): Local Action for Self Reliant Development CSS, Dhaka University, Dhaka.

Jahan, Raunaq (1989): Women and Development in Bangladesh, Challenges and Opportunities, Ford Foundation, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

Khan, S.R. Islam and M. Haq (1981): Employment Income and the Mobilization of Local Resources. A study of The Bangladesh village. ILO-ARTEP. Bankok.

Khan, Monirul and Howlader, Santi R. (2003): Does Approach Matter in Poverty Reduction, Academic Press and Publishers LTD, Dhaka.

Khan, Salam (1988): The Fifty Percent : Woman in Development and Policy in Bangladesh, University Press Limited, Dhaka.

Linden Baum, S. (1974): The Social and Economic Status of Women in Bangladesh, Ford Foundation Dhaka.

McCarthy, Florence E. (1984): The Target Group: Women in Rural Bangladesh, In An Exploration of public policy in Agricultural and Rural Development ed. E. Clay and B. Schaffer. Heinemann, London.

Miller, S.M. and Roby Pamela (1968): Poverty changing and social stratification, Ed. D.P. Moyrihan (1969).

Mitra, S.N. etal (1997): Bangladesh. Demographic and Health survey 1996-1997, NIPORT, Mitra and Associated, Macro International Inc, Dhaka and Calverton, Maryland.

Meier, G.M. and Baldwin, R.E (1957): Economic Development: Theory, History, Policy, John, Wiley and Sons, NewYork.

Momin, M.A. (1992): Rural Poverty And Agrian Structure in Bangladesh, Vikas Publishing House PVT Ltd. New Delhi.

Montogomery, Jhon (1966): A Royal Invitation for the three classical themes, New York.

Noman, Ayesha (1983): Status of Women and Fertility in Bangladesh, The University Press Limited, Dhaka.

Ojha, P.D. (1970): Configuration of Indian Poverty, RBI Bulletin, 24.

Quddus, M. Abdul (1993): Poverty Issues in Rural Bangladesh, University Press Limited, Dhaka.

Rahman, A. (1984) Rural Proletarianisation: Evidence from two villages in Bangladesh, Journal, of Social Studies, 23.

Rahan, PK. Md. Motiur (1994): Poverty Issues in Rural Bangladesh, University press limited, Dhaka.

Rahman, S.H. etal (1988): A Critical Review of the poverty situation in Bangladesh in the Eighties, Vol. 1. BIDS Research Report No. 66, Dhaka.

Ravallion, M. and Sen, B. (1996): When Method Matters: Monitoring poverty in Bangladesh, Economic development and cultural change Vol-44 No, 4.

Rein, Martin (1970): Problems in the Definition and Measurement of Poverty, ed. P. Trunsend, 1970.

Rowntree, B. Seebohm (1941): Poverty and progress, Longmans, green. London.

Rose, Michael, E. (1973): The Relief of Poverty 1834-1974, Macmillan, London.

Rostow, W.W (1960): The stage of Economic Growth, A Non communist Manifesto-2nd ed. Cambridge University press, London.

Salahuddin, Khaleda, Jahan, Roushan and Islam, Mahamuda, eds. (1997): Women and poverty, Women for Women, Dhaka.

Sen, Amartya, K. (1984): Resources, Values and Development, Oxford University press, Delhi.

— (1981): Poverty and Famines, Clarendon press, Oxford, Clarendon.

— (1979): Issues in Measurement of poverty, Scandinavian Journal of Economics.

Sen, Binayak (1998): Politics of poverty alleviation, in Rehaman sobham (ed) crisis in Government: A Review of Bangladesh Development 1997, CPD and UPL Dhaka.

— and Q.T. Islam (1993): Monitoring Adjustment and Urban poverty in Bangladesh, Issues, Dimensions, Tendencies in Monitoring Adjustment and poverty in Bangladesh, Report on the Framework project, CIRDAP, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

Sood, Rita (1991): Changing Status and Adjustment of Women, Manak Publication, Delhi.

UNDP 2000: Overcoming Human poverty: Poverty Report 2000, UNDP, New York-USA.

Wallace, B.R. Ahsan, S. Hussain and E. Ahsan (1987): The Invisible Resource: Women and Work in Rural Bangladesh, Westview press, London.

White Sharah. C. (1990): Women and Development: A New Imperialist Discourse, In Journal of Social studies, 48.

World Bank 2000: Attacking poverty: World Development Report 2000/2001 Oxford University press, Washington D.C. U.S.A.

World Bank (1996): World Development Report, 1996. Washington D.C, U.S.A.

Young, A (1928): Increasing Returns and Economic progress. Economic Journal.

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ জানুয়ারি, ২০০৫, ঢাকা

— ২৯ মার্চ, ২০০৫, দারিদ্র্য বিমোচনে ৭০ হাজার কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ: বদলে গেছে গ্রাম বাংলার দৃশ্যপট, শফিকুল কবির।ঢাকা

দৈনিক জনকণ্ঠ; ২৩ অক্টোবর, ২০০৩, ঢাকা।

— ২০, ২১, ২২, ২৪ মার্চ ২০০৫, পিআরএসপি, কতিপয় প্রাসঙ্গিক ও উপেক্ষিত বিষয়, করনীয় এবং সমুন্নয়ের কর্মপরিকল্পনা, আতিউর রহমান, দিলরুবা ইয়াসমিন চৌধুরী ও একেএম মুকসুদুল আলম।

দৈনিক প্রথম আলো : ১৪ জানুয়ারি, ২০০৫: ঢাকা

দৈনিক যুগান্তর: ২৯ অক্টোবর, ২০০৬; দারিদ্র্য কমলেই শান্তি আসবে, মুহম্মদ ফরহাদ হোসেন।

দৈনিক সমকাল: ২০ এপ্রিল, ২০০৭, উৎপাদন কার্যক্রমে কর্মহীনদের সম্পৃক্ত করতে হবে, আবু মাহমুদ।

—— ৫ মে ২০০৭, নারীর শ্রম ও অধিকার, শেখ নজরুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

—— ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৭: পারিবারিক নির্যাতন আইন শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা, ঢাকা।

—— ১৭ অক্টোবর, ২০০৭, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রতিবেদন: প্রত্যাশা ও অর্জন, গোলটেবিল বৈঠক।

—— ২১ অক্টোবর, ২০০৭: গ্রামীন নারীর দুঃখের পাঁচালি শেষ হয় না, চিররঞ্জন সরকার।

—— ৮ ডিসেম্বর, ২০০৬, দারিদ্র্য বিমোচন: শত চেষ্টার পরও নগ্ন বাস্তবতা, এম. আবদুল আজিজ।